[illegible] ।

২৪শ খণ্ড
১৩২৯ } ২

শ্রী [illegible] ৩

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। { বৈশাখ মাস। } ১ম সংখ্যা।

নববর্ষে।

স্বস্তি! স্বাগত! নমো নববর্ষ,
উৎকর্ষ, আনত নব দিবা হর্ষ
স্বস্তি দিবাকর মুখে শুভ কর্ষ
বীর্য্যে, শৌর্য্যে, হে ভারতবর্ষ

স্বস্তি ধরণীর, চির স্নেহে স্পর্শ,
জাগো, হে ভারত, আজি নববর্ষ।
চক্র ঘুরে আসে, আসি দিয়ে দর্শ,—
স্বস্তি স্বাগত নমো নববর্ষ।

৩

বর্ষ সুখে স্ফূর্ত্তি—কত আশা বক্ষে
বর্ষ গেছে কত অতীতের কক্ষে।
স্মৃতি নাহি তার, কেবল [illegible]
শিখা শুধু মানসের চক্ষে।

৪

সত্য নাহি যার কিবা তার বিত্ত।
ধ্বংস চির সাথী মৃৎসারে নিত্য;
মৃত্যু কাছে সব দুঃখী করি চিত্ত,
সত্য বিনা হায়, কিবা কার নিত্য।

৫

পুষ্প ফুটে কি রে শুধু আঁখি ভোগ্য?
জন্ম শুধু কিরে তমো সুখ অর্ঘ্য ?
জীবন বয়ে যায় কর তাহা ভোগ্য,
জন্ম নহে শুধু তমো সুখ অর্ঘ্য।

৬

বর্ষ ঘুরে ফিরে কেবা তার গম্য
সৃষ্টি খুঁজে মরে কি বা তার নম্য ?
ধ্বংস নাচে যেথা কিবা তার নম্য?
সত্য জেনো সদা জগতের গম্য।

৭

সূর্য্য উঠে নিতি কেন তাহা ধন্য।
বর্ষা কেন বড় ধরামাঝে গণ্য?
কর্ম্ম বিনা হায় কেন আসে দৈন্য।
সত্যের জ্যোতি তায় ধরামাঝে ধন্য।

৮

সত্য তেজো শিখা খেলা তার মুক্ত,
সত্য প্রেমবারি চিত্ত শুভ শুদ্ধ;
সত্য জ্ঞান তরু আপনারে রুদ্ধ,
সত্য নাহি পায় যার তার রুদ্ধ।

নববর্ষে

৯

সত্যের খেলা এই সৃষ্টির বন্ধ,
প্রেমের ভাবে এই মিছে দ্বন্দ্ব
নিত্য বয়ে যায় কত নব ছন্দ
বীর্য্যে জানে তাহা, ঘুচে যাক দ্বন্দ্ব।

১০

ধ্বংস ফিরে সাথে কিবা তাহে দুঃখ ?
সত্য অনন্ত, [illegible] শূন্য,
সত্য একা সব, নাহি কিছু রুক্ষ—
[illegible] প্রেমখেলা, কিবা তাহে দুঃখ।

১১

সত্যের তরে খেলো ছিঁড়' হীন সর্ত্ত,
[illegible] আঁকি চল নিজ প্রাণ বর্ত্ত,
কর্ম্মে [illegible] কাল গর্ত্ত,
সত্য তুমি [illegible] নই, ছাড় হীন সর্ত্ত।

১২

সত্য কর সার [illegible]রন্তের মর্ম্ম
স্বপ্নে ডুবে [illegible] নহে কাল ধর্ম্ম ;
সত্য আছে তব চির প্রাণ বর্ম্ম
বীর্য্যে স্মর তাহা কর শুভ কর্ম্ম।

১৩

বস্ত্র গড় সুখে চরকার চক্রে,
অন্ন সৃজ সুখে নাশ ক্ষুধানক্রে,
[redacted]যারে স্বীয় প্রাণ বক্রে,
[redacted]ারে প্রিয়জন চক্রে ;

১৪

তিষ্ঠ আপনাতে ছাড়ি পর সঙ্গ,
সর্ব্ব পরবশ চির-দুঃখ অঙ্গ;
অন্যে সুখ নাহি কর বাধা ভঙ্গ,
জমাব তরে আন ঐক্যের রঙ্গ।

১৫

জগৎ চেয়ে আছে তব প্রাণকুঞ্জে
সত্য সেথা ফিরে সুখে পুনঃ গুঞ্জে,
সত্য আছে তব বিস্মৃতি পুঞ্জে,
জগৎ চেয়ে আছে তব প্রাণ-কুঞ্জে

১৬

বিস্মৃতি মুছে ফেল দূরে যাক দ্বন্দ্ব
বীর্য্যে ওঠ জাগি, ভেসে যাক্ বন্ধ,
সত্য ঢেলে দাও, গাহ শুভ ছন্দ,—
সত্যের তরে কাঁদে ধরা-আঁখি অন্ধ।

১৭

চক্র ঘুরে ফিরে, থাকে যাহা সুপ্ত
বীর্য্য ওঠে পুনঃ নাহি কিছু লুপ্ত
সত্যে আছে সহ যদি কভু গুপ্ত
চক্র ঘুরে ফিরে নাহি কিছু লুপ্ত।

১৮

বর্ষ গেছে তব যদি বড় মন্দ,
বর্ষ আসে পুনঃ, ভেঙ্গে যাবে বন্ধ
লক্ষ্য কভু তব নাহি মোহ দ্বন্দ্ব
হর্ষে হে ভারত ভাঙ্গ তব বন্ধ।

১৯

বর্ষ যদি ফিরে আজি কাল বক্ষে
ভাগ্য নাহি আর আজি যার চক্ষে,
সত্য নাহি ভাসে ধরণীর কক্ষে,
বর্ষ ফিরিয়াছে আজি কাল বক্ষে।

২০

হর্ষে ভোর আজি যাহা গেছে তিক্ত
হর্ষে হের সত্যে নহ তুমি রিক্ত
দীপ্ত আশা ক'রে নব দিব্য সিক্ত,—
হর্ষে চল আজি গত দুখ তিক্ত।

২১

শক্তি কর তব সাধন মন্ত্র,
ভক্তি কর তব প্রাণের যন্ত্র,
কর্ম্ম কর তব জীবন-তন্ত্র,—
সত্য জেনো তারা তব খেলা যন্ত্র।

২২

সত্যে হের আজি তুমি চির পূর্ণ
সত্যে কর আজি শত বাধা চূর্ণ,
বর্ষ আসিয়াছে মহাকাল ঘূর্ণ,
হর্ষে বর তারে—তুমি চির পূর্ণ।

২৩

স্বস্তি! স্বাগত! নমো নববর্ষ
তিষ্ঠ, আগত নব দিব্য হর্ষ।
স্বস্তি দিবাকরে, সুখে শুভ কর্ষ,
বীর্য্যে, শৌর্য্যে হে ভারতবর্ষ।

২৪

স্বস্তি ধরণীরে, চিরস্নেহে স্পর্শ,
জাগো হে ভারত আজি নববর্ষ,
চক্র ঘুরে আসে, আঁখি দিয়ে দর্শ
স্বস্তি! স্বাগত! হে নববর্ষ॥

—

স্বামী বিবেকানন্দ *

(শ্রীমানদাশঙ্কর দাসগুপ্ত)।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা সহরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ধনী এটর্ণি ছিলেন। তাঁহার মাতা প্রাতঃস্মরণীয়া ভুবনেশ্বরী দেবী মনে করিতেন, তিনি শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন।

স্বামীজীর পারিবারিক নাম ছিল—নরেন্দ্রনাথ। বাল্যজীবনে তিনি জগতের আরও অনেক কৃতী সন্তানের ন্যায় অত্যন্ত দুষ্ট, দুরন্ত, উদার ও নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের অনেক সদ্‌গুণাবলী,—তিনি তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন্। জীবন-ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ দত্ত একজন

---

* (ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ষষ্ঠীতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৫ই মাঘ তারিখে স্থানীয় রাজেন্দ্র কলেজে শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, প্রথম সবজজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাসগুপ্ত, এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত)।

ধীর ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার নিকট সংসার-পথে চলিবার প্রকৃত উপায় ও ভদ্রজনোচিত আদব-কায়দার বিশেষত্ব সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলে, তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন—'Never show surprise'—জীবনে কখনও কিছুতে নীচতা হীনতা স্বীকার না করিয়া চলা, সংসারে অকুতোভয়ে বিচরণ করিয়া আপনার ইচ্ছা সম্পূরণ করা, যাহা সত্য বুঝিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা, সত্য বুঝিবার ও খুঁজিবার জন্য উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণ, সর্ব্বোপরি আপনাতে আপনি একটা ন্যায্য গৌরব অনুভব করা,—এ সমস্তই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার নিকট হইতে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে, তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর নিকট তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টির জন্য অসামান্য সাহায্য পাইতেন। মাতার পূজা আরাধনা জপ তপ দীন-দরিদ্রদিগকে অকাতরে অন্নদান, বস্ত্রদান ইত্যাদি, স্বামীজি তাহার পর জীবনে অত্যন্ত গৌরবের সহিত বিবৃত করিতেন। এতদ্ব্যতীত ভুবনেশ্বরী দেবীর সন্তান পালন ও শিক্ষা দিবার প্রণালীও অত্যন্ত উচ্চ প্রকারের ছিল। যাহারা জানেন, তাহারা অনেকে এ বিষয় সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

জন্ম হইতেই ভগবদ্ভক্তি ও সত্যানুসন্ধিৎসা নরেন্দ্রনাথের এত প্রবল ছিল যে, তাহার ভাবে তিনি অতি শিশুকালেই সময়ে সময়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা এক প্রবল সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় ব্যাকুল চিরন্তন প্রশ্ন রূপে পরিণত হইল। "ভগবান্ আছেন কিনা? তাঁহাকে কেহ দেখিয়াছে কিনা? আমাদের মায়া, মোহ, বিরহ-বিচ্ছেদাদির হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কোনও চেতনশীল শক্তি সর্ব্বদা কার্য্যকরী কিনা? মানব জীবনের চরম পরিণতি কি? প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম কোন্‌টী?" ইত্যাদি অফুরন্ত আত্ম-প্রশ্নে কিশোর নরেন্দ্রনাথের চিত্ত ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উত্তরের জন্য তিনি তাহার ছাত্র-জীবনে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। দেশী বিদেশী শত শত পণ্ডিত ও খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি অগণিত ধর্ম্মযাজকগণের নিকট গিয়া তিনি তাঁহার সংশয় নিরাকরণের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইলেন। কাহারও উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

পরে, কলেজে ঢুকিতেই তিনি ইয়োরোপীয় দর্শন শাস্ত্রগুলি ওলট পালট করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তাঁহার সংশয় ও অনুসন্ধিৎসা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্ত সাতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। প্রকৃত সত্যের স্নিগ্ধ প্রলেপ তিনি যেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না। জ্ঞান বিচারে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে প্রাণ ভরে না। যাহাতে প্রাণ ভরে তাহা জ্ঞান-বিচারের শুভ্রালোকে যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রচলিত ধর্ম্ম ও দর্শন দুইই যেন তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ সর্ব্ব বিষয়ে বড় যুক্তি তর্কের পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ বা যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা তিনি কোন প্রকারেই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তদুপরি এই সময়ে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান পড়িয়া, তিনি reason বা ন্যায় বিচারের অত্যধিক পরিমাণে পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এই বিশেষত্ব তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্মে সুপরিস্ফুট দেখা যায়।

অথচ অন্য দিকে অন্তর্নিহিত ভগবানে বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি তাঁহার চিত্তে আর এক প্রকার তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতে লাগিল। নিশ্চিতই এমন কিছু আছে, যাহা জরা-ব্যাধি-শোকে জর্জ্জরিত-মানবপ্রাণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। "কোথায় সে, কেমনে তাঁকে জানা যায়, কোন্ সাধনায় তাঁকে পাওয়া যায়"—সে রকম প্রত্যক্ষদর্শী কোনও মহাপুরুষ সত্যই এ জগতে কেহ আছেন কি!

নরেন্দ্রনাথের এই অনন্ত যুদ্ধের ইতিহাস সুদীর্ঘ,—এই সময় যাহারা তাঁহার সহচর বা শিক্ষক ছিলেন, তাহারা কেহ কেহ এ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছেন। বঙ্গ গৌরব শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে আপনারা এ বিষয়টী বুঝিতে পারিবেন। তিনি তাহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিতেছেন—

"When I first met Swami Vivekananda in 1881, we were fellow-students of Principal William Hastie, scholar, metaphysician and poet, at the General Assembly's College. He was my senior in age, though I was his senior in the college by one

year. Undeniably a gifted youth, sociable, free and unconveng tional in manners, a sweet singer, the soul of social circles, a brillian conversationalist, somewhat bitter and caustic, piercing with the shafts of a keen wit the shows and mumeries of the world, sitting in the scorner's chair but hiding the tenderest of hearts under that garb of cynicism; altogether an inspired Bohemian, but possessing what Bohemians lack, an iron will somewhat peremptory and absolute, speaking with accents of authority and withal possessing a strange power of the eye which could hold his listeners in thrall.

This was patient to all. But what was known to few was the inner man and his struggles—the strum and drang of soul which expressed itself in his restless and Bohemian wanderings"

শীল মহাশয় নরেন্দ্রনাথের চরিত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। বাস্তবিকই একদিকে যেমন খেলিতে, গাহিতে, বাজাইতে, নৃত্য করিতে, সহচরগণকে লইয়া স্ফূর্ত্তি করিতে নরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ অপর কেহ ছিল না, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার সাহস, চরিত্রবল, ধীশক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা, সর্ব্বোপরি চিত্ত গম্ভীরতা ইত্যাদিরও তুলনা ছিল না। তাঁহার মেধাশক্তি এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে, কোনও পুস্তক এক বার মাত্র পড়িয়া তিনি জীবন ভরিয়া তাহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া যাইতে পারিতেন এবং তিনি এত দ্রুত অধ্যয়ন করিতে পারিতেন, যে তাহাও এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। অধ্যাপক Hastie তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

'Narendra Nath Dutt is really a genius. I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in the German Universities amongst philosophical students. He is bound to make a mark in life'

কলেজে পড়িবার কালে নরেন্দ্রনাথ একদিন তাহার কয়েকটী সহপাঠীর সহিত কলেজ স্কোয়ারে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, একটী খৃষ্টান মিসনারী মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহুলোক সেই মিসনারি-টীর বক্তৃতা শুনিতেছিল। মিসনারী বলিতেছিলেন—"If I give a blow to your idol with my walking stick, what can it do ?"

নরেন্দ্রনাথ তখন নিজে মূর্ত্তিপূজার বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তিনি অজ্ঞ মিসনারির ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রশ্ন করিলেন—"If I abuse your God, what can he do ?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মিসনারির মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিল। তিনি দুই চক্ষু আরক্ত করিয়া উত্তর দিলেন—"you would be punished in eternal hell-fire, when you die."

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ অমনি জবাব দিলেন—"So my idol will punish you, when you die."

উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলীর হাস্য কলরবে সে দিনকার সভাটী তখনই ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতি-পক্ষের প্রতি এমনি অমোঘ বাক্য বাণ বর্ষণ করিতে নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে, তাহার জীবনী লেখক Frank Alexander-এর ভাষায় সংক্ষেপে বলা যায়—

'In mischievous fun a boy. in song an artist, in intellectual pursuit a scholar and in his outlook on life a philosopher, Naren was unique amongst the young men of Bengal.'

কিন্তু এমনি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়াও নরেন্দ্রনাথ সুখী ছিলেন না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সংসার মহা বৈষম্য ময়, মানবের জ্ঞান স্বল্প গামী, সত্য চৈতন্য-ময় স্থির মুক্তানন্দ তাহার ভাগ্যে কি নাই? অসহায় মানবের ভরসা কি? এমন কোনও শক্তিই কি নাই, যাহা অমোঘ, অব্যর্থ, সদা স্নেহশীল, সদা রক্ষাকরী যাহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত ও সুশান্ত হইতে পারি? —এই প্রশ্ন সকলের উত্তর খুজিয়াই নরেন্দ্রনাথ অস্থির হইতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তর কে দেয়? আমাদের এ বিশাল জগতে কয়জন প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নের

উত্তর দিতে পারে? নরেন্দ্রনাথ ক্রমে ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে লাগিলেন।

কিন্তু অবোধ্য অগম্য উপায়ে ভগবানের কার্য্য সাধিত হয়। সেই সময় কলিকাতার নিকটস্থ দক্ষিনেশ্বর পল্লীতে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন নিরক্ষর হিন্দু সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধন-খ্যাতি তখন ধীরে ধীরে কলিকাতার প্রাচীর ভেদ করিতেছিল। কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি সাধু-বুধগণ মাঝে মাঝে সেই নিরক্ষরের সন্দর্শনে যাইতেন। তিনি নাকি সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। যাহার যাহা অভাব, আকাঙ্খা, জীবনাদর্শ, তিনি তাহাকে তদ্রূপেই অনেক উপদেশ সাহায্যাদি করিতে পারিতেন। এরকম শাস্ত্র জ্ঞান পারদর্শি, জ্ঞান ভক্তি বিভূষিত নিরক্ষর নাকি আর দেখা যায় না।

কিন্তু তাঁহার তিরোধানের বহু বৎসর পরে, আজ আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, এই নিরক্ষর কে? এমন অদ্ভুত সাধক কে তিনি, যিনি একাধারে শাক্ত-বৈষ্ণব, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, দ্বৈতবাদী-অদ্বৈতবাদী। আপনাদের যদি না জানা থাকে, তবে আপনারা আশ্চার্য্য হইবেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস দক্ষিনেশ্বরে রাণী রাসমণির ৺কালীবাড়ী থাকিতেন বলিয়া তিনি শুধু কালী উপাসক ছিলেন না। কালী ভক্তি রূপ সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইয়া তিনি একে একে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ইত্যাদি করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মাদর্শের সাধক হইয়া তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করেন। পরিশেষে তিনি অদ্বৈত বাদ সাধন করিয়া রামানুজ ও শঙ্কর সিদ্ধান্তের চরম সত্য প্রত্যক্ষ করেন। ইহার মধ্যে কোনও সময়ে আবার তিনি নারীভাব আশ্রয় করিয়াও সাধনায় সিদ্ধ হন।

এমনি বহুভাবে সমিষ্টি-কৃত জীবন শুধু আপনার জন্য নাই, ইহা জগতেরই কোন দুর্জ্জয় সমস্যা সম্পূরণের জন্য আসিয়াছিল। জগতের কোন ধর্ম্মই যে অসত্য নয়, জগদ্বাসী সকলেই যে আপনার আপনার ভাবে একই সত্যের উপাসনা করিতেছে, কাহারও কাহারও সহিত সাধন প্রথা লইয়া যে কোনও বাদ-বিসম্বাদ করিবার প্রয়োজন নাই, সমস্ত ধর্ম্মই যে নদী ধারার ন্যায় একই সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সকল ধর্ম্মই সুরক্ষিত করিবার জন্য বিশ্ব ভরিয়া যে অপরূপ ভাব সামঞ্জস্য আছে, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং সে প্রতিষ্ঠা সমস্ত জগতের কহিনুর, ভারতের চন্দ্রহার। বিভিন্ন জাতি বর্ণে সঙ্ঘটিত ভারতবর্ষে যে অযুত ধর্ম্ম মালার ঐক্য-তান বাজিতে পারে, তাহা তিনিই তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক আমাদের প্রশ্ন হইতেছে এই, শ্রীরামকৃষ্ণ কে? কেহ তাঁহাকে অবতার বলেন,কেহ বলেন মহাপুরুষ, কেহ বলেন সামান্য সাধক মাত্র, আবার কেহ বলিয়াছেন উন্মাদ। যিনি যাহাই বলুন না কেন—"a tree is known by its fruits"—এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি নিজে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বলিয়া যাইব। যাহার অবিশ্বাস বা অসঙ্গত বোধ হয় তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন না।

আমার মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদেরই পূর্ব্ব পুরাতন ভারতের (*old India*) প্রকট অভিব্যক্তি। বেদ, উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি পর্য্যন্ত ভারতে যে সার্ব্বজনীন অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহারই পরিপূর্ণ পুনরুক্তি (*a complete re-statement*)। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ই জগতের সমক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান এবং বর্ত্তমান যুগে ভারত ইহা আপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতকে ইহা শিখাইবে! আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, নিয়তি-চক্র সেইদিকেই ধাবমান। কেন্দ্র—ভারতবর্ষ।

ভগবৎ-চক্রে চালিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন এই অলোক সামান্য মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হন, তাঁহার মন,তখন শুধু সন্দেহ ও অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শনেই বলিলেন, "তোর জন্তই আমি এতদিন অপেক্ষা করিতেছি,—" তখন তাঁহার ধারণা হইল, ইনি উন্মাদ বিশেষ। তারপর যখন তাঁহার করস্পর্শে তাহাকে একবার সমাধি মগ্ন হইতে হইল, তখন তিনি বুঝিলেন ইনি শুধু পাগল নহেন, ইহার মধ্যে আরও কিছু আছে। তদবধি নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ দেবও তাহাকে সযত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধও চলিল বিষম। নরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ না দেখিয়া অথবা বিচারের দ্বারা ভাল করিয়া না বুঝিয়া, কিছুতেই

গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা যতই বলিতেন না কেন, নরেন্দ্রনাথ মূর্খের ন্যায় অন্ধ বিশ্বাসে কিছুই মানিয়া লইতে রাজি হয়েন নাই। Huxley, Tyndal, Mill প্রভৃতি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। রামকৃষ্ণ দেব তাঁহার যুক্তি জাল খণ্ডন করিতে সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া পড়িতেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর তাঁহাদের এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলে। পরিশেষে নরেন্দ্রনাথের মস্তক রামকৃষ্ণদেবের চরণে অবনত হয়। সে দৃশ্য স্মরণীয়। আমার মনে হয়, সেই দিনই যেন পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা সমাচ্ছন্ন নবীন ভারত,তাহাকে পরা-বিদ্যা পরিপুষ্ট পুরাতন ভারতের হাতে সঁপিয়া দিল; রামকৃষ্ণ পুরাতন-ভারত, নরেন্দ্রনাথ নবীন-ভারত, দুয়ের সম্মিলন ভবিষ্যৎ মহাভারতের বাস্তব ছবি।

নরেন্দ্রনাথের এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিতেছেন—

"I watched with intense interest the transformation that went on under my eyes. The attitude of a young and rampant Vedantist—cum-HegalionCum-Revolutionary like myself—towards the cult of religious ecstasy and Kali-worship may be easily imagined; and the spectacle of a born iconoclast and free-thinker like Vivekananda, a creative and dominating intelligence, a tamer of souls, himself caught in the meshes of what appeared to me an uncouth, supernatural mysticism, was a riddle which my philosophy of the Pure Reason could scarcely read at the time. But Vivekananda 'the loved and lost' was loved and mourned most in what I could not but then regard as his defection"—

এমন করিয়া সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণ তলে বসিয়া শিক্ষা দীক্ষা ও প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করিয়া তাঁহার ভিতর বাহিরের সর্ব্ব সংশয় নিরাকরণ করিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকের তীব্র জ্যোতিতে পূর্ব্বে তাঁহার যে ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা

তৎসহায়েই সহস্র গুণে সুদৃঢ় ও সুসংস্থাপিত হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম্ম—বিজ্ঞান বা দর্শন-বিরুদ্ধ নহে। বরং দর্শন-বিজ্ঞান সত্য-তত্ত্বের পথ আরও পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে এবং যেমন বিভিন্ন ভাষা একই বস্তুকে বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করে, তেমনি এক মূল সত্যকেই বিভিন্ন ধর্ম্ম বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে। যেমন একই সূর্য্যাভিমুখে গমন করিতে করিতে তাহাকে বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নাকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি একই সত্যের ক্রমিক নিকটত্ব—দূরত্ব হইতে তাহাকে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃত বিভেদ যাহা পাওয়া যায়, তাহা কেবল একই লক্ষ্য সাধনার phase বা ক্রম হইতে প্রসূত।

শুধু তাহাই নহে। 'যত মত, তত পথ।' এক ধর্ম্মের মধ্যেও আবার অনন্ত শাখা বিরাজ করিতে পারে এবং সে সকলই সত্যের উপাসক হইতে পারে। সুতরাং কাহারও নিন্দা করা উচিত নয়। "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" তাহাতে এক যাহা আছে তাহাই থাকে, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

রামকৃষ্ণ বলিতেন—"নরেন্দ্র মোহরের বাক্স—ও লোক শিক্ষা দেবে।"—তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল।

ক্রমে নরেন্দ্রনাথের পিতৃ বিয়োগ হইল। অসম্ভাবিত কারণে তাহাদের পরিবার বর্গ কঠোর দারিদ্র দুঃখে নিপতিত হইল। নরেন্দ্রনাথ তখন বি, এল পড়িতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সংসার সেবায় কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। সংসারে তিনি জ্যেষ্ঠ পুরুষ-সন্তান ছিলেন; এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের অল্প পরেই তিনি তাঁহার মাতার অনুমতি লইয়া সংসারত্যাগী হইলেন; পূর্ব্বে বা পরে কখনও দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার এই সংসার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আজিও সাধারণের অগোচর। বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথের ন্যায় কোমল হৃদয়ের লোক, কেন এবং কি করিয়া তাঁহার দুঃখী পরিবার বর্গের ভার মাথায় না লইয়া পথের বাহির হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা চিন্তার বিষয়। ইহাতে পরমহংস-দেবের কত খানি হাত ছিল, তাহাও অনুভাব্য।

সে যাহা হউক নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হইয়া কিছুকাল তাঁহার গুরু ভ্রাতৃগণকে লইয়া বরাহনগরে একটী ক্ষুদ্র মঠে বাস করেন এবং তাহার অনতি পরেই

তিনি সন্ন্যাসীর দণ্ড হাতে লইয়া একাকী পথের বাহির হয়েন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। সন্ন্যাসী বেশে পাঁচ বৎসর ধরিয়া কখনও পদব্রজে, কখনও বা গাড়ীতে, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমন করেন; ভারতের কোনও তীর্থ, কোনও পুণ্যস্থান বাকী রাখেন নাই। কি সাধন এবং কি সিদ্ধি বুকে করিয়া তিনি এই দীর্ঘ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা সম্যক লোক-গোচর হয় নাই। যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় তাহা কেবল সমুদ্র তীরের উপলখণ্ড মাত্র। তাহাতে তাঁহার সাধন সাগরের আভাস পাওয়া যায় মাত্র; সুপরিস্ফুট বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না।

"Go forward without a path!
Fearing nothing, caring for nothing,
Wander alone, like the rhinoceros!
Even as the lion, not trembling at noises,
Even as the wind, not caught in a net,
Even as the lotus leaf, unstained by the water,
Do thou wander alone, like the rhinoceros"

ধর্ম্ম পদের এই গাথাটি তখন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার তখনকার জীবনী পাঠে দেখা যায়, এই সময়ে তিনি কখনও কৌপীন মাত্র পরিহিত পথের দীন ভিখারী, কখনও নির্জ্জন গিরি গুহায় নিস্তব্ধ সাধক, কখনও লোকালয়ে গভীর অধ্যয়ন-রত ছাত্র, কখনও কোন ধর্ম্মশালার নিষ্ঠাবান সাধু-শ্রেষ্ঠ, কখনও বা কোনও রাজ-প্রাসাদের পূজ্য অতিথি। কোনও দিন তাঁহার উপবাসে যাইতেছে, কোনও দিন বা অর্দ্ধাশনে যাইতেছে, আবার কোনও দিন বা রাজভোগ গ্রহণ করিতেছেন।

আলোয়ার, ক্ষেত্রী, গুজরাট, মহীশুর প্রভৃতি অনেক রাজা-মহারাজা যাঁহার সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা কেহই তাঁহাকে সহজে ছাড়িতে চাহিতেন না। সকলেই মনে করিতেন, এমনটি যেন আর দেখি নাই। কিন্তু স্বামীজী কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—

"জীবনের মহাকার্য্য সম্পাদিত করিতে হইবে, আমার বিশ্রাম বা অবসর নাই" এবং তাহার জন্য তিনি যেন সর্ব্বদাই এমন ভাব মগ্ন ও স্থৈর্য্যহীন থাকিতেন যে তাহা দেখিয়া অনেকেরই আশঙ্কা হইত, বুঝিবা কোনও দিন ভাব প্রাচুর্য্যে তাঁহার দেহটা হঠাৎ একটা আগ্নেয় যন্ত্রের ন্যায় ফাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। পোর বন্দরের রাজ প্রাসাদে থাকিবার সময় এবং তৎপরে কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক অবস্থার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা পড়িলেও স্তম্ভিত হইতে হয় —"He was like a storm and a hurricane"—"It seemed as if his brain would burst."

তাঁহার মহাকার্য্য যে কি, তাহা অনেকেই জানিতেন না। কিন্তু সকলেই বুঝিতেন যে, জগতে তিনি একটা বড় কাজ করিয়া যাইবেনই। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেক অনেক বিবরণ দিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে Inspired Saint বা আদিষ্ট সাধু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য তিনি না জানেন এমন শাস্ত্র নাই, কেহ বলিয়াছেন, এমন personality আর দেখি নাই। কেহ বলিয়াছেন, এ লোক যে একটা জগৎ তোলপাড় করিয়া যাইবেন তাহা আমরা আগেই জানিতাম। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই সময়ে এক দিন তাঁহার বেদান্ত জ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মহীশূরের মহারাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্বামীজি! আপনার জন্য আমি কি করিতে পারি?" উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তির পত্রাবলী হইতে আমরা যাহা পাই, তাহা হইতে স্বামিজীর জীবনোদ্দেশ্য আমরা কিছু বুঝিতে পারি, এবং তিনি যখন ঘুরিতে ঘুরিতে কন্যা-কুমারিকা অন্তরীপ ভারতবর্ষের শেষ উপল খণ্ডের উপর বসিয়া ভাবযোগে মহাভাবাবেগে মহাধ্যানে নিমগ্ন হন, তখন তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা আনন্দে আপ্লুত হই।

সেখানে তিনি কি পাইয়াছিলেন? তাহার বিবরণ অতীতের অজ্ঞাত গুহায় পরিসমাপ্ত। তাহার জীবনী লেখক Frank Alexander যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, আমি তাহারই সারাংশ আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিতেছি:—

What were the contents of his meditation, it is asked? They were the thoughts of of a Master-builder of Nations. They were the thoughts of a Vyas and of a Manu; they were the thoughts a Sankara [illegible] and of a [illegible]udha, of a Krishna and a Chaitanya —all [illegible] into a great world of vision, prophecy and insight [illegible] * * * * *

H[illegible] saw Religion as to the very blood and life and spirit of the Indian millions and said in the [illegible] of [illegible] shall rise through a renewal and a resto[illegible] of [illegible] spiritual [illegible]ness which has [illegible] of India [illegible] all [illegible] cradle of the Nations and cradle of the faith. (Life Vol II. page 20[illegible]—203)

ইহার অল্প পরেই তাঁহাকে আমরা আমেরিকা দেখিতে পাই—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা করিতে [illegible]ন। তখন [illegible] উনত্রিশ বৎসর [illegible] তিনি প্রথম [illegible] দাঁড়াইয়া পাঁচ [illegible]নিট [illegible] থাকে। সে [illegible] তিনি ভগবানেরই [illegible] সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহাসভা [illegible] হইল। দর্শন ও [illegible] করিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন [illegible] সকলেই মুগ্ধ হইলেন। [illegible] একবাক্যে স্বীকার করিলেন, [illegible] না তাঁহার [illegible] প্রথম তাহাকে [illegible] পৌঁছে [illegible] সাধারণের মধ্যে [illegible] প্রবল [illegible] কারণ মুষ্টিমেয় অল্প কয়েকজন [illegible] হিন্দু সমাজের কোনও প্রতিনিধি আমেরিকায় [illegible] প্রথম তাহারা শুনিলেন যে একজন অজ্ঞাত হিন্দু [illegible] প্রাধান্য ও সার্ব্বভৌমিকত্ব সংস্থাপন [illegible] কোনও খবর [illegible] পূর্ব্বে [illegible] পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী [illegible] খবর আসিয়া [illegible] কাতায় এক [illegible] বিরাট সভায় [illegible] অনেক ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ৩ (ক্রমশঃ)

উঠি কি আমরা ?

(শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা)।

(১)

এ জীবন নিরন্তর, বহি শোক-দুঃখ ঝড়,
তাহাতে কি পাপধুলি যায় হে মুছিয়া ?
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ, করে কি কলুষ নাশ,
অনুতাপানলে শুদ্ধ হয় কি এ হিয়া ?
দুখের সোপান বহি, উচ্চে কি আমরা উঠি
সংসারের দুঃখ ক্লেশ চরণে দলিয়া ?
উঠি কি আমরা ধীরে, তোমার পবিত্র দ্বারে
ক্ষোভে দুঃখে সদা পেয়ে অশেষ যন্ত্রণা,
হয় কি তাহাতে প্রভো তোমার ধারণা ?

(২)

উঠি কি আমরা কভু, লভি জ্ঞান বুদ্ধি প্রভো
সংসারের রীতি নীতি করি দরশন ?
জীবনের সখা জ্ঞানে, রেখেছি যাহারে প্রাণে
ভাবিয়া রেখেছি যারে বান্ধব সুজন।
কিছু দিন পরে হায়, বিনা দোষে দেখা যায়
বিষধর রূপে সে যে দহে প্রাণ মন।
উপকার ভুলি ক্রমে, নাহি তার আসে মনে,
শঠ, প্রবঞ্চক, ক্রূর, কৃতঘ্ন দুর্জ্জন—
বিশ্বাস ঘাতক হেন, নররূপী ভুজঙ্গম,
শিখায় কি তত্ত্বজ্ঞান দেব মহিমায়
ক্লান্ত হ'য়ে লই কি হে তোমার আশ্রয় ?

(৩)

উঠি কিহে নব বলে, দেখি যবে ধরাতলে,
ভ্রাতৃস্নেহ পদে দলি সোদর নির্দ্দয়।
বিত্ত অর্থ স্বার্থ তরে, তরবারি লয়ে করে,
ভ্রাতৃরক্তে রঙ্গে ধরা পাষাণ হৃদয়।
যদি কিছু ম্রিয়মাণ, স্বহস্তে না লয় প্রাণ,
ঘাতকের গুপ্ত হস্তে করিছে ছেদন,
ভ্রাতৃ স্নেহ স্বর্ণলতা কমল কানন।

(৪)

সাধিতে জীবন ব্রত, উঠিতে কি পারি তত
ধর্ম্মাত্মার পুণ্যভূমি সু উচ্চ শিখর।
যবে দেখি পুত্র কোন, হায়রে পাষণ্ড হেন,
ধূলিজালে ধুসরিত আদ্র কলেবর—
পিতার পবিত্র বক্ষে, যেন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে
ভূপতিত করিয়াছে পিতৃ তরুবর,—
রাহুরূপে গ্রাসিয়াছে পূর্ণ শশধর।

(৫)

এই যে পশুব সম, কুকার্য্য জঘন্যতম,
নিরখি কি লভি জ্ঞান তব সুমহান ?
স্মরিলে দুঃখের কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা,
"ক্ষম"বলি বন্দি কিহে তোমার চরণ ?
জগতের কার্য্যাবলী, দেয় কি মানবে বলি'
তোমার করুণা রাশি অনন্ত অপার,—
তাড়িৎ প্রভাবে যেন বার্ত্তা চমৎকার।

(৬)

সহিয়া সবলা বালা, দারুণ বৈধব্য জ্বালা,
লয় কি বিষম শোকে তোমারে স্মরণ ?
জ্বলি পুত্রশোকে মাতা, স্মরে কি কখন ত্রাতা,
তোমার পবিত্র নাম দয়া যার পণ,
উঠিকি আমরা তাহে পতিত পাবন ?

বর-পণ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দেবী।)

আজ কাল [illegible] একি [illegible] অবগত আছেন। দুই চারিটী [illegible] করিয়া তাহাদিগকে [illegible] ইহা দেশের [illegible] নিদর্শন। [illegible] ইহাতে [illegible] [illegible] বিন্তু সমাজের [illegible] ও [illegible] প্রাশিত হইয়াছে। [illegible] যুবক যুবতী [illegible] অভিনেতা ও অভিনেত্রী। তন্মধ্যে যুবকগণ শিক্ষিত, [illegible] অশিক্ষিতা। যদি দেশের যুবকেরা যথার্থ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সমাজে এ দুর্দিন কখনও উপস্থিত হইত না। যদি [illegible] সমাজকে প্রকৃত সংস্কার করিয়া লওয়া হইত তাহা হইলে আর [illegible] ও কন্যাদিগকে [illegible] ভোগ করিতে হইত না। [illegible] অর্দ্ধাংশ—স্ত্রী [illegible] ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরুষ-প্রকৃতির [illegible] সৃষ্টি [illegible] সজীব রাখিতে হইলে এই স্ত্রী-পুরুষের [illegible] প্রয়োজন। এই অত্যাবশ্যক প্রকৃতি [illegible] পথে এক অস্বাভাবিক অন্তরায় কে সৃষ্টি করিল,—কেন সৃষ্ট হইল? ইহার একমাত্র উত্তর—স্ত্রী জাতির মূর্খতা। পুরুষ জাতি [illegible] বলিয়া সমাজে আদরণীয়, [illegible] মূর্খতা [illegible] সমাজে [illegible] শিক্ষিত [illegible] অশিক্ষিত [illegible] স্ত্রী পুরুষ সমানভাবে শিক্ষিত হইত, বোধ হয় [illegible] এইভাবে শোষণ করিতে [illegible] প্রজাপতি বিধান উঠিয়া [illegible] হইয়া সমাজে শান্তি আনয়ন করিত,—সমাজে

দারিদ্র্যাতুরীভূত হইত—দাসত্ব মন্দীভূত হইয়া পুরাকালের সামাজিক শান্তি ফিরিয়া আসিত।

সামাজিক অধিকাংশ ব্যক্তিকে চাকুরী করিতে হয়। যদি কন্যা বিবাহ পণ-রূপ দুরপণেয় কলঙ্ক সমাজ হইতে দূর হইত, তাহা হইলে সামাজিক অনেকেই চাকুরী না করিয়া সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। যে দরিদ্রতায় আমরা এতদূর প্রপীড়িত হইতেছি, যাহার জন্য শত শত পরিবার আবাস ভূমি টুকু পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া জীর্ণ বস্ত্রে শীর্ণ দেহে অনশনে বা অর্দ্ধাসনে দিন যাপন করিতেছেন, যদি আজ কন্যা বিবাহ পণ এ সমাজে না থাকিত, তাহা হইলে সমাজে আজ এ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত না। শুনিতে পাই, আমাদের দেশের যুবকগণ স্বদেশ হিতৈষী হইয়াছেন এবং স্বদেশ হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, তবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা অভিভাবক এ নিদারুণ দশায় পতিত কেন? আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে—কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার সহিত চুক্তি করিয়া কন্যা কর্ত্তাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়েন। সমাজে জীবস্রোত চির প্রবাহমান রাখিবার জন্যই জগতে বিবাহ প্রথার প্রচলন হইয়াছে। বিবাহ ব্যাপারে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীর আবশ্যকতা সমান। বর ব্যতীত কেবল শুধু কন্যায় বিবাহ হয় না; কন্যা ব্যতীতও তদ্রূপ কেবল বরের বিবাহ আকাশ কুসুমের ন্যায় অসম্ভব। পুরাণাদিতে দেখিতে পাই জীবসৃষ্টি কার্য্যে শক্তির আবশ্যকতাই প্রথমে কল্পিত হইয়াছে এই শক্তি রূপিণী স্ত্রীজাতির পুরুষ সমাজের পক্ষে এতবড় অবজ্ঞায় অতীব আক্ষেপ ও আশ্চার্য্যের বিষয়। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন "পুরুষ বিবাহিত হইয়াও একজন স্ত্রীলোক অনায়াসে তাহার সংসার পরিচালন করিতে পারেন কিন্তু স্ত্রী ব্যতীত একজন পুরুষ একবারে অচল অপদার্থ।" বঙ্গের বসন্ত কবি বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় একখানি উপন্যাসে উপনায়িকার মুখে বলিয়াছেন "পুরুষজাতি স্বচ্ছেয় তৈজসের মধ্যে কলসী, আমরা মাজিয়া ঘসিয়া সম্পূর্ণ করিয়া রাখি,—সেই; নইলে তাহা সর্ব্বদাই মলিন ও অন্তঃসার-শূন্য।"

যে স্ত্রী জাতি সমাজ শরীরের অর্দ্ধাংশ,—যে স্ত্রীজাতি জীব সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতি রূপিণী, যে স্ত্রীজাতি নহিলে পুরুষ এক মুহূর্ত্তও চলে—যে স্ত্রীজাতি সামাজিক, সাংসারিক ও পারলৌকিক সুখ, শান্তি ও স্বস্তি সাধনের মূলীভূত

হেতু, সেই স্ত্রীজাতির এইরূপ সামাজিক লাঞ্ছনা ও অনাদর সামান্য ক্ষোভ ও অপমানের বিষয় নহে। তারপর যাঁহারা দুহিতা ঘরে আনিয়া নিজ পুত্রের হস্তে দিয়া এরূপ গুরুতর সম্বন্ধ স্থাপনা করেন, সেই পুত্রের শ্বশুরকে ছলে :বলে কৌশলে পরিজনসহ সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী করিতে শিক্ষিত ভদ্র সমাজ লজ্জিত নহেন, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? ভগবান মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ কন্যা : বিবাহ পণকে মাংস বিক্রয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন।* সেই কষাইয়ের ব্যবসায় করিতে সমাজ লজ্জিত নহেন। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ও দেশ হিতৈষী যুবকগণের নিকট জিজ্ঞাস্য, যদি তাঁহারা সমাজ ও দেশের জন্য যথার্থই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে এই দূরপণেয় কলঙ্ক কালিমা সমাজ হইতে মুছিয়া ফেলুন। তাঁহারা কি ইচ্ছা করিলে এই ঘৃণিত, জঘণ্য, পণ-প্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে পারেন না? কিন্তু সে বিষয়ে তাহাদের চেষ্টা কোথায়? তাঁহাদের কি স্বজাতির ও স্বজাতীয়া ভগিনীগণের এ দুরবস্থা অপনোদন করা উচিত নহে? ব্যাধিযুক্ত শরীরে যেমন সুপথ্য বলাধান করে না তদ্রূপ দোষযুক্ত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা বিড়ম্বনা মাত্র।

আর আমার দেশের ভগিনিগণের প্রতি বিশেষ অনুনয় ও অনুরোধ তাঁহারা স্বকীয় জড়ভাব বিস্মৃত হউন; তাঁহাদের এই জড়তা এবং মূর্খতার জন্যই সমাজে তাঁহাদের এত অনাদর ও অপমান। উচ্চ শিক্ষার দ্বারা হৃদয়ে সৎসাহস আনয়ন করুন,—নৈতিক বলে বলবতী হইয়া হৃদয় বৃত্তির উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করুন। ভাবিয়া দেখুন, আমাদের জন্যই আমাদের পরম হিতৈষী, নিস্বার্থ, স্নেহ প্রবণ পিতা মাতার এত ভাবনা, এত যন্ত্রণা, এত লাঞ্ছনা। যে সমাজে বহু ধনরত্ন সমন্বিত কন্যাকে বহু চেষ্টা যত্ন করিয়া পাত্রস্থ করিতে

---

* শাস্ত্রে পুত্র কন্যার শুল্ক গ্রহণ শুক্র বিক্রয় বলিয়া উল্লিখিত ও নিন্দিত হইয়াছে। যথাঃ— শুক্রবিক্রয়িণঃপুংসোমুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ। অপিচ—শুক্রবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিস্কৃতি পুনঃ। ইতি পদ্মপুরানম্।
তথাহি ক্রিয়াযোগসারে—তংদেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।

হয়, বুঝিতে হইবে যে সমাজে পাত্রের কন্যার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেবল কন্যার নিতান্ত প্রয়োজন জন্যই কন্যার পিতা হাতে-পায় ধরিয়া রাশি রাশি অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া কন্যা সমর্পন করেন। ভগিনিগণ! সমাজের এই অসমদর্শিতার বিরুদ্ধে আপনারাও অভ্যুত্থান করুন। পুরুষের যদি কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকে, তবে আমরাই'বা কেন এ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করি। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, যতদিন এই বৈষম্য না বিদূরিত হইতেছে, যতদিন পুরুষ স্ত্রীর প্রয়োজনতা না সম্যক উপলব্ধি করিতেছে, ততদিন আমাদেরও বিবাহের প্রয়োজন অনাবশ্যক মনে করিব।

তাহা হইলে আমাদের দরিদ্র পিতা-মাতা কন্যাদায় চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজের যুবক ও মহিলাগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন ও প্রার্থনা যে, তাঁহারা সমাজের এ কলঙ্ক বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হউন। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য ও চেষ্টা না করেন তবে কে করিবে ?

দোষ কাহার ?

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

দেশের এই দুর্দ্দিনের জন্য অনেকেই বিদেশীকে দোষ দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, আমাদের আজ কেন এমন অবস্থা হইয়াছে ? অনেকেই হয়তো বলিবেন, আমাদের গৃহে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, আমাদের দুরবস্থা হইবে না তো, কি ? একথা অনেকটা ঠিক অন্ন ; চিন্তায় মানুষ জর্জ্জর হইয়াছে। বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। আহার্য্যের অভাবে লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে মানুষ 'হা অন্ন হা অন্ন' করিতেছে। দরিদ্র-তার ফলে স্বাস্থ্যের অভাব হইয়াছে। কিন্তু কেন এমন হইল ? ইহা কি আমাদের

নিজেদের দোষেই ঘটে নাই? সমগ্র ভারতবাসী আজ পরমুখাপেক্ষী হইয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ এমন ভাবে পরের হাতে নিজের সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা গেলে, তাহাদের এমন অবস্থা হইবে না তো কাহার হইবে? কে চিরদিন আমাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবে? এখন কৃষকগণ পূর্ব্বের মত ধান আবাদ করে না, তন্তুবায় বস্ত্র নির্ম্মাণ করে না। ছুতার, কামার প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চাহিয়া আছে—ঐ সাগর পারের দিকে, কতক্ষণে আমাদের জীবন ধারণের উপযোগী জিনিস সেখান হইতে আসিবে। কেন আমরা এমন পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি? আমাদের এই আলস্য এবং জড়তার দোষেই যে আমরা আজ সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। আমাদের নাই কি? আমরা ঘরের তুলা পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া বসিয়া থাকি—কাপড়ের প্রত্যাশায়। অপরে আমাদের কাপড় নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের দিয়া যাইবে, তবে আমাদের লজ্জা নিবারণ হইবে। ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে যে আমাদের এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিসটীও আমরা নিজের হাতে তৈয়ারি করিতে জানি না। তাহার পর ঘরে চাউল থাকুক আর নাই থাকুক, হাঁড়ি চড়ুক আর নাই চড়ুক, পাটের আবাদ করা চাইই! অবশ্য পাটেও নানাবিধ জিনিস তৈয়ার হয় বটে, কিন্তু নিরন্ন দেশে অন্নের প্রয়োজন যে সর্ব্বাগ্রে!

কামার, কুমার, সূত্রধর প্রভৃতি সকল জাতি নির্ব্বিশেষেই এখন নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছে ঐ স্কুল কলেজের দিকে চাকুরীর প্রত্যাশায়। কিন্তু ইহার ফল যে কি বিষম হইতেছে, সে কথা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। আমরা জানি এক সূত্রধর অতি সুন্দর কাঠের জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে জানিত। সেরূপ সূক্ষ্ম কাজ আজ কাল বোধ হয় খুব কম লোকেই জানে কিন্তু তাহার একমাত্র পুত্র সে কাজ নিতান্ত অপমানজনক মনে করিয়া, ভবিষ্যতে চাকুরীর প্রত্যাশায় স্কুলে প্রবেশ করে। সূত্রধর কাঠের কাজ করিয়া বেশ জীবিকা উপার্জ্জন করিত। অনায়াসে সংসার চালাইয়া যাইত। কিন্তু ছেলেটী এখন ২৫৲ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি করে। তাহার ফলে বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া সে দিন দিন ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে এবং ক্রমে মাথা রাখিবার স্থান বসত বাড়ী খানি পর্য্যন্ত বন্ধক

দিতে হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা বোধ হয় অনেকেরই। অতএব চাকুরীর প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া দেশে যাহাতে শিল্প ও কৃষি বিস্তার হয়, সেই চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের দেশবাসিগণ নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই, আজ আমাদের এত অভাব। দেশ অন্নহীন, অর্থহীন! শুধু কেরাণীগিরি করিলেই আর দেশের অভাব দূর হইবে না। এম, এ, বি, এ, পাশ করিয়া সকলেই কিছু আর জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ, ডেপুটী হইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায়, কত ছেলে বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি করিবার জন্ম লালায়িত। এখন অভিভাবকদের কর্ত্তব্য—ছেলেদের শুধু কেরাণী হইবার মত শিক্ষা না দিয়া, ছেলেকে যাহাতে প্রকৃত 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা। ছেলেরা যাহাতে সৎ শিক্ষা পাইয়া দেশের অভাব দূর করিতে পারে, সে জন্য যত্নবান হওয়া সকল অভিভাবকদিগেরই কর্ত্তব্য। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। 'আধ মরাকে ঘা মারিয়া' বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে যে একতার নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, ইহাও আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। একে তো এই ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত কত রকম পার্থক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার উপর কাহার প্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহেন। এই জন্যই আজ আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি। ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি টানিয়া আনিয়া নিজেদের গৃহ নিজেরাই দাহ করিতে বসিয়াছি। এ ভাবটা শুধু আজ নহে, ঐতিহাসিক যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারত ও ভারতবাসী ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। রাণা প্রতাপসিংহ অশেষ গুণশালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিজেই নিজের পতনের কারণ হইয়াছিলেন; সে কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার মধ্যে উদারতার কিছু অভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। যদি তিনি মানসিংহের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কপটতা না করিতেন, সরলভাবে স্বদেশবাসী ভাই বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ

করিতেন, তাহা হইলে মেবার রাজ্য অত শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যাইত না। মেবারের ইতিহাস তাহা হইলে আজ অন্যরূপ ধারণ করিত। আমাদের দেশেও ছোট খাট সামাজিক ঘটনা লইয়া সময় সময় কত সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়; ইহা কি অনুদারতার পরিচায়ক নহে? এই দলাদলি, গৃহ বিচ্ছেদ আমাদের দুর্দ্দশার একটী মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা মহৎ তাঁহারা চিরদিনই মহৎ থাকিবেন। 'আমি বড়, তুমি ছোট' একথা তাঁহাদের নিজের মুখে প্রকাশ করিতে হইবে না। তাঁহাদের কার্য্যেই তাঁহাদের মহত্ত্ব আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যে মহাপুরুষদিগের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা এখন পর্য্যন্ত গর্ব্ব করিয়া থাকি, তাঁহাদের প্রকৃতি কিরূপ উদার ছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ভগবান্ রামচন্দ্র চণ্ডালের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপের ঘরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুও যবন হরিদাসের কথা সকলেই জানেন। আমরা তাঁহাদিগের কথা লইয়া এখনও মৌখিক গর্ব্ব করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি কি? সমাজ আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে পদে পদে বাধা প্রদান করিতেছে। কিন্তু দেশের যে প্রকার ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই দলাদলি, গৃহবিচ্ছেদ, আত্মম্ভরিতা এবং ঈর্ষা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আর আমাদের শ্রেয়ঃ নাই। এখন আমাদের চাই একতা, চাই—সাধনা এবং সিদ্ধি। বিষ্ণুচক্র ছেদিত সতীর দেহের ন্যায়, এই খণ্ড খণ্ড জাতিকে একতার সূত্রে বাঁধিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে 'ভারতবাসীর' ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; সমাজকে পর্ব্বতের মত অচল অটল থাকিয়া সকলকেই বুকে তুলিয়া লইতে হইবে। পরস্পর পরস্পরকে সহানুভূতি দ্বারা আপনার করিয়া লইতে হইবে। ভাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া ভাইয়ের কাজ করিতে হইবে। তবেই এ দুর্দ্দিন দূর হইবে—আবার সুদিন আসিবে। নচেৎ আমাদের দোষেই আমাদের [illegible]

গ্রহের ফের।

(শ্রীচারুচন্দ্র সেন এম, এ)।

শীতকাল। বেলা পাঁচটা না বাজিতেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, আসানসোলে একটি বাটীর উদ্যানসংলগ্ন, বসিয়া কয়েকটী যুবক গল্প করিতেছে। সেইসময় একটী অচেনা লোক ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! এখানে কোন পাদ্রীর বাড়ী আছে?" সমবেত যুবকদেরই একজন তাহাকে এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করাতেই আগন্তুক উত্তর করিল—"মহাশয় আমি খৃষ্টান হইব।" তাহার এই উত্তর শুনিয়া সকলেই অবাক হইল। কৌতূহল পরবশ হইয়া আবার তাহাকে প্রশ্ন করা হইল—"আপনাকে ভদ্র বংশজ দেখিতেছি, হঠাৎ এই দুর্ম্মতি হইল কেন?" আগন্তুক উত্তর করিল—"আমি আজ কিছুক্ষণ হইল কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছি, এই জায়গায় আমি সম্পূর্ণ নূতন, রাস্তা ঘাট লোকজন সবই আমার অপরিচিত। অনেক ভদ্র লোকের গৃহে আশ্রয় চাহিয়াছিলাম কিন্তু, জানি না কেন সকলেই আমাকে আশ্রয় দিতে নারাজ হইলেন।" যুবকদের মধ্যে নরেন একটু মুখর তাই সে উত্তর করিল—"মহাশয় কি খৃষ্টান হইলেই সহজে আশ্রয় পাইবেন? খৃষ্টান হইলে ত মহাশয়কে রাস্তায় রাস্তায় পাদ্রীদের বই বিক্রী করিয়া বেড়াইতে হইবে। সেটা কি বিশেষ আরামদায়ক হইবে?" নিকটেই এক পাদ্রীর কুঠীর সন্ধান দিতেই আগন্তুক সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছিল। নরেন তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল। অনেক কথা বার্ত্তার পর ইহাই স্থির হইল যে সে কোন ভদ্র পরিবারে আশ্রয় পাইলে, আর খৃষ্টান হইবে না। নরেন পুনরায় বলিল 'অজ্ঞাত কুলশীল আপনাকে কোন ভদ্র লোক তাহার গৃহে আশ্রয় দিবে?' সকলে নরেনকে চুপ করিতে বলাতে সে চুপ করিল। যুবক সে দিন নরেনদের ওখানেই রহিল। পর দিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাহার বাসস্থান ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল, বিলাতের অতিথি-দের ন্যায় যুবক মাসিক খরচ দ্বারা এই পরিবারকে সাহায্য করিবে।

বহু প্রশ্ন করিয়াও কেহ যুবকের নামটী ব্যতীত তাহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারিল না—তাহার স্বভাবে একটা কেমন অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিল

নাম ব্যতীত আর কাহাকেও সে কিছুই বলিত না। তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে নীরব থাকিত, বেশী পিড়াপিড়ী করিলেই বলিত, সে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিবে।

ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় পাইয়া পরিবারটিকে আপনার করিয়া লইতে অপূর্ব্ব চৌধুরীর বেশী দিন লাগিল না। তাহার সরল সুন্দর ব্যবহারে অল্প দিনের মধ্যেই পরিবারের সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র চাটুয্যে পরিবারের একজন হইয়া গেল।

এমন কি অনেকে ইহাই বলিত যে সে অখিল বাবুরই কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। অপূর্ব্ব লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইত যে সে কাজের চেষ্টা করিতেছে এবং মিথ্যা দুই একটা কোলিয়ারির সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়া বলিত, তাঁহারা নাকি তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছেন। কার্য্যতঃ সে কোন চাকুরীর চেষ্টাই করিত না; অথচ মাস শেষে চাটুয্যে পরিবারে রীতিমত কুড়ীটী টাকা জমা দিয়া ফেলিত। অনেক সময় বিপদআপদে পাড়ার লোক যখন তাহাদের এই নূতন প্রতিবেশীটির নিকট টাকা ধার চাহিয়া বিফল মনোরথ না হইয়া ফিরিত, তখন সকলেই তাহার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিত বটে কিন্তু বলিতে কি, কিছুতেই যেন তাহারা অপূর্ব্ব সম্বন্ধে কোন একটা সত্যিকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। সে কে এবং কোথায় যে তাহার অফুরন্ত ব্যাঙ্কটী আছে, কেহই যেন তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

দৈনিক কাজের মধ্যে অপূর্ব্বের কাজ ছিল, অখিল বাবুর কন্যা স্নেহকণাকে পড়ান, * * * * আর নিজের বোঝাই করা বাক্সগুলি হইতে এক এক খানা বই বাহির করিয়া শেষ করা। এই একই ভাবে তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল। বালিকা স্নেহকণা অপূর্ব্বের শিক্ষা প্রণালী বড়ই পছন্দ করিত এবং এই অস্বাভাবিক যুবকের হৃদয়ের সমস্তটুকু স্নেহ এবং ভালবাসা যেন সে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দখল করিয়া লইতেছিল। যদিও অপূর্ব্ব নিজে ইহা বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না তবুও যে দিন সে এটা প্রথম টের পাইল সেই দিনই সে তাহার আচার ব্যবহারগুলি সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া দিয়া যথাসম্ভব নিজকে সামলাইয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক দিন হইল স্নেহকণা জ্বর এবং নিউমোনিয়া হইতে রক্ষা পাইয়া, সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মাতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন, পিতা আফিসে কাজ করিতেন, কাজেই সর্ব্বদা তাহাদের কন্যার নিকট থাকা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। অপূর্ব্বের উপরই তাঁহারা সেবা এবং যত্নের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ কয়টা দিন অপূর্ব্ব আর বাড়ীর বাহির হয় নাই। সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র চক্ষে বসিয়া অপূর্ব্ব স্নেহকণার সেবা এবং যত্ন করিয়াছে। বালিকা এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। তাহার পিতামাতা সমাজে গিয়াছেন, সে অসুস্থতা বশতঃ যাইতে পারে নাই; অপূর্ব্বের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল। স্নেহ বলিল "অপূদা, তোমার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, ভাই বলনা তুমি কে?" অপূর্ব্ব নীরবে কেবল মাত্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বালিক পুনরায় নিজের হাতখানি অপূর্ব্বের হাতের উপর রাখিয়া বলিল 'বল্‌বে না তুমি কে? তুমি আমাদের কিছুই বল্‌বেনা? তা'হলে আমিও আর তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বনা।' অপূর্ব্ব এবার উত্তর করিল আচ্ছা শোন্ স্নেহ; আমার কথা শুনিবার জন্য তুই যখন এতই ব্যস্ত; তবে শোন্ বলি—আমি কানপুরের এক হিন্দুস্থানি ব্যবসায়ীর পুত্র। কানপুর কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রদের দেখিয়া আমারও বাঙ্গালী হওয়ার সখ হইল। যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন ততদিন এ বাসনা পূর্ণ করিতে পারিনাই। শিশুকালেই আমার মাতার, মৃত্যু হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর আমার এই বাসনা পূরণের পথে অন্তরায় আর কিছুই ছিল না। আমি সব বিক্রয় করিয়া, সমস্ত টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা দিয়া কলিকাতা আসিয়া বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়া বাঙ্গালী সাজিতে চেষ্টা করিলাম। পোষাকে যদিও আমার হিন্দুস্থানীত্বটা কতক ঢাকিতে পারিলাম, তবু কথা এবং আচার ব্যবহারে তাহা ধরা পড়িয়া যাইত। ক্রমে মাষ্টার রাখিয়া বাঙ্গলা শিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং অল্প দিনেই বাঙ্গলা বেশ বলিতে ও পড়িতে শিখিলাম। তারপর বাঙ্গালী চাকর, ঠাকুর, ঝি রাখিয়া বাঙ্গলার আচার-নীতিগুলি কতকটা আপনার করিয়া লইলাম। বলিতে কি অল্প দিনের মধ্যেই আমি পুরাদস্তর বাঙ্গালী হইয়া গেলাম। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় আমি বাসা

লইয়াছিলাম আমার বাটীর পাশেই লোকেন গুহ নামে এক বাঙ্গালী বাবু বাস করিতেন। তাহার একটী মেয়ে ছিল, সন্ধ্যাবেলা হাওয়া খাইতে ছাদে উঠিলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। ক্রমে আমরা পরিচিত হইয়া গেলাম এবং ছাদে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা বলিতাম। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর এক বন্ধুর সাহায্যে লোকেন বাবুর নিকট আমাদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। লোকেন বাবু কি উত্তর করিলেন জান, স্নেহ? তিনি বলিলেন 'মেড়ো ছাতুখোরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে? তার চেয়ে মেয়েকে হাত পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেব' বন্ধু আমার ধন দৌলত সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিলেন, কিন্তু লোকেন বাবু কিছুতেই রাজী হইলেন না। লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া গেলাম, মনে হইল ইহা উত্থাপন করিতে যাওয়াই ভুল হইয়াছে। সমস্ত পাড়াটিও এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন করিতে লাগিল। সকলেই নানা প্রকার কটূউক্তি এবং বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করিল না। আমার ঝি সেই সমস্ত কথা আমার কানে আনিয়া পৌছাইত। তাহার পর হইতে ছাদে উঠা বন্ধ করিয়া দিলাম।

'কয়েক মাস পর লোকেন বাবুর কন্যার এক ডেপুটীর সাথে বিবাহ হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরেই আমি নাম বদলাইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। কলিকাতা ত্যাগের সময় আমার মাথা ঠিক ছিল না। তোমরা বোধ হয় জান যে আমি এত চঞ্চল এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে সামান্য কারণেই এখানে আসিয়া খৃষ্টান হইতে চাহিয়াছিলাম।' এই স্থানেই অপূর্ব্ব হঠাৎ তাহার অতীত কাহিনী শেষ করিল, কেবল একটী কথা গোপন করিয়া গেল। গত কল্য কলিকাতা হইতে তাহার এক বাঙ্গলী বন্ধুর পত্রে সে অবগত হইয়াছে যে লোকেন বাবুর কন্যার কয়েক মাস হইল মৃত্যু হইয়াছে।

পরদিন প্রাতে বাটীর বাহির হইতেই দরজায় একটি ভদ্র লোককে দেখিয়া অপূর্ব্ব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও কিছু ন বলিয়া ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া গেল। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় অখিল বাবুর স্ত্রী তাহাকে জানাইলেন, যে স্নেহকণার বিবাহের সম্বন্ধ হঠাৎ সুস্থির হইয়া গেল। তিনি বলিলেন যে স্থানীয় ডেপুটী বাবু নিজেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এমন কি, তিনি

ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত। গৃহিনী আরও বলিলেন যে ডেপুটী বাবু পূর্ব্বে আর এক বিবাহ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ছেলে পেলে নাই এবং তাহার বয়সও কাঁচা। অপূর্ব্বের মুখ পাংশু হইয়া গেল; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস অতি কষ্টে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া কেবল মাত্র "তা বেশত" বলিয়াই সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়া একেবারে সোজা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। প্রাতঃকালে যে লোকটীকে দেখিয়া অপূর্ব্ব চমকিয়া উঠিয়াছিল হঠাৎ তাহার অখিল বাবুর বাড়ীতে আগমনের কারণ কিছুই বুঝিতে এখন আর বিলম্ব হইল না। ইনিই সেই লোকেন বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন আবার ইনিই স্নেহকণাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন। এক মুহূর্ত্তে যেন অপূর্ব্বের সেই পুরাতন লুপ্ত প্রায় স্মৃতিগুলি আবার সজীব হইয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখে সেই রজনীর দৃশ্য, যে রজনীতে শঙ্খের ধ্বনির সহিত হুলুধ্বনি মিশাইয়া লোকেন বাবুর কন্যার এই বাঙ্গালী ভদ্র লোকটির সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। অপূর্ব্বের বুকে কে যেন পর্ব্বত চাপিয়া ধরিল সন্ধ্যাবেলাই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বিবাহের পূর্ব্বেই অপূর্ব্ব আসানসোল ত্যাগ করিল। তাহার শরীর যেন ক্রমেই শীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। বহু দিন যাবতই সে হৃদরোগে ভুগিতেছিল। কিন্তু এ কথা কাহাকেও জানায় নাই এবং জানান আবশ্যক মনে করে নাই। কলিকাতা আসিয়া সে বড় ডাক্তার দেখাইল। ডাক্তার বলিল যে তাহার শরীরের অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। চুনারে হাওয়া বদলাইতে যাওয়া সুস্থির হইল।

কয়েক সপ্তাহ হইল অপূর্ব্ব চুনারে আসিয়াছে। তাহার বাড়ীর পার্শ্বে এক হিন্দুস্থানী লালা বাড়ী লইয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই জানা গেল যে ইনি কানপুরের অধিবাসী এবং অপূর্ব্বের পিতার একজন বাল্য বন্ধু এবং ইহাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না যে অপূর্ব্বের পিতা লালা রামকিষণলালের কন্যার সহিত অপূর্ব্বের বিবাহের সম্বন্ধটা তাহার যখন ৬ বৎসর বয়স তখনই একরূপ সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু অপূর্ব্ব খৃষ্টান হওয়াতে আর সে বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই;—হিন্দুস্থানী আচার ব্যবহার পরিহার করিয়া

বাঙ্গালী সাজাতে অপূর্ব্বের নামে তাহাদের সমাজে এইরূপই রটিয়া গিয়াছিল। রামকিষণের সে মেয়ের অপর জায়গায় বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বিবাহের পরই বিধবা হওয়াতে সে সেই পিত্রালয়েই বাস করিতেছিল। লালা রামকিষণ অপূর্ব্বকে আর পৃথক বাড়ীতে থাকিতে দিলেন না, বিশেষ সেখানে তাহাকে সেবা যত্ন লইবারও আর কেহ ছিলেন না। তাই অপূর্ব্বকে লালার বাড়ীতেই উঠিয়া আসিতে হইল। লালার স্ত্রী এবং কন্যা চঞ্চল কুমারী সর্ব্বদাই প্রাণপণে অপূর্ব্বের শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

চুনার ত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার পর লালা রামকিষণ নিজেই অপূর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আর্য্য-সমাজের প্রথানুযায়ী চঞ্চলকে সে বিবাহ করিতে রাজী আছে কিনা। অপূর্ব্ব কিছু মাত্র আপত্তি নাই এই মর্ম্মে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিল। হঠাৎ এক দিন কানপুরের ব্যবসায়ী মহলে সোর পড়িয়া গেল। যে লক্ষণরামের ছেলে হরবিলাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং লালা রামকিষণের বিধবা মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ।

নানা কথা।

১। বিগত ২৫শে মাঘ ফরিদপুর জেলান্তর্গত তুগলদিয়া গ্রামে স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র বসুবর্ম্মা মহাশয়ের ক্ষত্রিয়াচারে তোরণ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধোপলক্ষে তুগলদীয়া ছাগলদী, বিনোকদিয়া, বাঘুটিয়া, হরিণা, সাভার, কল্যাণপট্টি, কাগদী শাকপালদীয়া, লস্করদীয়া, লক্ষণদীয়া, বরদীয়া, ফুকুরা, বাংরাইল, কেশবদীয়া, রাহুতপাড়া, কামালদীয়া, উলুকান্দা, ধুতুরাহাটী, রামকান্তপুর, চাঁদপট্টি, চণ্ডীদাসদী, চাঁদড়া, গালিগ্রাম, ডাঙ্গারপাড় প্রভৃতি গ্রাম হইতে সমাগত বহু সংখ্যক কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (প্রাণপুর)

তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ (সিঙ্গারডাঙ্গা), কালীকান্ত চৌধুরী (কোটালীপাড়া উনশিয়া) কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য, (ধাপুকা) হৃষ্টিদেব ঠাকুর (কোটালীপাড়া) বিশ্বাম্বর ভট্টাচার্য্য (উজিরপুর), কালিদাস চক্রবর্ত্তী (আমগ্রাম, যশোহর) কালীপ্রসন্ন মজুমদার (ব্রাহ্মন্দী) কুঞ্জবিহারী মজুমদার (মাণিকদহ), হেমচন্দ্র মজুমদার (ব্রাহ্মন্দী), বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, ভবনাথ চক্রবর্ত্তী (আর্য্য-দত্তপাড়া) হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পিঙ্গলিয়াধাবী, বরিশাল), শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বাটাজোড় বরিশাল), তারকচন্দ্র রায় (কাঠাদিয়া, বিক্রমপুর) লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের উপস্থিতিতে এক বিরাট কায়স্থ সভা হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে এবং ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি যুক্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা প্রায় তিনঘণ্টা কাল শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন। উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়নাধিকার বিষয় সংশয়াতীতরূপে প্রতিবদ্ধ হয়েন।

যশোহর জেলার মধুমতী নদীর তীরে ইতনা অবস্থিত। এই বৃহৎ গ্রামে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত এবং সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের বাস। বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠায় প্রভৃত প্রভাবে ইতনা সমাজস্থান বলিয়া সুপরিচিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ অনেক কায়স্থ নানা স্থান হইতে এই রমণীয় স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের কুলগৌরব, ধর্ম্মে ও জ্ঞানে কায়স্থ সমাজের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিগত ১৭ই ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ইতনার বিখ্যাত রায় মহাশয়দিগের বহির্ব্বাটীস্থ বৃহৎ নাটমন্দিরে কায়স্থ সভার বিরাট অধিবেশন হয়। ইতনা আর্য্য কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায় (অবসর প্রাপ্ত সেরেস্তাদার, জজকোর্ট) মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নবদ্বীপের অধ্যাপক এবং দিনাজপুরাধিপতির সভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়

কায়স্থের জাতিতত্ত্ব ও সমাজ সংস্কার এবং বঙ্গীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা সমবেত কায়স্থ মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বাবুর বক্তৃতা শ্রোতাগণের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, উপনয়ন সংস্কার অবলম্বন ভিন্ন কায়স্থ সম্প্রদায়ের জাতীয় সম্মান রক্ষার উপায়ান্তর নাই।

অতঃপর সভাপতি পণ্ডিত মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়ন গ্রহণের সানুকূল প্রমাণ ও ব্যবস্থা দ্বারা বিরুদ্ধ প্রমাণ খণ্ডন করেন।

ইতনা গ্রামস্থ কায়স্থগণের মধ্যে অনেকের মনে উপবীত গ্রহণ অসঙ্গত এইরূপ ধারণা ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এবং মাখন বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ যে অতি সঙ্গত এবং বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা সকলেই বিশেষরূপে ধারণা করেন।

অতঃপর বহু আলোচনা ও মীমাংসান্তে স্থিরীকৃত হইল যে গ্রামস্থ সমস্ত কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে অতি শীঘ্রই সংস্কারান্বিত হইবেন।

রাত্রি ৯ ঘটীকার সময় সভাপতি এবং প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় যশোহর জেলার মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত আটিকবায়না গ্রামে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাস্থলে দীঘল বায়না, রুদ্র বায়না, বোল বায়না, পণ্ডিতের বায়না, হেলেঞ্চা, যোগীবরাট, পাঁচুড়িয়া, লাহুড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পাঁচুড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেনবর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্যর বর্ণনা করেন।

অতঃপর প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। মাখন বাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব

সম্বন্ধে অনুমান, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা সুপ্রমাণ করেন এবং কায়স্থ মাত্রেরই উপনয়ন গ্রহণ করার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকলকে বিশদ ভাবে বুঝাইলে উপস্থিত কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন। প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাব মতে সভাস্থলেই বিগত ২৯শে ফাল্গুন (দোল পূর্ণিমার দিবস) উপনয়ন গ্রহণের দিন অবধারিত হইলে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার যশোহর জেলান্তর্গত ইতনা গ্রামের রায় ভবনে এক বৃহৎ কেন্দ্রে একাদশবর্ষ বয়স্ক বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ সর্ব্বসমেত ৮৫ জন কায়স্থের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কোটালীপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্য এবং দিনাজপুর মহারাজের সভাপণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তন্ত্রধার এবং কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ও যজ্ঞরক্ষা কার্য্যে কায়স্থের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় ব্রতী ছিলেন। স্থানাভাব বশতঃ এই কেন্দ্রের উপনীত মহোদয়গণের নাম মুদ্রিত করা গেল না।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন (দোল পূর্ণিমার দিবস) যশোহর জেলান্তর্গতঃ আটকবাধনা গ্রামের সরকার মহোদয় দিগের আলয়ে একটী কেন্দ্রে স্থানীয় একাদশ বর্ষের বালক হইতে নবতি বর্ষের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ৩৫ জন কায়স্থের সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যথাক্রমে তন্ত্রধারক ও আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। উপবীতীগণের নাম ধাম স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হইল না।

বিগত ৯ই ফাল্গুন মঙ্গল বার রাজবাড়ীর পোষ্টমাষ্টার স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সরোজকুমার রায় দেববর্ম্মা এম, এ সহিত কালীঘাট গোবিন্দ রায়ের লেন নিবাসী ৺নলিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শিশিরবালা দেবীর শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া যথাশাস্ত্র সদাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

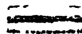
বিবাহ সভাস্থলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ এবং সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর জেলান্তর্গতঃ আর্য্যদত্তপাড়া নিবাসী ৺কালীপ্রসন্ন দত্তবর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল এবং গোবিন্দলাল দত্তবর্ম্মা মহাশয় গত ১লা পৌষ তারিখে ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে নৈহাটী ৺গঙ্গাতীরে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

বিগত ২১শে মাঘ শনিবার উলুকান্দা (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বসুবর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ৺বিজয়শঙ্কর বসুবর্ম্মার আদ্যকৃত ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে।

বিগত ১লা বৈশাখ শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী নিবাসী ৺উমাকান্ত ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন।

আর্য্যদত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী এবং প্রাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অশেষ কল্যাণ ভাজন প্রচারক শ্রীমান মাখনলাল ধরবর্ম্মার অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ শ্রাদ্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা এজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত শ্রীমানের দীর্ঘজীবন এবং মঙ্গল কামনা করি। ভগবৎ কৃপায় তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য এই প্রকারে সিদ্ধির পথে সত্বর অগ্রসর হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়গোপাল সরকারিনর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব পর্য্যায়। Reg. No. C. 653

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৯ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

ফরিদপুর।

বার্ষিক মূল্য—২৲। প্রতি সংখ্যা—৵০

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)



আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

৭ খণ্ড। { জ্যৈষ্ঠ মাস। } ২য় সংখ্যা

মহাসত্য।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জনৈক ব্রাহ্মণ

[illegible] নীরবে [illegible]

[illegible]

[illegible] বদন,—

[illegible] উপনীত

[illegible] মাত্র [illegible]

[illegible] দ্বারে

[illegible]

কুটির [illegible]

[illegible] অনাহারে।

[illegible] মৃত্যুদ্বারে

[illegible] বক্ষিবরে—

"[illegible]"

শুনিয়ে মধুর বাণী
রক্ষিকুল চূড়ামণি
লাগিল ভাবিতে—
"কেবা এই সাধুজন ?
কেন প্রাতে আগমন
কোন্ কার্য্য তরে
প্রভুপাশে সমাগত ?
প্রাতে বুঝি নিদ্রাগত
প্রাসাদের 'পরে"
হেরিয়া বিলম্ব তার
সাধু ক'ন পুনর্ব্বার
" কেন চিন্ত রক্ষ ?
আছি যদি অনাহারে
ভাবিও না তার তরে,
চাহি নাক ভক্ষ্য।
অন্য কোন কার্য্য নাহি
বারেক সাক্ষাৎ চাহি
তোমার প্রভুর,
বহু ক্লেশ সহি আজি
সেই হেতু আসিয়াছি
হতে বহু দূর।"
প্রভু নিদ্রা ভগ্ন তরে
কেহ নাহি অগ্রসরে
স্তব্ধ রক্ষিগণ,
পুনঃ পুনঃ অনুরোধে
তাহারে বিরক্ত বোধে
করিল তাড়ন

দ্বিতল হইতে হেরি
গৃহস্বামী ত্বরা করি
যথাযথ বেশে,
তিরস্কারি রক্ষকেরে,
ডাকিলেন দ্বিজবরে
আসি দ্বারদেশে।

প্রণমি তাঁহারে ক'ন,—
"কিবা হেতু আগমন
কুটিরে আমার,
এমন প্রভাত কালে,
এখন পূরব ভালে,
মুছেনি আঁধার?"

দ্বিজ, অনাদর তরে,
কহিলেন রোষ ভরে,
প্রদীপ্ত আননে,—
"ধনী-গৃহ অনুমানে
এসেছিনু এইখানে
ভিক্ষার কারণে।

কেন পুনঃ ডাক ফিরে?
অপমান লয়ে শিরে
চলি নিজ কাজে;
ধনিগৃহে আগমন,
ধনী-সহ আলাপন,
সাধুর কি সাজে?"

তেজপূর্ণ নম্রবাণী
প্রভু নতশিরে শুনি
পড়ি' তাঁর পায়,

কহে জুড়ি দুটী কর—
"ক্ষমা-কর সাধুবর
এই অভাগায়,
যাহা চাহ লহ তুলে,
তোমার চরণ তলে
সকলি ঢালিয়া
দিব যাহা মোর কাছে,
গৃহেতে রক্ষিত আছে"—
একথা বলিয়া
গৃহ পানে চলি যায় ;
ডাকি সাধু ক'ন তায়—
"যদি কিছু তব
আপন নিজস্ব বলি
থাকে; লয়ে এস চলি,
সেই আমি লব।"
শুনি ক'ন গৃহস্বামী,—
"বুঝিতে না পারি আমি,
কি চাহ ব্রাহ্মণ ?"
"যদি কিছু সাথে করে
এনে থাক, দেহ মোরে
যা' তব আপন।"
শুনিয়া বিস্ময় ভরে,
সাধুর চরণ 'পরে
লুটাইয়া পড়ি'
কহে,—"প্রভু কিছু নাই।
আমি শুধু আছি,—তাই,
লহ সাথে করি।"

শাকদ্বীপ।

(শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা)।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভৌগলিক অবস্থার আলোচনা করিতে হইলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়কল্প বলিয়া বিবেচনা করি। পরম তত্বজ্ঞ প্রাচীন মহর্ষিগণ বর্ষ সমূহের যেরূপ নৈসর্গিক অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন,—এই পুরাণে সেই সমস্ত আনুক্রমিক অবস্থা যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিমালয়ের দক্ষিণে এবং সাগরের উত্তরে এই ভারতবর্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই বর্ষের প্রজাগণ ভারতী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মনু, প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া 'ভরত' নামে অভিহিত এবং তৎপ্রতিপালিত বলিয়াই এই বর্ষ, ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়।

প্রাচীনতম কালে এই ভারতবর্ষ নব ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এই নব ভাগ সাগরদ্বারা পরস্পর ব্যবহিত হইয়া অবস্থিত ছিল বলিয়া, ইহার এক ভাগ হইতে অন্য ভাগে গমনাগমন করা অতিশয় দুঃসাধ্য ছিল। সেই অতি প্রাচীন ভৌগলিক অবস্থার কথাই পুরাণে আছে :—

'ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তেত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৪৯ অঃ ১২শ শ্লোক)

এক একটি ভাগ এক একটি দ্বীপ বিশেষ এবং নব ভাগে বিভক্ত দ্বীপাত্মক ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত ও পশ্চিম প্রান্তে তখনও যবনগণ বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত নয়টি বিভাগ মধ্যে প্রথমে মধ্যদেশীয় জনপদ। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষত্রিয় জনপদ। এই বিভাগ মধ্যে :—

"বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরা কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ॥
শকাঃ হূণঃ কুলিন্দাশ্চ পারদা হারহূণকাঃ।
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু সৌবীর মদ্রকাঃ॥

রমণা রুদ্ধকটকা কেকয়া দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্য শূদ্রকুলানি চ॥"

অর্থাৎ—বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পল্লব চর্ম্মখণ্ডিক, শক, হূণ, কুলিন্দ, পারদ,হারহূণ, রমণ, রুদ্ধকটক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবির, মদ্রক ও কেকয় এবং দশমালিক—এই সকল ক্ষত্রিয় জনপদ লইয়া যে বিভাগ বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে বৈশ্য ও শূদ্রবর্গও বাস করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেই অতি প্রাচীন কালে নব ভাগে বিভক্ত দ্বীপাত্মক এই ভারতবর্ষেরই ক্ষত্রিয় জনপদ নামক বিভাগটিতে শকদেশ বা শাকদ্বীপ বর্ত্তমান ছিল। তৃতীয়তঃ, উদীচি জনপদ নামক বিভাগ। চতুর্থ, প্রাচ্য জনপদ নামক বিভাগ, পঞ্চম দাক্ষিণাত্য, ষষ্ঠ পাশ্চাত্য, সপ্তম সম্পরীত, অষ্টম বিন্ধ্য প্রদেশ, এবং নবম পর্ব্বতাশ্রয়ি বা পার্ব্বত্য। এই নয়টি বিভাগের প্রত্যেকটিই যেন এক একটি দ্বীপরূপে অবস্থিত ছিল। প্রত্যেকটি বিভাগের এক একটী দেশের নাম হইতে দেশবাসিগণ পরিচিত হইতেন।

প্রাচীন ঋষিগণও এই পৃথিবীকে চতুর্মহাদ্বীপবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত চারিটী মহাদ্বীপের নাম—ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমাল ও উত্তর-কুরু। এতন্মধ্যে ম্লেচ্ছ পরিপূর্ণ কেতুমাল পশ্চিমে ও পুণ্যচেতা ব্যক্তিবর্গের বাসভূমি উত্তর-কুরুবর্ষ উত্তর দিকে অবস্থিত। উত্তর কুরুবর্ষের অবস্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

"উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥

অর্থাৎ উত্তর সাগরের সমীপে ও দক্ষিণাংশে কুরু নামক সিদ্ধ সেবিত ও পুণ্য প্রদ বর্ষ অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই উত্তর কুরুবর্ষই আর্য্য জাতির আদি নিবাস স্থল। বস্তুতঃ আমাদিগের শ্রুতি, স্মৃতি বা পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ অনুমানের পোষকতায় কোনও প্রমাণ নাই। শাস্ত্রে আছেঃ—

"সনৎকুমারাবরজা মানসাঃ ব্রাহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্তৈতে মহাভাগাঃ কুরবোনাম বিশ্রুতাঃ॥

'তত্রৈবেরাগতজ্ঞানৈ' সপ্তৈস্থৈঃ পুণ্যকীর্ত্তিভিঃ।
অক্ষয়ং ক্ষেমমপরং লোকং প্রাপ্তং সনাতনম্॥
তেষাং নামাঙ্কিতে দ্বীপঃ সপ্তানাং বৈ মহাত্মনাম্।
দিবিচেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা॥"

অর্থাৎ—সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার সাতটি মহাভাগ মানসপুত্র কুরুনামে পরিচিত। এই দ্বীপে সেই সপ্ত ঋষি 'জ্ঞানলাভ' করিয়া অক্ষয় কল্যাণরূপ মুক্তিপদ পাইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের নামানুসারে স্বর্গ ও মর্ত্তলোকে ইহা উত্তরকুরু নামে বিখ্যাত হইয়াছে।—ইহাতে বুঝায় যে তাঁহারা জ্ঞানলাভ করার জন্যই উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছিলেন। বেদাঙ্গ কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও আছে—

"এষাহি বাচোদিক্ প্রজ্ঞাতা।"

অর্থাৎ—উত্তর দিকই 'বাক্যের দিক' বলিয়া কথিত হয়। এই উত্তর দিকেই লোকে ভাষা শিক্ষার জন্য গমন করিত।

ভদ্রাশ্ব বর্ষ মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। হিমালয়-শৈল-সংস্পৃষ্ট বলিয়াই এই ভারতবর্ষের অপর একটি নাম হৈমবত বর্ষ। এই বর্ষে গঙ্গা-দেবীর স্রোত সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া নলিনী, হ্লাদিনী, পাবনী নামক তিনটি স্রোতঃ পূর্ব্বদিকে এবং সিন্ধু, সীতা, চক্ষুঃ নামক তিনটি স্রোতঃ পশ্চিম দিকে ও ভাগীরথী নামক সপ্তম স্রোতঃ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তন্মধ্যে পশ্চিম দিকস্থ চক্ষুঃ নামক গঙ্গা স্রোতই শাক নামক জনপদকে প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে পতিত হয়, পুরাণে দেখিতে পাই। সুতরাং শক জনপদ ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত একটি অতি প্রাচীন দেশ, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

যে সময় এই ভারতবর্ষ নয়টি পৃথক পৃথক দ্বীপের সমষ্টি মাত্র ছিল, সেই সময়ই এই শক জনপদ ভারতেরই অন্তর্গত একটি দ্বীপরূপে পরিচিত হইত এবং শাকদ্বীপ বা শকদ্বীপ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কালে উহাই পঞ্চনদ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ 'শাকল' নামক জনপদে পরিণত হইয়াছে, বুঝা যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায় পাঠে জানা যায় যে এইরূপ অনেক অন্তর্দ্বীপ এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, কারণ ঐ পুরাণেই এই প্রসঙ্গে 'ক্ষুদ্র দ্বীপ সহস্রশঃ' প্রভৃতি উক্তি আছে। কাল সহকারে কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কালের তুল্য বলবান আর কেহই নাই। যাঁহারা বর্ত্তমান সিংহলকে সেই

প্রাচীন 'লঙ্কাদ্বীপ' বলিতে চাহেন, 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত' তাঁহারা বুঝিবেন, সেই 'লঙ্কা' কোথায়! কালের কি অপরিম শক্তি! বড় বেশী দিনের কথা নহে, এই বঙ্গদেশ যখন কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশের মর্য্যাদা রক্ষক মহারাজ বল্লাল সেনের শাসনাধীন ছিল, সেই দ্বাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গদেশেই অনেক গুলি দ্বীপ বর্ত্তমান ছি", কিন্তু এখন আর সে গুলি দ্বীপ নহে!

প্রাচীন ভারতের নাগদেশের মধ্যভাগে যে অঙ্গদ্বীপ ছিল, যাহার উত্তর প্রান্তভাগ সাগর স্পর্শ করিত, সেই অঙ্গদ্বীপ এখন 'অঙ্গদেশ'! যবদ্বীপ, বিন্ধ্যস্থান, মলয় দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহ দ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের অন্তর দ্বীপ গুলির কতক আছে, আর কতক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে? তাই ঋষি বাক্য—

"এবমেকমিদং বর্ষং বহুদ্বীপমিহোচ্যতে।
সমুদ্রজলসম্ভিন্নং খণ্ডং খণ্ডীকৃতং স্মৃতম॥"—

মিথ্যা নহে। এই ভারতবর্ষ বহুবিধ দ্বীপে বিভক্ত এবং সমুদ্র দ্বারা পরস্পর বিভক্ত ভাবে অবস্থিত ছিল। শাকল বা শাকদ্বীপ ভারতেরই একটি অন্তর দ্বীপ। প্রাচীন ভারতের ন্যায় অন্যান্য মহাদ্বীপেও বহুদ্বীপপুঞ্জ বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রেই আছে।

আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শাকদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন,— যে সকল প্রদেশ লইয়া 'শাকদ্বীপ' বলা হইতেছে, ঐ সমস্ত স্থানই ম্লেচ্ছদেশ। আমাদিগের শাস্ত্রে আছে যে, শাকদ্বীপ পুণ্যপ্রদ লোক প্রসিদ্ধ জনপদ। সে স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ছিল। শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপধারী ভগবান বিষ্ণু বা মিত্রদেব সর্ব্বদা পূজিত হইতেন; সুতরাং উহা কদাপি ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া ধারণা করা বাতুলতা মাত্র। শাকদ্বীপের ধর্ম্মজ্ঞ নরগণ স্বধর্ম্ম প্রভাবে পরস্পর রক্ষিত হইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্কর বর্ণ নাই। সকলেই ধর্ম্মাশ্রিত, ধর্ম্মের কোন প্রকার ব্যাভিচার না থাকায় প্রজাগণ একান্ত সুখী এবং ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সাম, যজু, ঋক ও অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদানুরক্ত ছিলেন। শাস্ত্রের এই সকল বাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমানদাশঙ্কর দাসগুপ্ত।)

এই খানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বুধগণের দুই একটি মতামত দেওয়া অসঙ্গত হইবে না।—

(১) Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Wright বলেন :—
" He is more learned than all of us put together. To ask your Swamiji of your right to speak, is to ask the sun its right to shine. "

(২) The New York Herald পত্রিকা লিখেন :—
" He is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. "

এতদ্ব্যতীত, the Boston Evening Transcript, New York Critique ইত্যাদি পত্রিকায় বহুবিধ সমালোচনা দৃষ্ট হয়। তৎসমুদয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহা সভার অধিবেশনের পরে, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন; Boston ও New Yorkএ কয়েকটী বেদান্ত ক্লাশ খুলেন, তাহাতে অনেক ছাত্র হয়; অনেক মার্কিন নর-নারী তাহার শিষ্য হন। ইতি মধ্যে তিনি একবার ইংলণ্ডে যান এবং সেখানেও অনেক বক্তৃতাদি দেন। কয়েকজন ইংরাজ স্ত্রী পুরুষও তাহার শিষ্য হন। তার পর তিনি পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাগমন করেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি যে বক্তৃতাবলী দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কিছু বলা অসম্ভব। যেমন কোন দ্রব্য না খাইলে তাহার

অস্বাদন পাওয়া যায় না, তেমন তাহা না পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে কিছু ধারণা করা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে তিনি চিকাগো বক্তৃতায় আমাদের সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মের একটি New Synthesis ও complete re-statement অর্থাৎ নবীন গঠন ও পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন এবং অন্যান্য বক্তৃতায়ও আমাদের জাতি, ধর্ম্ম, দেশ ও আদেশের অক্ষত মহিমার কথা অত্যন্ত গৌরবের সহিতই প্রচার করিয়াছেন। শুধু তাহা নহে,—খৃষ্টানদের দেশে খৃষ্টধর্ম্মও খুব বুঝাইয়া আসিয়াছিল; সে বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে তিনি কোন হীন বা পরাধীন দেশের প্রতিনিধি নহেন,— বরং মনে হয় তিনি যেন জগতের কোনও শ্রেষ্ঠ দেশ হইতেই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ লইয়া তাহা মায়া-মোহ-বদ্ধ, ভোগ-শ্রান্ত-কাতর পাশ্চাত্য নর-নারী কুলের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। সত্যই, সে গুলি পড়িতে পড়িতে আমরা গৌরবে অবিভূত হই। এমনি ভাবে আমাদের জাতির গৌরব প্রচার করিবার জন্য এমন একটি নির্ভীক মহাপুরুষও যে আমাদের জন্য জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই।

তাঁহার আমেরিকায় কার্য্য সম্বন্ধে অনেক আমেরিকানই তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা যে ভারতবর্ষের শুভ্র জ্ঞান বৈরাগ্যের বাণী পাইয়া মুগ্ধ ও অনুগৃহিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাহারা সকলেই একমত। বস্তুতঃ ভারতের আলোকের জন্যই যেন তাহাদের দেশ অপেক্ষা করিতেছিল।

মার্কিন ও তৎসঙ্গে সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন ব্যতীত, স্বামীজির আমেরিকার কার্য্য ভারতেরও অপরিসীম উপকার করিয়াছে। এ দেশে যখন একবার কথা হইতেছিল যে, ইংলণ্ডের ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশবাসিদের, আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য লণ্ডনে একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত, তখন ভারতের সুসন্তান শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ তাহাতে আপত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"One visit of Swami Vivekananda to the West, did more than a hundred Sessions of Congress in London can do."

বাস্তবিকই আমাদের নত মস্তক জগতের সমক্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উন্নীত করেন। আমরা যে শুধুই হীন, অপদার্থ, সম্বল হীন, দীন ভিখারী নই, জগতকে যে আমাদেরও কিছু দিবার আছে, তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাদের

দেখাইয়া যান। একজন ভারতীয় যুবক-সন্ন্যাসীকে গুরু স্বীকার করিয়া যে শত শত পাশ্চাত্য নর-নারী অবনত মস্তকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে যুগান্তর এবং ইহাকেই স্বামিজীর ভাষায় বলা যায় 'conquest of the West by Vedanta' অবশ্য তিনি তাহার সে আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সেজন্য যে অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভবিষ্যতে তাঁহার সে কার্য্যের পূর্ণ সফলতা আনয়ন করিবে। তিনি বলিতেন—" Let the machine be once set forth in motion and then it will work of itself" তদনুসারে তাঁহার উদ্বোধিত কার্য্য আজিও চলিতেছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী, প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেই আজ তাহার ভক্ত, শিষ্য, বা অনুচর দেখা যায়। অন্য দিকে, স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা গমনের পর হইতে সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র ও চিন্তা প্রণালীতে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা আশা করিতে পারি, ভারতীয় ধর্ম্মদর্শনের জয় পতাকা একদিন সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে উজ্জ্বল ও সুপরিস্ফুট জ্যোতিতে উড্ডীন হইবে।

স্বামিজী বলিতেন,—আদান প্রদান লইয়াই ব্যক্তি ও জাতির জীবন। ভারত যদি ইউরোপকে কিছু না দিতে পারিয়া কেবল তাহার নিকট হইতে দানই গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার আর উত্থানের শক্তি কোনও দিনই আসিবে না। তাই ইউরোপের নিকট হইতে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বহির্জ্ঞান শিক্ষার পরিবর্ত্তে, আমাদের তাহাদের কিছু দিতে হইবে এবং যাহা আমরা দিতে পারি,—ধর্ম্ম, দর্শন, সত্য, জ্ঞান।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামিজী ভারতের দুঃখ, দৈন্য ও অসারতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহার মহাপ্রাণ দীন দেশবাসিদের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই; দিবসের পর দিবস তাঁহার বক্ষ সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছে, গভীর চিন্তামগ্ন উন্মাদের ন্যায় তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন। সাধকের কেন্দ্রীভূত মনের অন্বেষণ প্রার্থনায় ভগবানের আসন পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে। তারপর তিনি তাঁহার আশীর্ব্বাদ শিরে ধরিয়া ধূলি ধূসরিত ভারতের অবস্থায় একটা যুগান্তর আনিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধ হয়েন এবং তিনি তাহার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধি

নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বীজ বপন করিয়াও গিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার বিশ্বাস অব্যর্থ সত্য, সে বীজের দৈনন্দিন বিকাশ, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হইবে। তাহা আমাদের পরিবর্ত্তনময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল। সেজন্য দায়ী তিনি নহেন। তিনি তাহার তীক্ষ্ণ ত্রিকালদর্শী দৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন—ভারত মরে নাই, ভারত এখনও সঞ্জীবিত। ভারতের প্রাণ ধর্ম্মে এবং সেই ধর্ম্ম সহায়ে ভারতকে যে পথে চালিত করা যাইবে ভারত সেই পথেই চলিবে। তাই তিনি ভারতকে বলিয়াছিলেন—'ভারত' ধর্ম্ম ছাড়িও না, ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত কর, পুনরায় প্রাণ পাইবে। কিন্তু এটাও জেনো, বহুকালের নিশ্চেষ্টতা প্রসূত তোমার বিশাল দেহের প্রতি অনুতে যে ঘোর তমো-গুণাবলীর আবর্জ্জনা জমিয়াছে, তাহা তোমার সর্ব্বাগ্রে ঝাটিয়া ফেলিতে হইবে। সেইটাই আজ তোমার মুখ্য ধর্ম্ম। সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম কর, মহা-রজোগুণে দেশ পরিপূরিত কর, অন্ন বস্ত্রের হাহাকার দেশ হইতে সমূলে বিদূরিত কর, ধর্ম্ম তোমাকে ছাড়িবে না। বহু শত শতাব্দির সাধনায় সঞ্জীবিত ধর্ম্মভাব তোমার প্রাণ যন্ত্র, তোমার রক্তের প্রতি অনুতে তাহার ছায়া বিদ্যমান। পরিশেষে তুমি তোমার কৈবল্য বা চরম লক্ষ্য লাভ করিবেই।'

সত্যই রুগ্ন, ভীত, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মহাতমসাচ্ছন্নের আবার ধর্ম্ম কি সামান্য দুঃখে যে অবিভূত হয়, সামান্য বিপদ পাতেই যাহার প্রাণ বলহারা হয়, অন্ন বস্ত্রের অভাবে যে চির কাঙ্গাল, মানব জীবনের গৌরব যে জীবনে কোনও দিন অনুভব করে নাই, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাই তিনি আমেরিকায় ভারতীয় খৃষ্টান মিশনারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"It is an insult to a starving people to offer them religion. You christians! you go to save the souls of healthens, why don't you try to save their bodies? It is bread and not religion,—religion they have got enough,—that the starving millions of burning India cry out for with parched throats." এবং ভারতে যুবকগণকে বলিয়াছিলেন :—

(১) "You will understand God tbetber hrough foot-ball than through Gita.

(২) " 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।'—এ শুধু মানসিক বল সম্বন্ধে কথিত হয় নাই। ইহা প্রয়োজনীয় শারিরীক সম্পদ সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। শরীর যথাযোগ্য রূপে সুস্থ ও সবল না হইলে, প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনের অধিকারী হওয়া যায় না।"

(৩) "আগামী ৫০ বৎসর তোরা শুধু তোদের দেশের সেবাই করবি। এখন কেবল ঐ এক দেবতাই জাগ্রতা। আর সব দেব দেবী ঘুমুচ্ছেন।"

এই সব শিক্ষার জন্য ভারতে রজোগুণের প্রথমোদ্বোধনে যাহা ঘটিতেছে, তাহা তাহার প্রাকৃতিক জাগরণেরই ফল। তাহার জন্য কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। স্বামিজী বলিতেন—" Put the chemicals together and the result will take care of itself . "

এই স্থানে ভারতের সমাজিক আন্দোলন সম্পর্কে স্বামিজীর কয়েকটী মতামত উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না।

(১) কোনও নিম্নতম জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা তাঁহার মতে ঘোর অন্যায় এবং ভারতের বর্ত্তমান সমাজিক দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। তিনি বলিতেন—'They form the majority of the followers of our Dharma and they are outcastes on earth! What can we expect with such a condition of things. ?'

(২) তবে তিনি জবরদস্তি করিয়া কোনও সামাজিক সংস্কার আনয়ন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতানুসারে সমাজের জীর্ণ ও অধুনা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর প্রমাণগুলি সম্বন্ধে লোকের ধারণা সুস্পষ্ট হইলে, সমাজই তাহার কল্যাণার্থে যথাভাবে যথাসময়েই তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমাজ তাহা করিতে বাধ্য।

(৩) বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। National and Cultural Education-এর প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বহু বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেন—সংস্কৃত ভাষাই

আমাদের জাতীয় সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা রক্ষিত হইয়াছে। Cultural Education এর জন্য সংস্কৃত ভাষায় যথাযোগ্য প্রচলন দরকার।

(৪) ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সহায়ে দেশীয় শিল্পোন্নতির তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার আহ্বান জলন্ত অগ্নি শিখার ন্যায় উগ্র ও তীব্র। আমাদের নিশ্চেষ্টতা তাহার পক্ষে যেন একটা জীবন ব্যাপি জ্বালার বিষ ছিল।

(৫) 'The greatest prayer that he could make for his country was that she might have'—an Islamic body with a Vedantic heart.'

এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটি যে কত সুদূরগামী তাহা বুঝাইতে আর একটি পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে এ প্রার্থনার পরিপূর্ণতায় ভারতবাসীগণ সবল সুস্থ ও তেজস্বী হইবে এবং তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম্মের বৈশিষ্ঠতা রক্ষা করিয়াও, তাহা এক মহান সার্ব্বভৌমিক সত্যের শাখা প্রশাখা মনে করিয়া উদার মুক্ত শান্তিতে দিন যাপন করিতে পারিবে।

(৬) চরকা সম্বন্ধে তাহার একটি সুন্দর কথা আছে। তিনি পাঞ্জাব অবস্থান কালে তাঁহার একটি পাশ্চাত্য শিষ্যকে বলিয়া ছিলেন—

' Do you know what is the sound of th spinning-wheel? It is Shohom (সোঽহম)।'

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। স্বামিজীর ভাব কর্ম্মময় বিস্তৃত জীবনের কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিব? তাই আমি এক্ষণে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিবার চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

পল্লী-সমস্যা

(শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।)

পল্লীর অভাব সহস্রমুখী, সমস্যাও বহুবিধ। বর্ত্তমানে লোকের যে কত প্রকার সমস্যা, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না,—তন্মধ্যে খাদ্য সমস্যাদি কয়েকটিই বিষম সমস্যা। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, প্রত্যেকটাই যেন করাল বদনে পল্লীকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; অন্য দিকে খাদ্য সমস্যাই প্রকারান্তরে অর্থ সমস্যারূপে দাঁড়াইয়াছে। পল্লীর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ পল্লীর শিক্ষা ভাবও কম নয়; সুতরাং ইহাকেও একটি সমস্যার মধ্যেই পরিগণিত করিতে হইবে। শিক্ষাভাবের ও খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীর চিরস্বাস্থ্য সংবিদূরিত হইয়াছে; পল্লীর সে পূর্ব্বশ্রী আর নাই; পল্লীভূমি এখন ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কতকগুলি রোগাসুরের বিচরণভূমি হইয়াছে; পল্লীর সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি মজিয়া গিয়া শুভ্র ইষ্টক ও বালুকাক্ষেত্ররূপে বিরাজিত; পল্লীর সে লতাগুল্ম শোভিত সুন্দর বনরাজি ব্যাঘ্র, শূকর, শৃগাল, ও সর্পাদি পরিসেবিত হইয়া বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পথিকের প্রাণনাশে অভ্যস্ত হইয়াছে। এক কথায় পল্লীতে বাসের সুবিধা মোটেই নাই; তাই পল্লীর যিনিই ধনে, মানে বিদ্যায় একটু গরীয়ান হইলেন, অমনি তিনি জন্মভূমি পল্লী ছাড়িয়া সহরবাসী হইলেন। পল্লীর অভাব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সকলেই জানেন,—"শরীর রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম" কিন্তু আমাদের পল্লী গুলির যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে যেন বোধ হয় পল্লীবাসীই স্বেচ্ছাক্রমে সে ধর্ম্ম পালন করে না, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে, পল্লীর নানা অভাবের জন্যই পূর্ব্বকথিতরূপ ধর্ম্ম পালন সুকঠিন হইয়াছে। ষোল সতর বৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ায় এ দেশে লোক খুব অল্পই মরিয়াছে; তখনও ম্যালেরিয়ার ভীষণ ভ্রূকুটি বঙ্গভূমিতে পতিত হইয়াছিল না,—কিন্তু কালক্রমে ম্যালেরিয়াদি ব্যাধি সংহের যতই বিস্তার হইতে লাগিল, পল্লীর চিকিৎসকেরও যেন ততই অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এই অভাবের কারণ,—প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে,

পল্লীর চিকিৎসক পূর্ব্ব অনুপাতেই আছে। তখন ব্যাধির প্রাবল্য অল্প থাকিলেও, চিকিৎসকের সংখ্যা বেশী ছিল, কিন্তু এখন চিকিৎসক তৎপরিমাণ থাকিলেও ব্যাধির বৃদ্ধি হইয়াছে; এজন্য চিকিৎসকেরও অভাব পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়,—চিকিৎসকগণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর নিকট এই অর্থ সমস্যার দিনে আশানুরূপ অর্থপ্রাপ্ত না হওয়ায়, পল্লীর মায়া বিসর্জ্জন করিয়া সহর বা সহরতলীতে আশ্রয় লইতেছেন।

যাঁহারা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বহুল খরচে মেডিক্যাল, ক্যাম্বেল প্রভৃতি কলেজে পড়িয়া ডাক্তারী শিখিয়া আসেন তাহাদের আশানুরূপ অর্থ-প্রাপ্তি পল্লীতে বাস্তবিকই অসম্ভব; তাই তাহারা সকলের আশ্রয় স্থান যে 'সহর' তাই আশ্রয় করিয়া থাকেন। দেশে যদি এমন কোনও বিদ্যালয় থাকিত যেখানে অতি অল্প খরচে শিক্ষালাভ করা যায়, তবে আশাকরি, পল্লীর চিকিৎ-সকাভাব কিঞ্চিত বিদূরীত হইত। অনেক সময় দেখা যায়,—'তেলো মাথায় তেল সকলেই ঢালেন'। কর্ত্তৃপক্ষ মেডিক্যাল কলেজের বিস্তৃতির জন্য এবং কলেজের ভৃত্যগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য যথাক্রমে ২১,৫০,০০০৲ সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা ও ৫০০,০০০৲ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অবশ্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন কলেজ ও দ্বিতীয়তঃ, রাজধানীতে অবস্থিত। এরূপ একটি কলেজের জন্য এত টাকা ব্যয় কখনও দূষণীয় নহে, অথবা এরূপ ব্যয় কখনও অকারণ হইয়াছে বলিয়াও বিবেচিত হইবে না; কিন্তু যদি এই টাকার কিয়দংশও বাঙ্গালার চিকিৎসকাভাবের জন্য ব্যয়িত হইত, তবে পল্লীর লক্ষ লক্ষ আসন্ন রোগী মৃত্যুর কাল হইতে রক্ষা পাইত। যদি বাঙ্গালার কতিপয় জেলায় সাধারণ ভাবে দুই একটী করিয়া শিক্ষার নিমিত্ত কলেজ স্থাপিত হইত এবং অল্প খরচে ও অল্প সময়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিত, তবে দেশে চিকিৎসকের অভাবও বহু প্রকারে নিবারিত হইত। কিন্তু সেরূপ কিছু হওয়াও সুদূর পরাহত! অগ্র পশ্চাত সব দিকেই পল্লীর পক্ষে সব অনটন এবং শুধু একমাত্র পল্লীর পক্ষেই সব অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পল্লীতেই কেন যেন অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষা-ভাব প্রভৃতির কতিপয় দারুণ সমস্যা প্রবল বাত্যার মত আসিয়া পল্লীর হাড়-মাসগত হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি যে দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে চতুর্দ্দিকে জরাসুরের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইতেছে, ম্যালেরিয়ায় লোক ঘরে ঘরে রুগ্ন শয্যায় পড়িয়া আছে; চিকিৎসকের অভাব, ঔষধ পত্রও মিলিতেছে না;

লোকাভাব—পরিবারস্থ সকলেই শয্যাগত, মুমূর্ষ রোগীর শুশ্রূষা হইতেছে না; অর্থাভাবে দূর হইতে বা সহর হইতে চিকিৎসক আনাইয়া যে চিকিৎসা করিবে পল্লীবাসীর এমন সাধ্য নাই।—এখন এই দারুণ সমস্যাপূর্ণ দিনে, দীন পল্লীবাসীর আর উপায় কি ?

জননী।

(শ্রীরাধারমন দাস।)

উজলি দিগন্তে তরুণ ভাস্কর
উদিত রঞ্জিয়া অম্বর তল,
গাইছে পঞ্চমে প্রভাত সঙ্গীত
অতুল আনন্দে বিহগ দল।

ভাতিছে অত্যুচ্চ হিমাদ্রি শিখর
মরি কি কিরীট জননী শিরে,
মোহিছে জগৎ, মানব মণ্ডল
বিস্ময় বিহ্বল চাহিছে ফিরে।

দক্ষিণে বিতস্তা বামেতে যমুনা
দেবতা দুর্লভ সুধায় ভরা,
যুগল স্তনেতে ক্ষরিছে নিয়ত
মধুর শীতল পীযুষ ধারা।

প্লাবিয়া উরস ছুটিছে প্রবাহ
পূরবে পশ্চিমে অনন্ত তরে,
রচিত বিশাল, পয়োধি যুগল—
আরব বঙ্গোপসাগর নীরে।

দু'পাশে লম্বিত ভুজগ সদৃশ
মোহন মূরতি শ্যামল গিরি,
দ্বিভুজ প্রসারি স্নেহের জননী
রাখিছে সন্তানে বক্ষের 'পরি।

দিগন্তে বিস্তৃত বিনধ্য পর্ব্বত
অত্যুচ্চ বিটপী মণ্ডিত, মাঝে
শোভিছে মায়ের কটির উপরে
অপূর্ব্ব মেখলা, মোহন সাজে।

নীলাম্বু চরণ বিধৌত নিয়ত
ভারত সাগর তরঙ্গ স্পর্শে,
বিস্মিত আঁখিতে নেহারি নিমিষে
হরষে সেরূপ মধুর দৃশ্যে।

চক্ষুদান।

। শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা।

১

স্কুলের ছুটীর পর সুধীর বাড়ী আসিবার সময় দেখিল, সহপাঠী অনিল রাস্তার ধারে একটী গাছ তলায় দাঁড়াইয়া আছে, কিয়দ্দুরে তাহার পুথিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনিলের মুখখানি ম্লান, কপালের এক পার্শ্বে খানিকটা স্থান স্ফীত, পরণের কাপড় স্থানে স্থানে ছিন্ন, সার্টের আস্তিনও অনেকটা কাপড়ের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সুধীর অনিলের কাছে আসিয়া সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে? কি হয়েছে তোর?"

অনিল কোন জবাব দিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীর পুনরায় বলিল—"আরে, ব্যাপার কি? তোকে কেউ মেরেছে নাকি?"

তবুও অনিল নীরব। তখন সুধীর তাহাকে একটী ধাক্কা দিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"ওঃ—বুঝেছি। আজ শুধু মার খেয়েছিস্ বুঝি! দিতে পারিস্ নাই! তাই এত মান।"

এবার সুধীরের কথাগুলি অনিলের মর্ম্মে আঘাত করিল, একটু উচ্চৈঃস্বরেই বলিল—"মার খেতেও পারি, দিতেও পারি—পুরো ওজনে। তবে কি বল্‌ব? মা শুধু ভাবেন, আমিই সকলের সাথে মারামারি করি, তাই আজ নির্ব্বিবাদে শিবের মার গুলো হজম করেছি; দেখি, এতেও মা যদি সুখী হন্।"

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল—"এই যে দাদা বাবু! কখন ছুটী হয়েছে, এখনও বাড়ী যাবার নামটী নাই! ওঃ আজও আবার যুদ্দু নাকি? তুমি মারামারি ছাড়া কখনো থাক্‌তে পার না বুঝি? বাবা!"

ঝিকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া অনিল বলিল—"যা, যা, তোর আর বক্তৃতা কর্‌তে হবে না! তুই যে কাজে যাচ্ছিস্ তাই করতে যা।"

রাগের সময় খোকা বাবুকে বেশী কিছু বলা যুক্তি সঙ্গত নয় বুঝিয়া, ঝি একটু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, যা হবার হয়েছে, এখন বাড়ী যাও! সেখানে আবার কুরুক্ষেত্তর হবে এখন।"

পুস্তকগুলি গোছাইয়া অনিল বাড়ী আসিল। পড়িবার ঘরে গিয়া সবে মাত্র বই গুলি আলমারীতে সাজাইয়া রাখিতেছে, এমন সময় পাশের ঘর হইতে মাতা ডাকিলেন—"ওরে ও গাধা! আজ ছুটীর পর, এত দেরী করলি কেন? আজও কি মারামারি করে আস্‌লি? রোজই কি মারপিট্ করবি তুই"—বলিতে বলিতে মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের দিকে চাহিয়াই সরোষে বলিলেন "মরেছে! যা ভেবেছি ঠিক্ তাই! আচ্ছা, তোর কি হল, বল্‌তো? সব সময় মারধরই কর্'ব! ওরে ও গাধা! ও উল্লুক!—" উপর্য্যুপরি কয়েকটী চপেটাঘাত অনিলের পৃষ্ঠে সশব্দে পড়ায় সে বুঝিল, এখনও তাহার মারপিটের অধ্যায় শেষ হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কিন্তু মাতার তিরস্কার ও শাস্তির

একটী প্রতিবাদও সে আজ করিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া চাপটাঘাতের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এমন সময় পিতা আসিয়া ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে এত হৈ চৈ কিসের গো?"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন—"ওগো! হয়েছে, হয়েছে! তোমার জন্যই ছেলে এ রকম বিগ্‌ড়াইয়া গেল! সুধু আদর, সুধু আদর। ছেলে পিলেকে অত আদর দিলে, কখনও কি তারা ভাল হয়, না—শিষ্ট শান্ত হয়।"

মৃদু হাসিয়া রমেশ বাবু বলিলেন—'বলি, ব্যাপারটা কি? মুখবন্ধই তো কেবল শুন্‌ছি।'

তারাসুন্দরী হাত নাড়িয়া আরম্ভ করিলেন—'ব্যাপার শুন্‌বে? এই দেখ না,—কোথা থেকে আজও মারামারি করে এসেছে। কাপড়, জামা, সব ছিঁড়েছে, কপাল ফুলিয়েছে! এমন দুরন্ত ছেলে আমি জন্মে দেখি নাই। পড়া নাই, শুনা নাই, সব সময় কেবল মারামারির চেষ্টায় ফিরছে।"

রমেশ বাবু বলিলেন—"আহা! মারামারি তো আর বাতাসের সাথে হয় নাই! কার সাথে,—কেন,—মারামারি করল?

পুত্রের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, গলা চড়াইয়া গৃহিণী বলিলেন—"তোমার যে রকম কথা। আর কার সাথে মারামারি করবে? ছেলেদের সাথেই করেছে।"

অনিলের দিকে একটু করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, রমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কার সাথে মারামারি করলি?'

উন্নত দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাহিয়া অনিল বলিল—"শিবে আমায় খামখা কতক গুলো গাল দিল, কিন্তু ঝগড়া হবার ভয়ে, আমি তার কথার একটীও জবাব দিলেম না। তাতে সে আমার কাছে এসে বল্লে—'কিরে? গাল্‌গুলো তো বেশ হজম করলি। এখন এ গুলো হজম করতো! বেশ মিষ্টি!'—তার পরই আমায় ধাক্কা দিয়ে রাস্তার ধারের গাছতলায় ফেলে ঘুষি মেরে কপাল ফুলিয়ে দিল। আমি ইচ্ছে করলে, তাকে খুব শিক্ষা দিতেও পারতেম্, কিন্তু মা মনে করেন, আমিই শুধু মারামারি করি, তাই আজ শিবের গায়ে একটী আঁচড়ও দিই নাই।" তার

পর মাতার দিকে চাহিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"আজ আমি মারামারি করি নাই, মা! শুধু মার খেয়েছি।"

তারাসুন্দরী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শক্ত ভাবেই বলিলেন—"হ্যা, হ্যা, বোঝা গেছে! বাদ্‌রামি কর্‌তে গেছিলি বুঝি শিবুর সাথে, তাই সে আচ্ছা করে ঠুকে দিয়েছে! দেবে না? বেশ করেছে।"

অনিল আর তিষ্ঠিতে পারিল না, অশ্রুবেগ অতিকষ্টে সম্বরণ করিয়া, একবার পিতার দিকে চাহিল, তার পর ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। আজ আর তাহার জল খাবার খাওয়া হইল না।

২

"আচ্ছা দেখ! তুমি খামখা ছেলেটাকে সব সময় অত বকো কেন? আমি তো এক বারও দেখি না, তুমি ছেলেকে এক আধটুকু আদর করলে, কিম্বা মিষ্টি কথা বল্‌লে।"

"যাও, যাও! তোমার ও সব কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আদরে আদরে ছেলেকে তো মাথায় তুলেছ; একেবারে তার সর্ব্বনাশ করেছ! সমস্ত দিনই তো খেলা করে বেড়ায়! সকালেই ছেলেকে বলা হয় 'যা, খানিকটা দৌড়িয়ে আয়।' গেল আধ ঘণ্টা। তার পর যদিও বা পড়তে বস্‌ল, অম্নি দুই ঘণ্টা যেতে না যেতেই, আদর করে বল্লে—'এইবার স্নান করতে যা।' ছেলে স্নান করলেন, ভাত গিল্‌লেন তখন আবার তুমি বল "একটু খানি বিশ্রাম করে স্কুলে যাও।' আদর দেখে গা জলে যায়! কেন বাপু? এ বয়সে এত আয়েস কেন? এখন শুধু পড়বারই সময়; তা নয়,—খেলা কর, বেড়াও, স্তোত্রের বই পড়, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর ঘরে বস,—এ সব করেই তো ওর মাথা খেলে।

রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল্‌তে চাও, ছেলে দিন-রাত কেবল পড়াশুনাই করবে?"

তারাসুন্দরী এ প্রশ্নে যেন অবাক হইয়া গেলেন;—এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন উঠিতেই পারে, ইহা তাহার ধারণার অতীত! বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন—'তা নয় তো কি? ছেলে, সব সময়ই ছেলে; মেয়ে নয় যে পরের

ঘর করতে যাবে !—আমার ভাইদেরও তো দেখেছি, তারাও ৩। ৪ টা পরীক্ষায় পাশ করেছে ! তারা সব সময়ই পড়্‌তো। সন্ধ্যার সময় ঠাকুর ঘরে গিয়েও বস্‌ত না. স্তোত্র মুখস্থও কর্‌তো না !'

'তোমার ভাইদের কথা আর বোলো না ! —তারা দু'জন এত জোয়ান যে তাদের এক আঙ্গুলের ধাক্কাতেই ধরাশায়ী করা যায় ,—যেন তালপাতার সেপাই !"

'আচ্ছা ! থাম—থাম।—তোমার মুখে কোন কথাই আটকায় না।—বড় দা' ও ছোট দার শরীর ভাল না হলে কি হয় ? তারা কত বিদ্বান্ ! তবে তোমার মত গোয়ার্ত্তুমিতে পাকা নয় বটে, নেহাৎ ভাল, মানুষ !"

'আর সেই জন্যেই বুঝি তোমার ছোট দা' সে দিন ট্রামগাড়ীতে একটা ট্যাস্-ফিরিঙ্গির ঘুষিগুলো বেশ শান্তভাবে হজম করলো।"

'যাও ! যাও ! তোমার সাথে কথা বলাই ঝকমারী ! হচ্ছিল খোকার পড়াশুনার কথা, উনি নিয়ে এলেন—আমার ভাইয়ের কথা !'

গৃহিণীর কথায় মৃদু হাসিয়া রমেশ বাবু বলিলেন—'আচ্ছা খোকার কথাই বলি।—সংসারী লোকের কতকগুলো দরকারী শেখবার জিনিষ আছে ; তার মধ্যে ধর্ম্ম-শিক্ষাও স্বাস্থ্য-রক্ষাই প্রধান । আজকাল শিক্ষা দীক্ষায় আমরা এতই হীন হয়ে পড়েছি যে, এ দুটী বিষয়ে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে,—বুড়ো না হ'লে ধর্ম্মালোচনা করা একেবারেই উচিত না। কিন্তু ছোট বেলা হ'তেই যদি ছেলেরা 'ঈশ্বর আছেন' এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, যদি দৈনিক প্রত্যেক কাজ ও ঘটনার মধ্যে ভগবানের সত্তা অনুভব করে, তবে সেই তরুণ বয়স থেকেই ভাল কাজ করতে তাদের স্বভাবতঃই আগ্রহ হয়। আবার আমাদের শিক্ষা গুলো এতই সংকীর্ণ হয়েছে যে, যখন আমরা নিজকে সুশিক্ষিত বলে গর্ব্ব ক'রি, তখন দেখা যায়, ধর্ম্মহীন শিক্ষায় আমরা প্রকৃত মানুষ না হ'য়ে, পশুত্বই লাভ করি ! বিশেষতঃ আমাদের স্কুল কলেজে যে সব পড়া শুনা হয়, তাতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি মোটেই শেখান হয় না। বড়ই আশ্চর্য্যের

বিষয়, খৃষ্টানদের চালিত স্কুল কলেজে 'বাইবেল' শিক্ষা নিয়মিত রূপে দেওয়া হয়; কিন্তু আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যেন ধর্ম্মের সাথে আঁড়ি পেতেছেন! আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ক কোন পৃথক বই কোন ক্লাসেই পড়ান হয় না! ফলে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' সম্বন্ধে আমাদের ছেলে বেলা থেকেই ঘোর সন্দেহ থাকে;—তখন আর ধর্ম্ম চর্চ্চা করে কে? অনেকে শেষ বয়সে অনেকটা সামলাইয়া নেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই এক রকম 'নাস্তিক' অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। তার পর, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আমরা ভয়ানক উদাসীন: শরীরটাকে যে রক্ষা করতে হবে, এ কথা আমরা একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে আনি না। আমাদের দেশের উপযোগী ব্যায়ামাদি কেউ করে না; কতকগুলি স্বাস্থ্য-হানিকর বিদেশী খেলার অনুকরণে আমরা নিজকে বড়ই ভাগ্যবান মনে করি। 'ব্রহ্মচর্য্য' ব'লে যে একটা জিনিষ আছে—'

'ওমা! ব্রহ্মচারী হবে কি গো?—' তারাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

" 'ব্রহ্মচর্য্য' জিনিষটা পালন করলেই 'ব্রহ্মচারী' হয় না।—প্রতিদিনের সাংসারিক কাজের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়। ভারতের এটা নিজস্ব। এমন সুন্দর ও সহজ ভাবে মানুষকে গড়ে তোলার উপায়, আর কোন দেশেই নাই। একাধারে ধর্ম্মচর্চ্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় এতে আছে। এই ব্রহ্মচর্য্য আমাদের দেশ হ'তে উঠে গিয়েই, আমাদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার এত হীন হয়েছে। যত দিন আমাদের দেশের ছেলেরা তাদের নিজের জিনিষগুলো সঠিক বুঝে নিতে না পারবে, ততদিন বিদেশীয় অনুকরণে, তারা পতিত বই, উন্নত হবে না। তবে এখন যেন অনেকে এ সব কথা কিছু কিছু বুঝতে পেয়েছে বলে মনে হয়—তাই দেশময় উন্নতির একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। নতুন একটা যুগ যে এসেছে, তার কোন সন্দেহই নাই। কে জানে, এই নব যুগের মধ্যে কত অলৌকিক ঘটনা নিহিত রয়েছে। বিশেষতঃ—"

সহসা দরজা খুলিয়া গেল! শ্রীমান্ অনিলচন্দ্র গৃহ প্রবেশ করিল, কিন্তু পরে পিতামাতাকে দেখিয়া দরজার কাছেই আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল!

তাহাকে দেখিয়া তারাসুন্দরী সচিৎকারে বলিয়া উঠিলেন—'এই দেখ!—আবার কোথা থেকে মারামারি করে এসেছে! ওঃ, নাক দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে! ওরে ও গাধা! তুই কি এমনি করেই একদিন মারা মরবি!

৩

মাতার নিকট তীব্রভাবে তিরস্কৃত হইয়া অনিল যখন বাটীর সম্মুখের রাস্তা আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অপরাহ্ণ। আকাশের গায়ে মেঘের উপর রক্তচক্ষু মেলিয়া সূর্য্যদেব শ্রান্তদেহে পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন। বাতাস ধীরে ধীরে মেঘগুলিকে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। অনিল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেলেও, যখন তাহাকে ডাকিতে বাটী হইতে কেহই আসিল না, তখন তাহার মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল। সে ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে স্কুলের মাঠের দিকে যাইতে লাগিল।

'আমি তো আজ কোনই দোষ করি নাই! তবে মা আমায় অনর্থক এত গাল দিলেন কেন? মারলেনই বা কেন? কৈ?—বাবা তো আমায় বকলেন না!'—স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ হওয়ায়, তাহার রুদ্ধ অশ্রুবেগ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইল।

"কিন্তু আমি কি দোষ করেছি যে শিবু, যে ক্লাশের একজন অতি নিকৃষ্ট ছাত্র—সে আমায় 'মিথ্যাবাদী' বললে? আমি মিথ্যা কথা তো বলি নাই! শিবে অঙ্ক নকল ক'রে লিখছিল; মাষ্টার মশায় আমায় জিজ্ঞাসা করায়, তবে আমি বলেছি। এতেও অন্যায় হয়েছে?"

সে চলিতে চলিতে কত কি ভাবিতে লাগিল। আজ আর তাহার কোন খেলার দিকে লক্ষ্য নাই; তাই যদিও দেখিল, তাহার পরিচিত জনকয়েক ছাত্র একটী বাটীর সম্মুখের মাঠে 'গোল্লাছুট' খেলিতেছে, তবুও সে তাহাতে যোগ দিবার কোন আগ্রহই প্রকাশ করিল না।

"আচ্ছা! শিবে বোধ হয় এখন স্কুলের মাঠেই খেলা করছে। তাকে যে এখনও, আমায় 'মিথ্যাবাদী' বলার শাস্তি দিতে পারি! আর দেবই বা না

কেন? মা যখন মনে করেন, আমি সব সময়ই মারামারি করি, তখন আজ সত্যি সত্যি শিবেকে উচিত শিক্ষা দেব।"

অনিলের মন ক্রমে ক্রমে বড়ই অশান্ত হইতে লাগিল। সহসা সে দেখিল—সম্মুখেই স্কুলের ময়দান। কয়েক জন ছাত্র 'ফুট্‌বল্' খেলিতেছে,—আর কয়েক জন একটী গাছতলায় বসিয়া খেলা দেখিতেছে ও গল্প-গুজব করিতেছে। অনিল দেখিল—শেষোক্ত দলের মধ্যে শিবে বসিয়া রহিয়াছে।

'না-দেখি'—'না-দেখি' করিয়া, অনিল কছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; কিছু পরে দেখিল,—শিবে তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নস্বরে কি যেন বলিল,—তাহাতে সকলে অনিলের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা শিবে উঠিয়া অনিলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'কিরে অন্‌লে!—সে গুলো হজম হ'য়ে গেছে বুঝি? তাই আবার এসেছিস্?'

শিবের কথায় অনিলের যে টুকু কুণ্ঠা ছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে কে যেন সজোরে অপসারিত করিল; তাহার বিদ্রোহ মনটী তখন গত অপমানের প্রতিশোধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল; সে দৃঢ়পদে শিবুর নিকটে গিয়া ধীর স্বরে বলিল—"তখন তুমি আমায় বিনা কারণে মিথ্যাবাদী বলেছ। আমি সকলের সামনেই বল্‌ছি—তুমিই মিথ্যাবাদী।"

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শিবু অনিলকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেই, অনিল ক্ষিপ্র হস্তে তাহার হাত খানি ধরিয়া ফেলিল; তার পর বলিল—'তুমি শুধু মিথ্যাবাদী নও, তুমি কাপুরুষেরও অধম।"

আর যায় কোথায়? শিবু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া প্রচণ্ড বেগে অনিলকে আক্রমণ করিল; অনিলও অদ্ভুত কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ইতি-মধ্যে যাহারা 'ফুট্‌বল্' খেলিতেছিল, তাহারা একে একে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অনিল ও শিবুর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না।

সহসা শিবুর একটী বজ্র মুষ্টি অনিলের নাসিকার অতি সন্নিকটে পড়িল; রক্তে তাহার মুখ ভাসিয়া গেল ;ক্ষণিকের জন্য সে চক্ষে অন্ধকার

দেখিল, তাহার সম্মুখের দৃশ্যগুলি যেন অদৃশ্য হইল : কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রবল বেগে শিবুকে আক্রমণ করিল। শিবু এবার তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না ; সহসা একটী চিৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল !

সকলে ব্যস্ত ভাবে শিবুকে ধরিয়া বসাইল। সে ইঙ্গিতে জানাইল—জল খাইবে। এক জন ছাত্র দৌড়াইয়া স্কুলের জলের ঘর হইতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আনিলে, শিবু আকণ্ঠ পান করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

সকলে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। তখন অনিল নত মস্তকে শিবুর একখানা হাত ধরিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়াছিল।

শিবু অনিলের দিকে চাহিয়া তাহার মুক্ত হাত খানি অনিলের পিঠে ধীরে ধীরে রাখিল। অনিল কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন বোধ কচ্ছিস্, ভাই !" তাহার চোখের কণায় দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শিবু বলিল—"অন্‌লে ! তুই আজ আমাকে ঠিক্ শিক্ষা দিয়েছিস্। সব সময় মনে করতেম—আমার মত মারপিটে মজবুৎ, ছেলেদের মধ্য কেউ নাই ; এখন দেখছি—ঘুষি চালাতে তোর মত ওস্তাদ আর নাই !"

অনিল মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোর কোন জায়গায় বেশী লেগেছে ?"

"দূর ! সে রকমতো মোটেই টের পাই নাই। তোর শেষ দিক্‌কার ঘুষি-গুলো যখন আমার চারিদিকে পড়তে লাগ্‌ল, তখন মনে হ'ল, কেউ যেন আমায় মুগুর পেটা করছে ! একেবারে যেন 'লুচী বেলা' করে দিল। বাবা !" শিবু—হোঃ, হোঃ—করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্য ধ্বনিতে ছাত্রেরা একটী আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শিবুর হাসিতে মন খুলিয়া যোগ দিল।

শিবু বলিল—"শোন সকলে।—আজ থেকে আমি অনিলের বন্ধু। যত দিন বেঁচে থাকি—আমাদের এ বন্ধুত্ব যেন নষ্ট না হয়। এখন হ'তে আমি তোদের ও সব ফুট্‌বল্ ক্রিকেট্-টেনিসে—আর নেই ; পড়া-শুনা সব বিষয়ে আমি অনিলের অনুসরণ করব।"

শিবু সস্নেহে অনিলের হাত চাপিয়া ধরিল।

৪

অনিল তদবস্থায় গৃহে ঢুকিয়াই সেখানে পিতামাতাকে দেখিয়া হতবুদ্ধির মত দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। আকস্মিক্ বিপদপাতে লোকে যেরূপ অসাড় হইয়া পড়ে, তাহারও অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইল। মাঠ হইতে ফিরিবার সময় সে স্থির ক'রয়া আসিয়াছিল যে সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, সে প্রথমেই মুখের রক্ত ধুইবে; তার পর শিবুর জন্য অপেক্ষা করিবে। শিবু আসিলে তাহাকে পিতার কাছে লইয়া এখনকার সমস্ত ঘটনা বলিবে। কিন্তু গৃহ মধ্যে অকস্মাৎ মাতাকে দেখিয়া সে প্রমাদ গণিল; তাই মাতার কঠোর সম্ভাষণে সে কোন উত্তর করিতে পারিল না।

মাতা পুনরায় সরোষে বলিলেন—"এখন আবার কোথা থেকে রক্ত-গঙ্গা হয়ে এলি রে গাধা!"

পুত্র নীরব! তারাসুন্দরী, পুত্রের নীরবতা, অবাধ্যতার চরম নিদর্শন মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"যা, দূর হ'য়ে যা! ও—ঝি, খোকাকে একটু জল এনে দে, রক্তারক্তি হ'য়ে এসেছে! পোড়াকপাল ছেলের!"

অনিল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে, এমন সময় রমেশ বাবু সস্নেহে ডাকিলেন—"অনি! দেখি বাবা! কোন্ যায়গায় কেটে গেছে।"

অনিল ফিরিল; পিতার স্নেহ-কণ্ঠে তাহার হৃদয়টী শান্তিতে ভরিয়া গেল। রমেশবাবু পুত্রের কাছে আসিয়া, তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিলেন; তার পর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে, সব বলতো?"

অনিল ধীরে ধীরে সমস্ত বলিল: রমেশ বাবু বলিলেন—"আচ্ছা এখন ঠাকুর ঘরে যাও, শিবু এলে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।"

অনিল চলিয়া গেল।

রমেশ বাবু পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একমাত্র ছেলেমি বই, আজকার ব্যাপারে অনিলের এমন বিশেষ কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। যাক্—যা হবার হয়েছে। এখন চল, ঠাকুর ঘরে যাই।"

ঈষৎ বিদ্রূপ কণ্ঠে তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন—"ওগো! তোমার বয়সে তবু যা হোক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম শোভা পায়। কিন্তু ওই দুধের ছেলেটার মাথা খাচ্ছ

কেন, তা আমায় বল্‌তে পার? ছেলেতো দিন দিন গুণ্ডা গুণ্ডাই হ'য়ে উঠ্‌ছেন! বাপ হ'য়ে তুমি—"

পত্নীর কথায় বাধা দিয়া রমেশ বাবু স্থির স্বরে বলিলেন—"বাপের যে কর্ত্তব্য গুলি আছে, আমি যথাসাধ্য করছি; কিন্তু মায়েরও ছেলের উপর অনেক গুলি কর্ত্তব্য আছে। সে সব যদি তুমি পালন কর্ত্তে, তবে বোধ হয়, ছেলে 'মানুষ' হোত। আমি একা আর কত করব?"

বিস্মিত হইয়া তারাসুন্দরী বলিলেন—"সে কি! এখন আবার আমার ছেলের উপর এমন কি কর্ত্তব্য আছে যে, যা'তে তার ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ নির্ভর করছে? কচি খোকা তো আর না যে, কোলে পিঠে করে থাক্‌তে হবে?"

পত্নীর একটু নিকটে আসিয়া, রমেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন—"তুমি কি জান না, ছেলের উপর মায়ের প্রভাব কতটা? যত সব বড় লোকের কথা শুনেছ,—যাঁরা চিরস্মরণীয়, চির বরেণ্য ও মহাত্মা,—দেখতে পাবে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই, মায়ের প্রভাবে বড় হয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী, এর সাক্ষাৎ প্রমাণ। কোন এক জন মহাত্মা বলেছেন—'মা বড় না হলে কি ছেলে বড় হয়?' আর একটা কথা শোন;—এই ঠাকুর ঘরে রোজ সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ থাকলে, ছেলেদের সময় নষ্টও হয় না, একটা কঠিন কাজও নয়। ছোট বেলা হ'তে ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি শেখার এমন সুন্দর যায়গা আর নাই। যদি মূলে ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, তবে হাজার লেখা-পড়া শিখুক কিম্বা ৩।৪টা পাশই দিক্, ধর্ম্ম হীন শিক্ষার ফলে, এ শিক্ষায় কোন লাভই হবে না। সংসারের সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যদি তাদের বিশ্বাস থাকে "ভগবান্ মঙ্গলময়"—তবে যে কোন অবস্থাতে তারা মানসিক শান্তি পাবেই। এই জন্যই আমি রোজ সন্ধ্যায় ছেলেকে ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাই। এ কাজটা ধর্ম্ম চর্চ্চার জন্যে নয় কিম্বা পরকালের জন্যও নয়। এটা হচ্ছে নিজের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিকাশের একটা সহজ পথ,—মনকে সংযত রাখবার একটা সুন্দর উপায়। আবার এ সোজা কাজটা করবার সময় অসৎ পথে মন কদাচিৎ যায়।"

উমসুন্দরী কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন,—তার পর ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে আসিয়া নত মস্তকে বলিলেন—"কোন্ খানটায় আমার

দোষ,—ত' আজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো। ও-ঝি! খোকাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় তো!"

অনিল আসিলে, মাতা তাহাকে বুকে চাঁপিয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন "বাবা, অনি! কয় দিন থেকে আমার শরীরটা বড় খারাপ ছিল, তাই সব সময় তোমায় খিট্ খিট্ই কর্‌তেম। তুমি কিছু ভেবো না; বিনা কারণে তোমার উপর আর কখনো রাগ করব না।—দেখি বাবা! তোমার কোন্ খান্‌টায় লেগেছে?—বাছারে!"

অনিল আকুল আবেগে মাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

সামাজিক চিত্র।

(শ্রীরতিনাথ মজুমদার)।

বড় বৃষ্টি হইতেছে। বাড়ীর বাহির হওয়া দুষ্কর। বিশেষ কোন কাজ করিবারও সুবিধা নাই, কাজেই বসিয়া আছি। অদূরে চাকরেরা বসিয়া থাকিবার সঙ্গত অবসর পাইয়া সহর্ষে তাম্রকুটের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে ও নানা ছাদে নানা ফাঁদে কত গল্পের অবতারণা করিতেছে। আমি সুবোধ ছেলের ন্যায় বসিয়া থাকিলেও আমার মন কিন্তু অত সুবোধের ন্যায় স্থির থাকিতে একান্ত নারাজ। সে কত চিন্তার তরঙ্গে মিশিয়া কত গড়িতেছে, আর কত ভাঙ্গিতেছে, সে সব গণনা করিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়। সহসা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলি যেন একটু জমাট বাধিয়া উঠিল; মনে করিলাম,—"আমাদের সমাজের কি কেহ হর্ত্তা কর্ত্তা নাই? চক্ষের উপর এত ঘটনা ঘটিতেছে, এই সব দেখিবার কি কেহই নাই। কলিকাতা বসিয়া কত জনের

কত গলা বাজি শুনা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লী-সমাজে কি ঘটিতেছে, তাহার বিষয় কেহই ত কোন চিন্তাই করেন না?

"এই যে বেহারা ও চুনারী প্রভৃতি জাতি, ইহারা কি নির্ব্বংশ হইবে? ৩০ কি ৪০ বৎসর বয়স্ক এক একটী পুরুষ, পাঁচ ছয় বৎসরের এক একটী বালিকা বিবাহ করে; ফলে, বালিকাও জীবনে সুখের আশা করিতে পারে না। কেহ কেহ বা দুই একটী ক্ষীণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিয়া বিধবা হয়, কেহ কেহ বা সন্তান প্রসব করিবার পূর্ব্বেই বিধবা হইয়া সংসারে দরিদ্রতার প্রভাব বৃদ্ধি করে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে যুবতী ও বালিকা বিধবার সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু বিবাহ যোগ্য পাত্রীর অভাব। অনেক পুরুষেরই বিবাহ হয় না। কোন কোন পুরুষ বৃদ্ধ কালে এক একটী দুগ্ধ পোষ্য বালিকা বিবাহ করে। কিন্তু কাহাকেও ত এ বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তা করিতে দেখা যায় না। উহারা অশিক্ষিত বলিয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার শক্তি তাহাদের নাই। এ জাতি কি অজ্ঞতা বশতঃই নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে?"

এইরূপে কত কি চিন্তা করিতেছি, এমন সময় কয়েক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নিকট শুনিলাম, আজ রাজবংশীদের এক সভা হইবে ও তাহাতে তাহাদের সামাজিক বিষয় মীমাংসিত হইবে।

শেষ বেলায় কৌতুহল বশতঃ আমিও বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, অনেক রাজবংশীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন বক্তা তখন বলিতেছিল,—"দেখুন, সমস্ত জাতির মধ্যেই যখন নূতন উন্নতির স্রোত প্রবাহিত, যখন আমরাই বা নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? এখন আমাদেরও সামাজিক কু-প্রথাগুলির সংস্কার করা আবশ্যক। দেখুন, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির স্ত্রী-লোকেরা প্রায়ই বাটীর বাহির হন না; বাহিরের কোন কাজও তাহাদের করিতে হয় না। আর আমাদের স্ত্রী লোকেরা মৎস বিক্রয় করে, অনেক সময় নানা বাড়ীতে চাকরাণীর কাজও করে। এখন হইতে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত কাজ করিতে দিবেন না, সকলে এরূপ প্রতিজ্ঞা করুন।"

বক্তার প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিল—"নিশ্চই। এখন হইতে

আমাদের স্ত্রী লোকেরা ঐ সমস্ত নীচ কাজ করিতে পারিবে না। যাহারা ঐ রূপ কাজ করিবে, তাহারা এখন হইতে সমাজ চ্যুত হইবে। "

সভ্যের এই প্রস্তাব এক বাক্যে সিদ্ধান্ত হইয়া গেল।

এমন সময় একটী বৃদ্ধ উঠিয়া বলিল—"তোমরা যে সমস্ত প্রস্তাব করিলে তাহা স্বীকার করিয়া লইলাম। যে সকল স্ত্রী লোকের স্বামী, পুত্র বা ভরণ পোষণ চালাইবার লোক আছে, তাহাদের ঐ রূপ হীন কার্য্য গুলি না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু যে সকল বিধবা অনাথা, কোন অভিভাবক নাই, তাহাদের যদি ঐ রূপ কাজ করিতে না দেওয়া হয়, তবে তাহাদের ভরণ পোষণের উপায় কি ?"

এই কথায় সকলের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল; কেহই বিশেষ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইল না। তখন একজন বলিল—"ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যেও ত এমন অনেক অভিভাবকহীন বিধবা আছেন, কিন্তু তাহাদের জন্য ত সমাজ হইতে কোন ব্যবস্থা করিবার দরকার মনে করেন নাই। তাহাদের যখন ভরণ পোষণ চলিয়া যাইতেছে, তখন আমাদের মধ্যে অভিভাবক শূন্য বিধবাদেরও চলিয়া যাইবে; তার জন্য আর বিশেষ মাথা ঘামাইবার দরকার নাই"।

বক্তার কথা শুনিয়া হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। আর চুপ করিয়া থাকিলাম না, বলিলাম—"তোমাদের ও ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যে এখনও অনেক পার্থক্য। সাধারণতঃ তোমাদের অপেক্ষা তাহারা শিক্ষিত ও সম্পত্তি শালী। কাজেই ঐ সকল উচ্চ জাতির স্ত্রীলোক বিধবা হইলে, প্রায়ই তাহাদের ভূসম্পত্তি এবং স্থল বিশেষে নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি থাকে। ইহা ব্যতীত ঐ সকল জাতির স্ত্রীলোকেরা কিছু না কিছু শিল্প কার্য্যেও শিক্ষিতা থাকেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদের ভরণ পোষণ চালান ততদূর কষ্ট সাধ্য হয় না। তোমাদের মধ্যে এ প্রকার বিশেষ কিছু দেখা যায় না সেই জন্য তোমাদের স্ত্রীলোকেরাও শারিরীক পরিশ্রম ভিন্ন বিশেষ কোন উপায় দেখে না। এখন দেখিতে পাইতেছ, তোমাদের অভিভাবকহীন, বিধবা স্ত্রীলোক এবং উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে কত প্রভেদ! বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির বিধবাগণের দেবর, শ্বশুর, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি উঁহাদের ভরণ পোষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য

কার্য্য মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। আর তোমাদের মধ্যে সে সহানুভূতি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।"

আবার সভাস্থলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। নানারূপ জল্পনা কল্পনার পর তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে—"তাহাদের মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোক বিধবা হইবে, তাহাদের যদি ভরণ পোষণের অন্য উপায় না থাকে, তবে তাহারা সমাজে যে সমস্ত বিপত্নিক আছে, তাহাদের আশ্রিত হইয়া থাকিবে।"

ইহাদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! তাহাদের বলিলাম—"একি সর্ব্বনাশের কথা! ইহাপেক্ষা তাহাদের দাসীবৃত্তি করাও কল্যাণকর। শারিরীক পরিশ্রম করিয়া আহার উপার্জ্জন, কখনই ঘৃণিত নহে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহাতে তোমাদের জাতিরও কোন কলঙ্ক নাই।"

একজন বলিল—"কেন মহাশয়? এ প্রথা ত আমাদের মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; আর এই ভাবে ত আমরা অনেক বিধবা পোষণ করিয়া আসিতেছি।"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। তাহারাও তাহাদের এই প্রস্তাব কোন রূপ পরিবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না।

এই যে কু-প্রথা রাজবংশী জাতিদের মধ্যে অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই?—এই মহাপাপের স্রোত চলিতে দেওয়া অপেক্ষা, কি উহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা কর্ত্তব্য নহে? "সমাজের মহারথিগণ" ইহার কি কোন সংবাদ রাখিয়া থাকেন? উহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে, বোধ হয় এই সম্প্রদায় রক্ষা পাইত। আর কতদিন এরূপ সাংঘাতিক প্রথা ঐ সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত থাকিবে? এ বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিবার লোক কি হিন্দু সমাজে নাই? অনেক বিষয়ে ত অনেকেরই হৈ,—চৈ, শুনা যায়। এই মহাপাপকর প্রথা কি তাঁহাদের গোচরে আইসে না? রাজবংশী জাতি কি হিন্দু-সমাজ ভুক্ত নহে?*

---

* এ বিষয়ে পাঠকগণের 'মতামতের' জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আমাদের যে দুই চারিটী কথা বলিবার আছে তাহা পরে বলিলেই চলিবে। সম্পাদক।

জল কষ্ট ও কলেরা।

(শ্রীঅভয়কুমার সরকার, এম, বি; ডি, পি, এইচ)।

বঙ্গে জল কষ্টের কথা নূতন করিয়া বলিবার আমার বেশী কিছু না থাকিলেও, গত দামোদর বন্যার সময় হইতে এ যাবত নানা সহরে ও পল্লীগ্রামে কার্যোপলক্ষে পরিভ্রমণ করিবার সুযোগে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিব মাত্র। আশা করি একটু চিন্তা করিলেই আমাদের দেশের লোক এ বিষয় অনুধাবন করিতে পারিবেন।

'জল কষ্ট' বলিলে, জলাধিক্যে অতিরিক্ত বন্যা-প্লাবিত হওয়ায় লোকের যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা বুঝায় এবং জল অভাবে দূষিত জলের দ্বারা সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি পাইয়া বহু লোকক্ষয়ও বুঝায়। শেষের বিষয়টী লইয়া আজ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর জলকষ্টের কথা আমরা প্রতিদিন কাগজে পড়িতেছি। কোন কোন স্থানে স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারিগণ ছায়াচিত্র প্রভৃতি সম্বলিত বক্তৃতা দ্বারা এবং বহুপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া লোকদিগকে ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। এগুলি আমাদের কতকটা আয়ত্তাধীন এবং স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য। কিন্তু কি উপায়ে এই সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব পর, তাহা আমরা কেহ ভাবিতেছি কি? যদি এ বিষয়ে আরও একটু বিবেচনা করা যায়, তবে আমরা বলিব, বাস্তবিক প্রাণের সহিত তেমন চেষ্টা হইতেছে না। আবেদন নিবেদনে পরোমুখাপেক্ষী চাতকের মত দিন কাটাইলে মনুষ্য জীবনের সফলতা উপলব্ধি হয়-কি? প্রতি বিষয়ে সরকার বাহাদুর বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আমাদের সাহায্য করিবেন, এই ধারণা লইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে একটু একটু চেষ্টা করিলে

এত দিন হয়ত অনেক পুরাতন জলাশয়, পল্লীবাসীর সমবেত চেষ্টায় পঙ্কোদ্ধার করা অসম্ভব হইত না। বুদ্ধি ভ্রষ্ট মানব ভগবানের নিয়োজিত শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য। তাই আজ এত দুর্দ্দশা, এত কষ্ট, এত লোক কলেরা আমাশয় ও উদরাময়ে মরিতেছেন। অবশ্য এ জন্য যে টাকা দেওয়া হইতেছে, তাহা ন্যায্য ভাবে ব্যয়িত হয় কিনা তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। নিম্নে আমরা একটি তালিকা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি,'—' জেলা বোর্ড পাণীয় জল সরবরাহ করার জন্য কি ভাবে অর্থব্যয় করিতেছেন।*

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আয়		শতকরা কত টাকা বাজেটে ধরা হয়	ও কতটাকা খরচ হয়।
১৯১৬—১৭,	৩, ১৫, ৯১৪,	১৫· ৪৬,	১০· ৩৫
১৯১৭—১৮,	৩, ১৯, ১১৮,	১৫· ০২,	১০· ৬৮
১৯১৮—১৯,	৩, ৮৯, ১১০,	১০· ৯৫,	১৩· ২৮
১৯১৯—২০,	৩, ৮৬, ৮৬৭,	১০· ৯১,	১০· ৯২
১৯২০—২১,	৩, ৯০, ৫৪৫,	৮· ৫৯,	৮· ২২
১৯২১—২২,	৩, ৮১, ৫৫২,	৬· ৩৭,	৫· ৩৩

পাঠক পাঠিকা এখন বুঝিতে পারিতেছেন, আপনাদের জেলা বোর্ড জলকষ্ট নিবারণের কতকটা সহায়তা করিতে পারিতেছেন। এ বিষয়ে যদি তাহাদের বেশী টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা না থাকে, প্রয়োজনানুরূপ বন্দোবস্ত তাহারা করিতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ যদি গ্রাম্য জমিদার বা অপরবিধ ব্যবসায়ী ধনীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহাও আশা প্রদ নহে। অনেক স্থানে এমন জমিদার নাই, যাহারা নিরন্ন দরিদ্র প্রজাদের জল কষ্ট উপলব্ধি করিয়া অন্ততঃ ধর্ম্মাপলক্ষে একটি জলাশয় খনন করিয়া প্রজাবর্গের হিত সাধন করিবেন। ভ্রমেও এখন আর সে কথা মনে আসা তাহাদের স্বাভাবিক নয়। তাহারা বিলাস ভবনে

---

*বোর্ডের নাম আপাততঃ অজ্ঞাত রাখা হইল। সম্পাদক

আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া এ জল কষ্ট বুঝিবার দরকার বোধ করেন না এবং ধর্ম্মও অনেক দিন তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ—গ্রামের যাহারা ভুক্ত ভোগী, তাহাদের একটী পয়সা খরচ করিবার ক্ষমতা নাই। আছে কেবল পরচর্চ্চা ও আলস্যে কালাতিপাত করিবার ব্যবস্থা; তাহাদের ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা গুলি থাকা স্বত্বেও চেষ্টার অভাবে তাহা শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের নীরবে কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই এবং ১২মাসের ভিতর প্রায় ৮। ১০ মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ক্রমশঃ নিরাশ ও কার্য্যে উদাসীন ভাবে জীবন কাটায় এবং এই শ্রেণীর লোক চোখ থাকিতে অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। তাহাতে কিছু ফল আছে কি?

বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২১ সনে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ৮৮৯ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ এ বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আশা করি, এ বিষয় সকলেই একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যে ভাবে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে ১২৫ বৎসরের ভিতর প্রায় জেলার হিন্দু মুসলমানের অস্তিত্ব থাকিবে না।—কি কি উপায়ে প্রকৃত জলকষ্ট নিবারণ করার চেষ্টা হইতে পারে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

১। আমার পূজনীয় ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যাপক রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, বি, জীবাণুতত্ত্ববিৎ মহাশয়, গত ২৬শে বৈশাখের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এক সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বল্প ব্যয়ে নল বসাইয়া কি ভাবে জল সরবরাহ করা যায়, তাহা বুঝাইয়াছেন।

২। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় "টিউব ওয়েল" প্রবন্ধে মিঃ জি, সি, স্কট মহাশয়ের কৃতিত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে ডাঃ বেন্টলির মতামতও প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। গত ৬ই জুন তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রও এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি যে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তাহাই আমার

বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। এ বিষয় তাঁহার অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য আছে এবং আশা করি বর্ত্তমান দেশের নেতারা এ বিষয়, একটু তলাইয়া দেখিয়া কার্য্য করিবেন। বড় বড় সাহেবের বড় বড় কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া যেন আমাদের "বর্ব্বরস্থ ধনক্ষয়ম' উপাধি আর বেশীদিন ভোগ করিতে না হয়। দেশের কতকগুলি লোক বাস্তব শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া যখন দেশের ও দশের কাজে লাগিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তখন আমার বিবেচনায় অল্পে সন্তুষ্ট বাঙ্গালী ছেলেদের একটু অবসর দিবার চেষ্টা করাও দরকার।

"টিউব ওয়েল" সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা মত তাহা নিম্নে বলিতেছি :—

১। গ্রামে উহার প্রচলন করা যাইতে পারে ; তবে কোন্ স্থানে কত ফিট্ নিম্নে শক্ত আটালে মাটীর স্তর আছে, তাহা প্রথমে দেখা দরকার। এ বিষয় আমাদের দেশীয় বি, ই, পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়গণ একটু চেষ্টা করিলেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। প্রতি জেলা বোর্ড এ ভার গ্রহণ করিলেই এ বিষয় বিশ্লেষিত মীমাংসায় আনিতে পারেন।

২। প্রায়ই দেখা যায়, অল্প দিনের ভিতর অনবরত ব্যবহারে ঐ পাম্পের ওয়াশারটী নষ্ট হয়। এ জন্য বিশেষতঃ বড় মাহিয়ানা প্রাপ্ত ডিক্রি-হেল্ডার বড়সাহেব লইয়া আসিয়া সামান্য ১০৲ টাকা মূল্যের পাম্প পরীক্ষা করিবার দরকার বোধ করি না। যে সব সব-ওভারশীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকালবোর্ডের কার্য্য পরিবেক্ষণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের দ্বারাই ঐরূপ কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলায় চর ভয়রা খাসমহাল কাছারীর টিউব ওয়েলটী ঐ কূপের পাম্প খুলিয়া দিয়া ওয়াসার বদলাইয়া আনিয়াই মেরামত করান হইয়াছে। তাহাতে ১০৲ টাকার বেশী খরচ হয় নাই এবং অপর আর একটীও মেরামত করিতে কোন খরচ করিবার দরকার হয় নাই।

৩। বাঙ্গালীর বুদ্ধি কৌশলে আমার মনে হয়, স্থানিক অবস্থানুসারে ঐ টিউব ওয়েলের প্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা চলিতে পারে। তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হওয়াই সম্ভবপর। নিজেরা

একটু চেষ্টা করিলেই ঐ সব বিষয় ক্রমে উন্নতি করা যাইতে পারে।

এতক্ষণ বলিলাম—টিউব ওয়েলের কথা। ইহার পর বিবেচ্য বিষয় হইয়াছে—ইন্দারার কথা, যাহা জেলা বোর্ড স্থানে স্থানে দিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ইন্দারাগুলির অবস্থা দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সব ইন্দারা ঢাকা ও অন্যান্য জেলা বোর্ড করিয়াছেন এবং আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে তাহার কথাই বলিতেছি।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার পানীয় জলের ব্যবহার জন্য এক সময় গবর্ণমেণ্ট এককালীন কিছু টাকা জেলা বোর্ডের হস্তে অর্পণ করেন। ঐ টাকায় কয়েকটী ইন্দারা দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ঐ ইন্দারার স্থান নির্ণয় করায় এতটা ত্রুটী হইয়াছে যে সুন্দর গ্রাম হইতে মাঠের ভিতর কোন পল্লীবাসিনী তথায় দড়ি, বালতী ও কলসী লইয়া আসিবার অবকাশ পান না। ইহা অধিক স্থলে গ্রাম্য বালকদের পায়খানা এবং মরা জীব জন্তু ফেলিয়া দিবার স্থান হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বলিতে গেলে আত্মহত্যার বা গোপন হত্যার সুবিধা হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী কে? স্পষ্ট কথায় বলিলে এই বলিব, এই কূপ বা ইন্দারার স্থান নির্ণয় করার ভার যাহাদের ছিল, তাহাদের একটু বিবেচনার দোষেই এত গুলি টাকা বৃথা ব্যয় করা হইয়াছে। ঐ সব ইন্দারা যে সব কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের কণ্ট্রাক্টরদের সহিত বিশেষ ভাব থাকার জন্যই হউক আর বুদ্ধি খাটাইবার দোষেই হউক যে পর্য্যন্ত ইন্দারা নামিয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই জল সরবরাহের তেমন কোন সুবিধা হয় নাই। পার্শ্বের গ্রামের পাত কূয়াগুলিতে যে জল থাকে, ইন্দারায় অন্ততঃ ততটা জল থাকাও দরকার। আমরা মানিয়া লইলাম 'সমারোহের ব্যাপারে' অখ্যাতি কুখ্যাতি হইয়া থাকে। তবে গরীব গ্রামবাসিদের ও কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটী এই টুকু যে তাহারা যথারীতি কার্য্য আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন না। আশা করি, তাহাদের ক্ষমতা এখন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন!

যে সব ইন্দারায় ভাগ্যক্রমে বেশ জল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, সে গুলিও সময়মত পঙ্কোদ্ধার না করায় একেবারে অব্যবহার্য্য

হইয়াছিল। গত বৎসর মাণিকগঞ্জের স্যানিটেসন্ পার্টির দ্বারায় বহু ইন্দারায় পঙ্কোদ্ধার করাইয়া এক প্রকার ব্যবহার্য্য করা হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর ঐ স্যানিটেসন্ পার্টির সুপার ভাইজার জেলা বোর্ডের আদেশ অনুসারে ধামরাই, মুন্সীগঞ্জ ও লাঙ্গলবন্দ প্রভৃতি স্থানে থাকায় আর কোন চেষ্টা এ বৎসর হয় নাই। এ কারণ অন্যান্য স্থানের মধ্যে মাণিকগঞ্জেও পুনরায় খুব জলকষ্ট হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ যদি একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন, তবেই ত এ বিষয় লোকের বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেন। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে।

আড়িয়া থানার অধীন এমন অনেক স্থান আছে যেখানে যেখানে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে পুরাতন পুষ্করণীর কর্দ্দমময় জল একমাত্র সম্ভাবনা। গ্রাম্য ধর্ম্মাবতারগণের অমনোযোগে কোন সরকারী কার্য্য তেমন সুচারুরূপে সম্পাদন হইতে পারে না। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কোন নিরন্ন দুঃস্থ মুসলমান পল্লীর জলকষ্টের জন্য আবেদন করায় ঢাকা জেলা বোর্ডের দয়া প্রকাশ হয় কিন্তু তাহাদের অদূর দর্শিতার ফলে ইন্দারার স্থান নির্ণয়ের ভার মহকুমার ওভারসিয়ার বা সবওভারসিয়ার বাবুর উপর থাকায় ঐ ইন্দারাটী যে স্থানের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা তথায় না হইয়া নালী-গ্রামের প্রসন্নকুমার কৈবর্ত্ত দাস মহাশয়ের বাটীর অতি সন্নিকটে হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত দাস মহাশয় নানা প্রকারে বিশেষ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন ও তাহার তেমন ইচ্ছা হইলে তাহার বাটীতে তেমন ১৫টা ইন্দারা বা বড় পুকুর কাটাইতে পারেন। পার্শ্ববর্ত্তী বাটীগুলিতে প্রায় প্রত্যেকেই নিজ ব্যয়ে পাতকুয়া দিয়া লইয়াছে। এমন স্থানে ইন্দারা না দিলে কি জেলা বোর্ডের চলিত না? পরের অর্থ অপব্যয় করার জন্য জেলা বোর্ডের তেমন ক্ষমতা আছে কি? এ বিষয় আমরা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

জেলা বোর্ডের যে সব পুকুর গ্রামে গ্রামে দৃষ্ট হয়, তাহাও কোন কোন বিষয়ে জেলা বোর্ডের বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কখনও উহার পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে

বলিয়া মনে হয় না এবং পঙ্কোদ্ধার করিবার চেষ্টাও করা হয় না। নূতন পুকুর না করিয়া অন্ততঃ ঐ সব পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া যদি বিজ্ঞাপন দ্বারা ঐ সব পুকুর গুলি রিজার্ভ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতেও ঐ সব স্থানে জল কষ্টের কতকটা লাঘব করা যাইতে পারে।

যখন জেলা বোর্ড, জমিদার বা গ্রাম্য কোন ধনীর সাহায্য পাইবার আশা নাই, তখন এমত বিষয় নিজেদের সমবেত চেষ্টায় কতকটা সমাধান করা সম্ভবপর বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। বর্ত্তমান সময়ে সঙ্ঘ বদ্ধ হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্য সমিতি সৃষ্টি করিলে এবং তথায় নিয়মিত রূপে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিলে অতি অল্প ব্যায় কি, ভাবে ঐ সব লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদন করা যায় তাহার দৃষ্টান্তও সেখানে থাকিতে পারে। এ বিষয়ে প্রতি জেলার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী, যদি স্থানীয় লোকের একটু সাহায্য পান, যথেষ্ট কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সাহায্য পাওয়ার আশা করারও এখন সময় আসে নাই।

গ্রামে টিউব ওয়েল কার্য্যকরী হইলেও পুরাতন পুকুর বা ডোবা একেবারে ভরাট করা বা সংস্কার করার চেষ্টা না করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা হইবে না। অতএব একটু বেশী খরচ হইলেও গ্রাম্য পুকুর গুলির সংস্কার করা ও ডোবা ভরাট করিবার চেষ্টা করিলে সকল বিষয়ে উপকার আশা করা যায়।

নানা কথা।

এবার নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বিগত ২৪শে বৈশাখ ফরিদপুর লক্ষ্মীকোলের (রাজবাড়ী ই-বি-আর) সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় বর্ম্মা বাহাদুর মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের

বিংশতি জন স্বজাতি সহ উপনয়ন গ্রহণ, এবং গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ খানখানাপুর গ্রামে স্বজাতি হিত পরায়ণ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে তদীয় একাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র এবং উপনয়নের উপযুক্ত বয়স্ক অপর তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্র ও চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে একাদশবর্ষ বালক পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১৪২ জন কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ সংবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয় এতদঞ্চলে কায়স্থের সংস্কার কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এজন্য যে তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার প্রচার কার্য্যে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীভগবান তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

স্থানাভাব বশতঃ এই সংখ্যায় কুচবিহার রাজধানীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিংশ বার্ষিক বিরাট অধিবেশন ও কায়স্থ সম্মিলন সংবাদ, এবং নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত বহু কায়স্থ উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য সংবাদ মুদ্রিত হইল না। আগামী সংখ্যায় তদ্বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা ক্রমে ক্রমে গ্রাহকগণের নিকট বাকী এবং অগ্রিম মূল্যের জন্য ভিঃ পিঃ করিতেছি। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা কোন ক্রমেই ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়গোপাল সরকারবর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব পর্য্যায়] Reg. No. C. 653

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ] ৩য় সংখ্যা]

আষাঢ়— ১৩২৯ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

ফরিদপুর।

বার্ষিক মূল্য—২৲। প্রতি সংখ্যা—৶০

সূচীপত্র

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)



নবপর্য্যায়। ১৩২৯ সাল

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৪শ খণ্ড। { আষাঢ় মাস। } ৩য় সংখ্যা

তুমি ও আমি।

(শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা)।

(১)

বুঝি না কেমন কথা প্রহেলিকাময়,
তুমি আমি ভেদ হীন এক (ই) উভয়।
তুমি প্রভু আমি স্বামী, এক আত্মা তুমি আমি
নাহি কিছু ভেদাভেদ সমান আধার,
সত্যই একত্বে ঘোর সন্দেহ আমার।

(২)

আমি তিল রতি বিন্দু, তুমি যে অসীম সিন্ধু
তোমাতে আমাতে দেখি প্রভেদ অপার।
তৃণটুকু এ মহীতে পারিনা আমি সৃজিতে
তোমারি সৃজন এই বিশ্ব চরাচর।
আমি যে গো বেলাভূমি ডুবাও ভাসাও তুমি
বিপদে পড়িলে ডাকি কোথা দয়াময়।
আমার জীবন গত জন্ম মৃত্যু কত শত
তুমি সচ্চিদানন্দ অনন্ত অব্যয়।

মায়াসিন্ধু মম বুকে আমি মরি মহা দুঃখে
পূর্ণানন্দ তুমি প্রভো সদা সুখময়,
তবু তুমি আমি ? ইহা করিনা প্রত্যয়।

(৩)

সংখ্যাতীত গ্রহ কত উদ্‌ভ্রান্ত পথিক মত
ছায়াপথে অবিরত করিছে ভ্রমণ,
তরুণ অরুণ শত কত চন্দ্র সমুন্নত
ছুটিছে অর্পিতে যেন চরণে চন্দন।
তব পদ স্পর্শ জন্য করিতে জীবন ধন্য
উল্লাসে উচ্ছলে সিন্ধু করিয়া গর্জ্জন।
তোমারি পায়ের দাগে রক্ত আভা মেঘে লাগে
তোমারি স্থজিত বৃদ্ধ গুরু সনাতন,
তোমারি পবিত্র গন্ধে পরিমল মকরন্দে
সুরভিত করে সদা এ ভব-ভবন।
শারদ প্রভাতে হেরি তব পদ ছায়া পড়ি
সরোবরে ফোটে ফুল প্রিয় দরশন।
তোমারি সুরভি শ্বাসে মলয় সমীর আসে
প্রফুল্লিত করে সদা বিদগ্ধ জীবন।
তব স্মৃতি মহাপুণ্য দেহ হয় পাপ শূন্য
কি যেন স্বর্গীয় ভাব করে আনয়ন।
তোমার আসার আশে সকলে আনন্দে ভাসে
আনন্দে ভরিয়া যায় ভূতল গগন।
তোমারি চরণ মাটি বৈষ্ণবে তিলক কাটি
লেখে ভালে হরিনাম ভক্তি নিদর্শন,
তোমারি পবিত্র স্পর্শে কি যেন আনন্দে হর্ষে
জাগায় মানব দেহে অমর জীবন।
তবু তুমি আমি হরি এক (ই) প্রস্রবণ॥

(৪)

জানিনা বেদান্ত ব্যাখ্যা বুঝিনা সোঽহং আখ্যা
চিনিনা কাহারে বলে জ্ঞানের অঞ্জন।
এইমাত্র আমি জানি তুমি হে জগৎ স্বামী
আমি ক্ষুদ্র কীট তুল্য প্রাণীর অধম,
শান্তি সুখ পবিত্রতা একনিষ্ঠ একাগ্রতা
ত্রিদিব বিভব পুণ্য অপার্থিব ধন—
ভক্তি, প্রীতি, নির্ভরতা, শুচি, সত্য, সরলতা,
আমাতে নাহিক কিছু আমি যে দুর্জ্জন।
অই অমা রাহু হেন, আমার পরশে যেন,
হ'বে কলঙ্কিত অই পূর্ণ শশধর,
জগতের মণি মুক্তা হইবে কঙ্কর।

(৫)

শোক তাপ পূর্ণ এই নগণ্য জীবন,
কেহই তাহারে নাহি করে সম্ভাষণ।
আমারে করিতে স্নেহ এ সংসারে নাহি কেহ
বান্ধব বলিতে কত ঘৃণা অনাদর।
অবজ্ঞা উপেক্ষা ভরে আমারে বিদায় করে
আমি যেন ধূধূ করা মরু ভয়ঙ্কর।
তোমার আশার আশে সকলে আনন্দে ভাসে
তুমি ফুল তুমি মধু তুমিই সৌরভ।
তুমি শান্তি সরলতা তুমি পুণ্য পবিত্রতা
তুমি এই জগতের অতুল বিভব।
তবু তুমি আমি হরি, এ তত্ত্ব বুঝিতে নারি
যে বলে বলুক উহা করিনা প্রত্যয়;
মনে হয় উহা যেন দাম্ভিকতা ময়।

(৬)

আমি প্রার্থী তুমি দাতা আমি সৃষ্ট তুমি স্রষ্টা
আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি পরাৎপর।

ব্যাপিয়া আকাশ ভূমি আছ তুমি অন্তর্যামী
পূত কর পরশনে পঙ্কিল অন্তর।
অগতির তুমি গতি তুমি ত্রাতা বিশ্বপতি
শরণাগতের তুমি সখা নিরন্তর।
কহিছে জলদ স্বরে শরতে মেঘ-মল্লারে
আছে ভগবান হরি
দিয়াছে করুণা করি
মানবে বিশ্বাস ভক্তি আর নির্ভরতা,
মানুষ তাহারি দাস সে যে গো দেবতা;
তাঁহারি চরণ স্পর্শে লভে অমরতা॥

স্বামী বিবেকানন্দ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ)

(শ্রীমানদাশঙ্কর দাস গুপ্ত)

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কয়েকটি আমেরিকান ও ইউরোপীয় শিষ্য তাঁহার সঙ্গে আসেন। ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পর এ পর্য্যন্ত যাহা কোনও হিন্দু আচার্য্য কোন দিন করেন নাই, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাই করিয়াছেন—অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা দিগ্বিজয়—ইহা প্রায় সকল অভিনন্দনেই উক্ত হইয়াছিল। রামনাদের রাজা, তিনি ভারতে ফিরিয়া যে স্থানে প্রথম পদার্পন করেন, সেইখানে একটী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নূতন শিষ্যসহ ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করিবার পর, তিনি কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড় গ্রামে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। সেই মঠ নির্ম্মাণাদিতে প্রায়

দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহার সমস্তই ইউরোপীয়দের দান, অধিকাংশ দিয়াছিলেন একটি ফরাসী নারী—Sera C. Bull.

অতঃপর তিনি আর একবার আমেরিকায় যান এবং সেখান হইতে সমগ্র ইউরোপ ঘুরিয়া পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে বেলুড়মঠে মহাসমাধি মগ্ন হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর।

তাঁহার তিরোধানে পাশ্চাত্য দেশে যে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা আজিও লিপিবদ্ধ আছে। শত শত কবিতা-প্রবন্ধে ইংরাজ, আমেরিকান তাঁহার প্রতি তাহাদের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। Mrs Ella Wheeler Wilcox বলেন—"The passing of Vivekananda was like the passing of a shooting star of unmeasured magnitude which illuminated the entire horizon of the whole world. And in truth no purer, holier, truer soul ever dwelt amongst us" কেহ কেহ বিলাপ করিয়াছেন—"কে আর এখন আমাদের পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় ধর্ম শিক্ষা দিবে। আমরা কেবল আশা করিতে পারি তিনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। কারণ তিনিই আমাদের শিখাইয়া ছিলেন—'For he that builds and breaks, shall build again'

যাহারা স্বল্পকালের জন্যও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সাহচর্য পাইয়াছেন অথবা একান্ত মনে তাঁহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার ভক্ত না হইয়া পারেন নাই। তাহারা তাহাদের প্রাণে স্পষ্টই অনুভব করিয়াছেন, এ সহচর্য্যে এ অধ্যয়নে তাহারা নূতন আশা নূতন আলোক, নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। একজন মুসলমান ভদ্রলোক স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন :—

'Swamiji, if in after-days any body claims you to be an Avatar, then I, a Mussalman, will be the first to do so.'

বিশ্ব-বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক William James স্বামিজীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরই তাঁহাকে Master বলিয়া সম্বোধন করেন এবং লণ্ডনের পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ Max Muller সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া স্বামিজী বিদায় চাহিলে তিনি চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিয়াছিলেন—'It is not every

day that one meets with a disciple of Ramkrishna Paramahansa'

যেমন বিদেশে, স্বদেশেও তেমনি। হাহাকারে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ভারতের এমন কোনও স্থান ছিল না যেথান হইতে তাহার জন্য আর্ত্তনাদ ও শোক সভাদির কথা শুনা না গিয়াছিল। আর শুনা যাইবেই বা না কেন? তিনি যে আমাদের আঁধার ভারত গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। অরুণোদয়ের মত পলকে ফুটিয়া পলকে নিভিয়া গেলেন। সে শোক আমরা আজিও ভুলিতে পারি না।

তাই আজিও দেশে-বিদেশে বহুস্থানে তাঁহার জন্মোপলক্ষে উৎসব ও স্মৃতি-সভাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তৎসময়ে বেলুড় মঠে যে পরিমাণে ছাত্র সমাগম হয় তাহা দর্শনীয়; আমাদের দেশের পক্ষে বড় আশারও কথা। যাহারা আমাদের ভাবী ভরসাস্থল, তাহারা যদি তাহাদের জীবনে এই নির্ভিক মহাপুরুষ-টির আদর্শ চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিফলিত করিতে পারে, তাহা হইলেও আমাদের দেশ ধন্য হইয়া যাইবে। কারণ, কি প্রাচ্য, কি পশ্চাত্য, কি আধুনিক, কি পৌরাণিক, সমস্ত সদ্ভাব ও সৎশিক্ষার জন্যই তাঁহার হৃদয়ে একটা আন্তরিক সহানুভূতি বাজিত। বস্তুতঃ তিনি নিজে যেন সে সকলেরই সমষ্টি স্বরূপ ছিলেন। খৃষ্টানেরা তাঁহার নিকট খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। মুসলমানেরা তাঁহার নিকট মুসলমান ধর্ম্মের বিবৃতি শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন। শিখ, পার্শি, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অন্য দিকে জাগতিক ইতিহাস বিজ্ঞানেও তিনি সুপারদর্শী ছিলেন। Harvard বিশ্ব-বিদ্যা-লয়ের Electricityর Professor, Electricity সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমেরিকার একটী ক্রোরপতি ব্যবসাদার বলিয়াছিলেন 'Swami Vivekananda is the most practical man I have ever met with.' Sister Nivedita সত্যই লিখিয়াছেন—'His was the modern mind in its completeness.'

লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী সাহিত্যিক পণ্ডিত ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিতেন—'চীনে যাই, জাপানে যাই, ইউরোপে যাই, আমেরিকায় যাই, ভারতে ফিরি, আজকাল সর্ব্বত্রই কেবল স্বামী বিবেকানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি শুনি। কেউ

তাকে মানে কেউ তাকে মানে না ; কেউ তাকে জানে, কেউ তাকে জানে না ; কিন্তু সকলেরই ঋণ তাঁহার নিকট সমান।'

ইহার কারণ কি ? ইহার একমাত্র কারণ, এই যে তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের জন্য আসেন নাই। ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষকে লইয়া তিনি কোন দলও সৃষ্টি করেন নাই। কোনও শিক্ষা বিশেষ বা প্রণা বিশেষের প্রাধান্য স্থাপনও তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার এক মূল লক্ষ্য ছিল—সত্য,—সত্য, যাহা সর্ব্বগামী, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বপূরক। জগতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, পরস্পর আপাত বিরুদ্ধ, ছোট বড় অগণিত সত্য রাজিকে সুসামঞ্জস্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমীকৃত করা তাহার জীবনের একটা প্রধান কাজ ছিল। এক মূল সত্যেরই শাখা প্রশাখা পল্লবাদিরূপেই যে পার্থিব অপার্থিব সমস্ত সত্যই বিরাজমান, তাহা তাঁহার জীবন বীণার মূল সুর। 'Man does not travel from errow to truth, but from truth to truth, from lesser truth to higher truth, till the undiluted undifferentiated Absolute is reached.' সুতরাং কেউ বাদ যায় না, কেউ বাদ যাবে না। চরম সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, সমস্ত কলরব, সমস্ত বিসম্বাদ শীতল হইয়া যাইবে এবং একটা বিশ্ব আন্দোলনকারী শক্তির ন্যায় (Like a world-moving force) তিনি মোহাচ্ছন্ন জগৎকে সেই চরম সত্যের পথেই টানিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাতে তিনি কত খানি সফলকাম, তাহা ভবিষ্যৎ জগতই সাক্ষ্য দিবে।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র জগতের জন্য আসিয়াও, তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষে তাহার জাতি প্রতিষ্ঠার (Nation making) কাজ যেন একটু বিশেষ রকমের, একটু বিশেষভাবে প্রাণ মাখান। ভারতের নামে তিনি যেন পাগল হইতেন। ভারতবর্ষকে অনেক সময়ে তাঁহাকে My India বা আমার ভারত বলিয়া বলিতে শুনা গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে গিয়া তিনি ভারতের কোনও প্রকার নিন্দা অপমান যেন সহ্যই করিতে পারিতেন না। তাহা যেন শেলের মত তাঁহার বুকে বিদ্ধ হইত। অকাট্য যুক্তির সহিত তীব্র গর্জ্জনে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ খণ্ডন না করিয়া কখনই নিরস্ত হয়েন নাই। তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা লক্ষ্য করিয়া আমেরিকার Town State Register বলিয়াছিলেন 'But

woe to the man who undertook to combat the monk on his own ground and that was where they all tried it who tried it at all. His replies came like flashes of lightning and the venturesome questioner was sure to be impaled on the Indian's shining intellectual lance'

তাহার এই উজ্জ্বল দেশ প্রীতি কোনও কুসংস্কার বা সংকীর্ণ গণ্ডীরেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহা ইউরোপীয়দের দেশ প্রীতির ন্যায় কোনও প্রকার আত্মম্ভরিতা বা পরশ্রীকাতরতা হইতেও উদ্ভূত হয় নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এই পতিত ভারতই আমাদের সমগ্র জগতের জ্ঞানালোক। এই ভারতের উন্নতিতে জগতের উন্নতি, ভারতের জ্ঞানে জগতের জ্ঞান, ভারতের শান্তিতে জগতের শান্তি। তাই এই মহীয়সী, জ্ঞান-ভক্তি-নিকেতন, অতি পুরাতন ভারতভূমি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল—অযোধ্যা, ইষ্টদেবীর মত প্রিয় ছিল. ভারতের প্রতি ধূলিকণা তাঁহার নিকট পবিত্র, মহাসন্মানার্হ ছিল। তাহা তাঁহার নিকট যেন ভগবানের পদরেণু, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি ভক্তি-প্রীতিতে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ভারতের পুরাতন ও আধুনিক ঐতিহাসিক ঘটনা সকল তিনি যে ভাবে ব্যক্ত করিতেন, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রোতাগণের মনে হইত তাহারা যেন, সেই যুগেই অবস্থান করিতেছেন। বুদ্ধ, অশোক, আকবর, সাজাহান, অহল্যাবাই প্রভৃতির কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন এবং তাঁহার এই দেশ-প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, একদিন কোনও পাশ্চাত্য দেশবাসী তাঁহার নিকট হইতে ভারত সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে, তিনি ভাবের আবেগে নিজকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—'a cendensed India'

তাই ভারতের পুনরুদ্ধার তাহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান ছিল এবং তাহার জন্ম ও জগতের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে স্বগতভাবে বলিয়াছিলেন 'আর একজন বিবেকানন্দ থাকিলে বুঝিত।' আমরা বলিব, তাহার পূর্ণ পরিমাপ ভবিষ্যৎ বংশধরেরাই করিবে। বর্ত্তমানে যাহারা যাহা বুঝিয়াছেন তাহারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি তাহা অস্বীকার

করেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাহার নিকট তাহার দেশের ঋণের কথা তাহার বরিশাল বক্তৃতায় কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী গত বৎসর বেলুড় মঠে বলিয়াছিলেন—'Much of my patriotism is delivered from Swamiji's books'

সে যাহা হউক, যাহা পঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন অলোক সামান্য মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের misson বা উদ্দেশ্য একদিকে world-moving অন্যদিকে nation। এই উদ্দেশ্য দুইটীর মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে বিপুল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমাদের দেশের ও জগতের ঋণ অপরিসীম। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই। আমরা প্রতি বৎসর তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানে স্থানে সমবেত হই, আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যেন শুধু তাহাতেই পর্য্যবসিত না হয়। আমরা যেন তাঁহার প্রাণপ্রদ ভাবরাশি আমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচার করিতে পারি। তাহাতে আমাদের কাহারও কিছু হারাইবার ভয় নাই, বরং সকলেই লাভবান হইব। কারণ তিনি কাহাকেও তাঁহার নিজস্ব ছাড়িতে বলেন নাই; বরং বলিয়াছেন 'নিজের ঠাইতে দৃঢ় হও নিজের আদর্শানুযায়ী মানুষ হও' কোন দিন তিনি ইহা বলেন নাই যে 'আমাকে প্রচার কর।'

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি আমার প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি নাই। এ বিষয়ে যাহারা জানিতে চাহেন তাহারা তাঁহার লিখিত পুস্তক ও জীবনী প্রভৃতি পাঠ করিবেন। একটু যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি জন্য জগতে আসিয়াছিলেন এবং কি অমূল্য বস্তু আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্‌যাপন ব্রত প্রতিষ্ঠাই আমাদের দেশের ও জগতের কল্যাণ। তিনি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার কাজ শেষ করিয়া বিদায় হইয়াছেন। আমরা যাহারা তাঁহার দেশবাসী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি, আমরা যেন তাহার লক্ষ্যালোকে চলিয়াই তাহার সে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ধন্য হইতে পারি। তন্নিমিত্ত আমার একান্ত প্রার্থনা, আপনাদের সকলের এবং আমার সমস্ত

দেশবাসীগণের সেই নির্ভিকতা লাভ হউক, যাহা ভারতের গিরি বন ভরিয়া দুর্জ্জয় প্রশান্তিতে চির অনাহত ধ্বনি করিতেছে :—

'Go forward without a path !
Fearing nothing, caring for nothing,
Wander alone, like the rhinoceros !
Even as the lion, not trembling at noises,
Even as the wind, not caught in a net,
Even as the lotus-leaf, unstained by the water,
Do then wander alone, like the rhinoceros.'

পল্লী-সমস্যা-সমাধান।

(শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

গ্রামগুলির উন্নতি করা যেন এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ধনী, মানী, জ্ঞানী গ্রামবাসিগণ এখন প্রায়ই সহরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং দীন, হীন, অনশনক্লিষ্ট, প্রায়শঃ অজ্ঞ নরনারীই এখন গ্রামের অধিবাসী। এ অবস্থায় গ্রামের উন্নতি সাধন বিষয়ে অনেকেই একরূপ হতাশ হইয়াছেন। কিন্তু অবস্থা যতই সঙ্কটাপন্ন হউক না কেন, মঙ্গলময়ের বিধানে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও যে না থাকে তাহা নয়।

অজ্ঞতা নিবন্ধন গ্রামে নানা দলাদলীর ভাব বর্ত্তমান। শিক্ষা, সংস্কারের অভাবে মনুষ্যের হৃদয় হইতে সৎভাবগুলি যেন চলিয়া গিয়াছে। সত্য-নিষ্ঠা, সরলতা, উদারতা, সমপ্রাণতা, এ সব বিশুদ্ধ ভাব লোকে আর বুঝিতে চাহে না, বুঝিতে পারেও না। এ মহা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে

গেলে, নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়—ব্যক্তিগত অজ্ঞতা এবং অনুদারতাই ইহার মূল কারণ। এই জন্য এখন ব্যক্তিগত হিসাবে সদাচার-পরায়ণ হইয়া নিজের এবং গ্রামের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে, দেশের লোক নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। সামাজিকভাবে নানা পূজা, অর্চ্চনাদির আড়ম্বরে বহু অর্থ, সময় এবং শ্রম ব্যয়িত হইতেছে সত্য, কিন্তু আত্মিক ভাবের পুষ্টি সাধন হইতেছে না। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের সংরক্ষণদ্বারা ভারতবাসিগণ গুণে ধর্ম্মে বিভূষিত হইতেন। কালবশে ভিত্তি আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য লোপ পাওয়াতে, বাঁকী আশ্রম তিনটী নষ্ট এবং ভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজের এবং দেশের কল্যাণ করিতে হইলে, প্রত্যেক হৃদয়বান নরনারীকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি যত্নশীল হইতে হইবে। সংযম এবং সদাচার দ্বারা জীবনের ভিত্তি দৃঢ়রূপে গঠিত হইলেই, গার্হস্থ্যাদি অপর আশ্রম তিনটী যথাযথরূপে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা হইবে; নচেৎ উন্নতির সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। এই জন্য গ্রামকে উন্নত করিতে হইলে, প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দুই এক জন নরনারীকে ব্রহ্মচর্য্য পালনে দৃঢ়পণ হইতে হইবে। সরল প্রাণে, চেষ্টা করিলে, এ ঘোর অনিষ্টা এবং অসংযমের দিনেও যে কিছু উন্নতি না করা যায়, এমন নহে। এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে, বালক-বালিকাগণকে দণ্ড-কমণ্ডলু লইয়া, গৃহত্যাগী হইতে হইবে না। গৃহে, স্বজনের যত্নে, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অভ্যাস করিতে হইবে; কখন কখনও বা কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সদাচার, সত্যনিষ্ঠা এবং সংযমের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ব্রতে অগ্রসর হইতে হইবে,—কোন গুরু বা উপদেষ্টার অপেক্ষা রাখিলেই, দলের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইতে হইবে। তখন ব্রতাচরণ অপেক্ষা গোঁড়ামী পোষণেই ব্রহ্মচারীর শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায় নিঃশেষিত হইবে। সুতরাং নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামের ভাবী মঙ্গলের জন্য প্রতি গ্রামে এইরূপ ব্রতধারী অন্ততঃ একজনও থাকা চাই।

প্রত্যেক গ্রামে না হউক, অধিকাংশ গ্রামেই, যাঁহারা গ্রামে বার মাস বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন চিন্তাশীল ব্যক্তি যে না আছেন, এমন নহে। ঐরূপ ব্যক্তিগণ, গ্রামের উন্নতির বিষয় যে যে উপায় জানেন, ঐগুলি নিজে আচরণ করিবেন। বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ভেজাল শূন্য খাদ্যাদি

সরবরাহ, রৌদ্র-বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা, রোগ নিবারণ উপায় এবং রোগী শুশ্রূষাদি বিষয়ে, কৃষি শিল্পাদির উন্নতি সাধন বিষয়ে, তিনি যাহা যাহা জানেন ঐ সবের আচরণ নিজ গৃহে, নীরবে আরম্ভ করিলেই দেখা যাইবে, গ্রামবাসিগণ ঐ নিয়ম অবলম্বনের সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজ নিজ গৃহের অবস্থার উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার প্রভাব এমন ভীষণ হইয়াছে যে, এক গৃহে দুই জন ব্যক্তি এক মত হইয়া কাজ করা কঠিন। এমন কঠিন সমস্যার দিনে, ব্যক্তিগত হিসাবে কাজ করিতে হইলে, তাহাই করিতে হইবে এবং তাহাতেই গৃহের এবং গ্রামের মঙ্গল হইবে। সৎভাবে অনুপ্রাণীত একজন নর-নারীদ্বারা গৃহ, গ্রাম, দেশ সদাচার পরায়ণ হইতে পারে। আবার নিজের ভাব বিশুদ্ধ এবং পুষ্ট এবং সরল না হইলে, শত চেষ্টায়ও নিজের বা গৃহের বা গ্রামের উন্নতি করা যায় না। এ বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহাবাক্য সকলে মনে রাখিলেই কল্যাণ হইবে—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

শিক্ষা সমস্যা।

(শ্রীসতীপ্রসাদ কর।)

কথায় বলে—"লেখা-পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—কিন্তু কই? এই যে রাশি রাশি বাঙ্গালী যুবকের দল বিশ্ব বিদ্যালয়ের গহ্বর হইতে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় দলে দলে উপাধী-চাকতি বক্ষে ঝুলাইয়া সংসার পথে প্রবাহিত হইতেছে, ইহাদের মধ্যে কয়জন আজ গাড়ী ঘোড়া চড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে। দেশেরই বা কি পরিবর্ত্তন হইল? দেশ যে অর্থাভাবে, অন্নাভাবে রসাতলে

যাইতে বসিয়াছে, তাহারই বা কি প্রতিকার হইল? আজ বাঙ্গালী বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া অমূল্য ধন স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান সম্মানের সহিত অধিকার করে, অর্থনীতি শিক্ষা করে; কিন্তু অর্থের মূল্য দেখিতে পায় না। এক অর্থের অভাবেই আজ বাঙ্গালীর সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা একেবারে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালী বিদ্যা উপার্জ্জন করে, উদ্দেশ্য—কোথায় একটী চাকুরী পাওয়া যায়। এই বিদ্যার শেষ উদ্দেশ্যই যেন চাকুরী ও পরের দাসত্ব করা। তাই বড় আশায় বি, এ এম, এ পাশ করিয়া যখন দেখে যে সত্যই সে চাকুরী ব্যতীত অন্য কিছুরই উপযুক্ত নহে, অথচ চাকুরীও তেমন আর মিলে না, তখন হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। আবার চাকুরি না করিলেও পরিবার প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য; তাই যে কোন চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। হায় রে! এমন করিয়া একটা জাতি আর কত দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? কেন এমন হয়? কারণ আমাদের শিক্ষার ভিতর কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই পিতা মাতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাই যেন আমরা বিদ্যাশিক্ষা করি, ইহার ভিতর নিজের কোন অস্তিত্বই যেন নাই। আমরা কেবলই ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি, স্বাধীন চিন্তাদ্বারা কোন দিনও আমরা সেই ভাব স্রোতকে প্রতিহত বা সংযত করিবার চেষ্টা করি না। এই স্বাধীন চিন্তার পিছনে আবার মস্ত বড় একটা জিনিষ আছে, যেটাকে আমরা মোটেই আমল দেই না। সেটা হচ্ছে, আত্ম-নির্ভরতা বা আত্ম-বিশ্বাস। এই আত্ম-নির্ভরতার উপরেই স্বাধীন চিন্তার ভিত্তি সংস্থাপিত।

মানুষ কেবল বহির্মুখী ভাব লইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। সে তাহার নিজকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইবার পূর্ব্বেই পরের চোখে আপনাকে দেখিয়া লয়। এই রকম ভাব লইয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সে কিছুতেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না; মুখস্থ বিদ্যাই কেবল তাহার সার হইবে। সে অন্যের কোনই উপকারে আসিবে না, নিজেরও কোন মৌলিকত্ব থাকিবে না। বহির্মুখী ভাব মানুষের বড় একটা দুর্ব্বলতার চিহ্ন। কারণ তোমাকে যদি কোন লোকে সকল সময় কেবলই 'পাগল—পাগল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে থাকে, তখন তোমার মনে সত্যই এই চিন্তা আসিবে—যে তুমি

পাগল কি না। হয়ত, এই চিন্তাতে তুমি পাগলও হইয়া যাইতে পার। এই যে পরের চোখে নিজকে দেখা,ইহাতেই ছাত্রগণ নিজ নিজ অস্তিত্বকে হারাইতে বসিয়াছে, তাই তাহারা অনেক সময় ভাবে যে পুস্তক মুখস্থ না করিলে কিছুতেই জ্ঞানার্জ্জন করা যায় না, কিন্তু পুস্তক যে উপলক্ষ মাত্র, তাহা তাহারা আদৌ ভাবে না বা ভাবিতে চেষ্টা করে না। মানুষের নিজের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও ভাব যে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা একবারও চিন্তা করে না। এই বহির্ম্মুখী চিন্তাতে মানুষ ক্রমশঃ স্বাধীন চিন্তাকেও হারাইয়া ফেলে।

ভগবান যে মানুষকে জগতের কিছু উপকার করিবার জন্য 'মানুষ' করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে যে ভগবানের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া যায়। অতএব শিক্ষার্থীদিগকে প্রথমতঃ নিজের অস্তিত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে মানুষের মধ্যে একটা মৌলিকত্ব আছে এবং চিন্তা শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই টুকু বুঝিতে না পারিলে, নিজের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, যে অনন্ত তেজ ও জ্ঞান রহিয়াছে, কিছুতেই তাহার উদ্বোধন হইবে না। এই মন্ত্র যজ্ঞের উপযুক্ত হোতা না হইতে পারিলে, চির দিনই বাঙ্গালীকে এমনই দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইবে, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ভাষা কেবল মুখের জিনিষ নয়, উহা মনেরও জিনিষ। এক কথায় ধরিতে গেলে মনের ভাষাতে মুখের ভাষার উৎপত্তি। অতএব এই ভাষাকে উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠিত করাইতে হইলে, প্রথমে মনকে উন্নত করিতে হইবে। মানুষের যদি কোন ভাষা না থাকিত, তবে কে কাহার ভাব বুঝিত, কাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত, কে কাহার জন্য ভাবিত? এই ভাষার জন্যই আজ ভগবানের সৃষ্ট রাজ্যে মানব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব, আর ভাষার দ্বারাই ভগবান তাঁহার সৃষ্ট বৈচিত্র্যের মহিমা মানবের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। এমন ভাষা বিজ্ঞানের উন্নতি কে না চেষ্টা করে?

আজ বাঙ্গালী আত্ম বিশ্বাস হারাইয়া এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর সে নিজেকেই নিজে চিনিতে পারে না। সে বুঝিতে পারিতেছে না যে তাঁহার নিজের ভাষাকে উন্নত করিতে না পারিলে, সে আপনাকে উন্নত করিতে পারিবে না। আজ

বাঙ্গালী এত বড় একটা বিশ্ব প্রেমিক জাত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি আজ নিজকে ভুলিয়া পরকে আপন করিয়া লইয়াছেন; তাহার যেন নিজের কোনই অস্তিত্ব নাই। ইংরেজীতে একটী কথা আছে—'কেহই তাহার নিজের চামড়ার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারে না' কিন্তু বাঙ্গালী তা পারে। তাই বাঙ্গালী আজ নিজের ভাষাকে ভুলিয়া বিদেশী ভাষাকে আপন করিবার বৃথা চেষ্টা পাইতেছে, আর আপনার পায়ে আপনিই কুঠার বসাইতে চেষ্টা করিতেছে। আজ আমাদের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিলে মহাভারত যেন অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহার পবিত্রতা যেন নষ্ট হইবে। ইংরেজী ভাষা যে আমাদিগকে শিক্ষা করা অনুচিত তাহা আমি বলিতেছি না, তবে নিজের জিনিষকে এমন ভাবে দূরে রাখিয়া পরের জিনিষকে এমন আপন করিতে গেলে তাহাতে কোন বাহাদুরী নাই। বাঙ্গালা ভাষা যদি আমরা রীতিমত পাঠ করি, তবে আমাদের চিন্তা, আমাদের বিদ্যাটা আর মুখস্থ বিদ্যা থাকিবে না। তাহাতে নিজের চিন্তা করিবার শক্তি বাড়িয়া যাইবে এবং জ্ঞানেরও বিকাশ পাইবে।

বিজ্ঞান মানুষের চিন্তার আর একটা পদ্ধতি—ইহার গতি কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে নষ্ট হয় না। প্রত্যেক জিনিষকে অপ্রতিহত প্রভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, বিচার করিয়া বুঝিবে, শেষে মীমাংসা করিবে। অতীতের পিষ্টপেষণ-চর্ব্বনে কোন উন্নতি হয় না। তাহাই যদি হইত তবে ভগবান বর্ত্তমানকে সৃষ্টি করিতেন না। আর ইহার জন্য আমাদিগকে পশ্চিমের পানে চাইতে হইবে না। কবি সম্রাট শরচ্চন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন—দেশের প্রয়োজনে দেশের মাটীতে যে জিনিষটী হয় নাই তাহা যত দাম দিয়াই বিদেশ থেকে আনা যাক না কেন, কিছুতেই টিকিতে পারে না, কেননা সেটা দেশের সত্যকার ঐশ্বর্য্য নয়;—একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। একদিন আমাদেরই ত সব ছিল। আমাদের মহাভারত রামায়ণ আমাদেরই গীতা উপনিষদ, আজ সমস্ত সভ্য জগতের আদর্শ এবং সমভাবে আদর পাইতেছে।

অতএব আমাদের সমস্তই ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে। কেবল মাত্র

মানসিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত লয়ের পথে চলিয়াছে। আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহার নিজ নিজ প্রতিভার উন্নতি করিয়া আত্মাকে নবভাবে জাগ্রত করিতে হইবে, তৎপর শিক্ষা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নচেৎ ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না।

শাকদ্বীপ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ

(শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা)

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিতে শাকদ্বীপকে অনার্য্য দেশ বা শাকদ্বীপবাসী শক বা শাক জাতিকে অনার্য্য বলিতে পারি না।

ব্রহ্মা, অগ্নি বা সূর্য্য আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের অভিন্ন দেবতা, ইহা শাস্ত্রদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং শাকদ্বীপবাসী সৌর বা সূর্য্য উপাসক কিম্বা মিত্র ও মৈত্রক বা মিত্রোপাসকগণ বেদানুরক্ত ভারতীয় আর্য্যগণেরই দায়াদ ও সমধর্ম্মী ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গরুড় পুরাণেও ভারতীয় বিভিন্ন জনপদের স্থান নির্দ্দেশ কালে মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন :—

"অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কম্বোজাস্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ দক্ষিণ পশ্চিমে ॥"৫৫।১৫।

অর্থাৎ—ভারতের অম্বষ্ঠ, দ্রাবিড়, লাট, কম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও আনর্ত্ত প্রভৃতি জনপদ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রাচীন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শক জনপদ অবস্থিত, তাহা পুরাণ ব্যতীত গ্রন্থ ও বহু সুপ্রাচীন

শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে। শকজনপদবাসিগণের প্রভাব এক সময়ে ভারত হইতে মিশর পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে শাকদ্বীপবাসিগণের সমাজ-শক্তি অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। শাক্য-সিংহ বুদ্ধদেব এই সময়েই এই সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের আদি হইতেই ভারতে ক্ষাত্রশক্তি প্রবল ছিল। ঋক ও যজুর্ব্বেদে রাজন্য শক্তির যেরূপ আলোচনা দেখা যায়, যাজক সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ক্ষাত্রশক্তি হীনপ্রভ হইলে আর্য্য-সমাজে যাজকগণের সমবেত শক্তির অভ্যুত্থান হয় এবং এ যাবৎ তদবস্থায় আর্য্য-সমাজ চালিত হইতেছে; কিন্তু শাক্যসিংহের অভ্যুদয়ে কিছুকাল ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ হইয়াছিল। সেই সময়েই পুরোহিত সমাজে 'নিঃক্ষত্রিয়' আদি কল্পিত বচনের আড়ম্বর দেখা যায়। সেই সময়েই :—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজাযবনাঃ শকা॥

অর্থাৎ—পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন ও শক প্রভৃতি ক্ষত্রিগণ, ব্রাহ্মণ অদর্শন হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই সকল ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। কৌশলে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মনু মহারাজের কৃত স্মৃতি গ্রন্থে এইরূপ বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই সকল ক্ষাত্র সমাজ ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষাকল্পে সচেষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই, বিশ্বাস ঘাতকের প্রক্ষিপ্ত কত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। মনু সংহিতায় এইরূপ কল্পিত বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াও যখন ফল ফলিল না, তখনই মাতৃঘাতক পরশুরামের 'নিঃক্ষত্রিয়' সংবাদ শাস্ত্র-গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া আর্য্য-জাতির 'জাতীয় বল' বিলুপ্ত করিতেও পুরোহিত সমাজ লজ্জা বোধ করেন নাই। 'আর্য্য ভারতে ক্ষত্রিয় নাই' বলিয়া নির্লজ্জের ন্যায় কল্পিত বচন রচনা করিয়া জগতের সমক্ষে স্ফীত বক্ষে আর্য্য কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছিলেন। জ্ঞানের মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সয়তানের প্ররোচনায় হিংসাবশে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিপতিত হইয়া, অদ্যাপি স্বকৃত কর্ম্মের পাপ ক্ষয় করিবার

জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

পঞ্চনদের 'শাকল' বহুদিন পর্য্যন্ত শাকদ্বীপের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছিল অদ্যাপি রাজস্থানের 'শাকম্ভরী' দেবী শাক্যসিংহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ত্তমান।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায় যে আর্য্যাবর্ত্তে ৬৩ জন শাক্য নরপতি রাজত্ব করেন। পাঠক উক্ত পুরাণের ২৭৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। এই স্থলে স্মরণ রাখিবেন যে তুষার, মুরুণ্ড ও হূণ শাক্যগণেরই শাখা। পুরাণেও উহার বহু নিদর্শন আছে।

যাহা হউক ৬৪ জন শাক্য নরপতি অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পৌরাণিক যুগেই রাজত্ব করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগে শকক্ষত্রপগণ পশ্চিম পাঞ্জাব ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেন, অদ্যাপি সৌরাষ্ট্রের নাগর ব্রাহ্মণগণ শক স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন।

শাক্যবংশের ন্যায় মৌর্য্য বংশও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণ কৌশলে আর্য্য সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছেন। মৌরীয় বা মৌর্য্যগণ ভারতীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের মৌরীয় প্রদেশবাসী বলিয়া ইহারা মৌর্য্য নামে পরিচিত হইতেন। কিন্তু পুরাণের প্রক্ষিপ্ত বচনে মৌর্য্যরাজ 'মুরাদাসীর গর্ভজাত সন্তান' বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। শাকলবাসী ক্ষত্রিয়গণ ও ব্রাহ্মণগণ উভয় সমাজই অভিন্ন বলিয়া বোধ করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই 'মিত্র বা সূর্য্য বংশ' সম্ভূত বলিয়া পুরোহিত ও রাজন্যগণের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসদ্ভাব।

শিকার।

(শ্রীচারুচন্দ্র সেন, এম; এ)।

পূজার পর একদিন জমিদার বাড়ীর পেয়াদা আসিয়া বাবাকে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ম সংবাদ দিয়া গেল। বাবা সে দিন বাড়ী ছিলেন না, নিকটস্থ কোন গ্রামে কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ জমিদারের তলবের কারণ বুঝিতে আমার অধিক সময় লাগিল না। আজ ৫ বৎসর খাবৎখাজানা দেওয়া হইতেছে না। প্রতি বৎসর বাবাকে ডাকিয়া জমিদার শাসাইয়া দেন। বাবা কি করিবেন,—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া বাড়ী ফিরেন।

যুদ্ধারম্ভের পর হইতে গৃহস্থদের দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের নিকট হইতে কমলা তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই "মুখ ঝাম্‌টা" দিয়া বিদায় লইয়া ছিল। যুদ্ধারম্ভের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবা পাটের ব্যাবসা করিতে যাইয়া উপর্য্যুপরি দুই বৎসরে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লোকসান দিয়া ফেলিলেন, হঠাৎ যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় আর সেই ক্ষতিপূরণ করিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে বসিয়া গেলেন. বিশেষ তাঁহার বয়সও হইয়াছে। একমাত্র আশা ভরসা আমি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া ম্যালেরিয়ার দরুণ সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। বাবার সমস্ত উদ্যমই যেন নিভিয়া গেল। আমাকে দিয়া তিনি জজ, মেজিষ্ট্রার, দারোগা কত কি আশা করিতে ছিলেন। আমার রুগ্নতা তাঁহার সমস্ত আশা ভরসাই নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল পাওনাদারেরা গ্রাস করিতে করিতে প্রায় সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেও তাঁহাদের সকলের উদর পূর্ণ হইল না। আদালতের পেয়াদা যখন ক্রোক্ লইয়া বাড়া আসিত, তখন বৃদ্ধ পিতার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইত যে তাঁহার নিজের উপর শমন জারি হইবারও বুঝিবা আর বিশেষ বিলম্ব নাই। চোখ দুটী জলে ছাপিয়া যাইত, পাছে বাবা দেখিতে পান এই ভয়ে তাড়াতাড়িই মুছিয়া ফেলিতাম। অবস্থা বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বে আমাদের বহু বন্ধু বান্ধব ছিল, এখন

একরূপ কেহ আমাদের খোঁজই লইত না। দাস দাসী চাকর প্রভৃতি সকলেই এখন আমরা নিয়মিত সময় মাহিয়ানা দিতে পারি না বলিয়া ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। গেল না, কেবল আমার ছোট ভাই নাজিরের কুকুর "তমি"। 'তমি" এটা বেশ বুঝিত যে আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তবু সে অন্যত্র যাইত না। "তমিকে" বাবা নারায়ণগঞ্জ পাটের ব্যাবসা করিবার কালীন এক সাহেবের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া ছিলেন। সেই অবধি আজ ৫ বৎসর "তমি" এই গৃহেই আছে। তাহার আচার ব্যবহারে মনে হইত যে সে আমাদের সুখেই সুখী, দুঃখেই দুঃখী। দেনাদারেরা যখন জায়গা জমি নিলাম করিয়া লইত তখন "তমি" ও বাবা এবং মার সহিত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। মাঝে মাঝে করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া এই বোবাজীবটী যেন বাবাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা যখন নিজেরাই রাত্রে ঘাটে যাইয়া বাসন মাজিত তখন "তমি" ই আলো মুখে করিয়া তাহাদের আগে আগে পাহারাওয়ালা স্বরূপ যাইত। তমির আচার ব্যবহারে বেশ বুঝা যাইত আমাদিগকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই যেন সে ব্যস্ত।

বাবা বাড়ী আসিলে আমি তাহাকে জমিদার বাড়ী যাওয়ার কথা বলিলাম। কয়েক মণ পাট বিক্রয় করিয়া আমাদের খাওয়া দাওয়া কোন রকমে চলিতেছিল কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে, বিশেষ পূজার পর, তাই বাবা আমাদের খরচের টাকা হইতেই দুইটী টাকা নজরের জন্য লইয়া গেলেন, "তমি"ও বাবার সঙ্গে গেল।

জমিদার বাড়ী যাইয়া বাবা দেখেন, কর্ত্তা হরেন্দ্র বাবু বহির্ব্বাটীতে মস্ত কাচারী জমাইয়া বসিয়াছেন। তিনি মাটী পর্য্যন্ত হাত ঠেকাইয়া খুব একটা সেলাম দিয়া নজরের টাকা দুটী রাখিলেন। বাবাকে দেখিয়াই কর্ত্তা বলিলেন—"কে, ও জাহির এসেছ? বস। দেখ, খাজনা দেবে কিনা, আমি এক কথা চাই এবার।" বাবা বলিলেন—"হুজুর! আমার বর্ত্তমান অবস্থা আপনি বেশ জানেন। ইতিপূর্ব্বে কি কখনও হুজুরের টাকা বাকী পড়িয়াছে? এক দিন ছিল এই হতভাগাই হুজুরকে নবগ্রামের চৌধুরীদের সহিত মামলা করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। আজ আমার সেই দিন নাই। ঋণে আমি জর্জ্জরিত। যা দুই চারি কাণি জমি আছে তাহাও

লোকাভাবে চাষ আবাদ করিতে পারিতেছি না। এখন আর সেই শক্তি নাই যে মাহিয়ানা দিয়া লোক রাখিব নিজেরও বয়স হইয়াছে। কর্ত্তা, পারিলে কি আপনার খাজনা বাকী রাখি?

কর্ত্তা—সে সব বুঝি না। বক্তৃতা রাখ, এবার আমি সব টাকা চাই নচেৎ বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিব, এই কথা নিশ্চিত জেনো।

বাবা বলিলেন—"আমি জানি কর্ত্তা, তা' আপনি কখন কর্ব্বেন না।"

জমিদার বাবুর দ্বিতীয় পুত্র নিকটেই খাতাপত্র ঘাটিতেছিলেন তিনি বলিলেন - "বুড়ো, আর নেকামো কর্ত্তে হবে না, এবার খাজানাটা ভালয় ভালয় দিও। খেতে জুড়ে না ওদিকে বিলাতী কুকুর পোষবার খুব সখ আছে।' বাবা নীরবে বসিয়া সব শুনিয়া যাইতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক এক বার খোদার কথা মনে হইতেছিল। আর মনে হইতেছিল সে দিনের কথা, যখন তাহার একটা কথা লোকে কত মূল্যবান মনে করিত, যখন কর্ত্তা নিজেও তাঁহাকে একটা কিছু বলিতে নিজকে সামলাইয়া বলিতেন, যখন হরেন্দ্র বাবু আদেশ করিতেন না অনুরোধ করিতেন। 'তমি' যেন সবই বুঝিয়াছিল তাই সে বাড়ী আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বার বারই গিয়া সে বাবার হাটুর নীচে মাথা রাখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে 'কুই' 'কুই' করিতে লাগিল। সে যেন বলিতেছিল 'চল বাড়ী যাই, এই পাপ স্থানে বেশীক্ষণ থাকিলেও পাপ হয়। ইহাদের প্রাণে দয়া নেই—ইহারা কেবল টাকাই চেনে।' বাবা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া—কর্ত্তাকে সেলাম করিতেই মেজ বাবু বলিয়া উঠিলেন—'জাহির, তোমার এই কুকুর আমি চাই, ইহাকে রাখিয়া যাও।' বাবা বলিলেন, 'বাবু আমার ছোট ছেলেটী ইহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। সরলভাবে বলিতে গেলে ইহাকে না দেখিয়া আমরা কেহই থাকিতে পারি না। তবে নাজির ওকে বড্ড ভালবাসে। মেজ বাবু উত্তর করিলেন 'গরীবের ছেলের আবার কুকুর পোষার সখ কেন? আমি একে রাখবই। ওরে, কে আছিস্—এই কুকুরটাকে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ।' নিকটেই একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ একটা শিকল আনিয়া 'তমি'কে বাঁধিয়া ফেলিল। 'তমি'

প্রথমে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করিল এবং বাবার দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কেউ কেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সে বলিতেছিল 'ওগো আমায় ফেলে যেও না, আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পার্ব্বো না।' 'তমির' কাতরতায় তিনি আরও কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন 'মেজ বাবু, ওই আজ পর্য্যন্ত আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া ত্যাগ করে নাই নচেৎ আর সকলেই আমাদের ত্যাগ করিয়াছে। আমি যে ক'রে পারি খাজনা দিয়ে যাব, ওকে আমার সঙ্গে যেতে দিন। মেজো বাবু কঠোর ভাবে উত্তর করিলেন যাও যাও বুড়ো বেশী বাড়াবাড়ী ক'রো না, কুকুর পাবে না। বাবা "তমি"কে জড়াইয়া ধরিয়া একটী চুম্বন করিয়া জলভরা চোখে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন বাবার আসার সময় "তমি" শিকল ছিড়িয়া তাঁহাকে অনুসরন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা! "তমি"র আর্ত্তনাদ বহুদূর পর্য্যন্ত বাবার কর্ণে পৌছিল।

প্রাণভরা একটা অভাব লইয়া বাড়ী আসিয়াই বাবা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি গৃহে শুইয়া ছিলাম, বাহিরে আসিতেই বাবা ব'লয়া উঠিলেন উহারা "তমি"কে জোর করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। নাজির নিকটেই ছিল সেও "তমি" "তমি" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মাও রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার মুখ হইতে একবার মাত্র "খোদা" এই শব্দটী অলক্ষে বাহির হইয়া পড়িল। আমি যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। নাজির বাবাকে বারবারই "তমি"র কথা বলিয়া ব্যতিব্যাস্ত করিয়া তুলিতে ছিল। সে দিন আর বাড়ীতে একরূপ খাওয়া দাওয়া হইল না। আমাদের সে দিনকার অবস্থা কেহ দেখিলে নিশ্চয়ই মনে করিতেন যে বিশেষ কোন গুরুতর কিছু একটা ঘটিয়াছে। নাজির সমস্ত দিন 'তমি' 'তমি' করিয়া কাঁদিয়া সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়িল। মা সমস্ত বাড়ীময় "তমি"র স্মৃতি দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। রাত্রিতেও নাজির ঘুমের ঘোরে দুই তিন বার "তমি" "তমি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রত্যুষে মা গৃহের দরজা খুলিতেই দেখেন যে "তমি" শিকল ছিড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। মা তখনই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, নাজির ঘুম হইতে লাফাইয়া উঠিয়া যাইয়া "তমি"র গলা জড়াইয়া কত আদর

করিতে লাগিল। ওদিকে জমিদার বাড়ী প্রত্যুষে ছিন্ন শিকল দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে 'তমি' পলাইয়া আসিয়াছে এবং ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে আমাদের এখানেই আসিয়াছে। মেজে বাবু মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন কিন্তু কি করিবেন, আমাদেরতো কোন অপরাধ নাই। তিনি ভৃত্যদের বলিলেন ওরে আমি আর খানিক বাদে শিকারে যাব, তোরা একজন আমার সঙ্গে যাবি। যাবার সময় নাজিরের বাড়ীটা খোঁজ করে যাব, যদি কুকুরটা ওখানে গিয়া থাকে তবে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

বেলা আন্দাজ ৯॥ ঘটিকার সময় মেজবাবু বন্দুক কাঁধে করিয়া একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। নাজির তখন "তমি"কে লইয়া আদর করিতেছিল। "তমি" উহাদের দেখিয়াই উহাদের অভিসন্ধি বুঝিল এবং ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া এক একবার উহাদের দিকে ছুটীয়া যাইতে লাগিল। মেজবাবু "তমি"কে ধরিতে ভৃত্যকে হুকুম দিলেন কিন্তু ভৃত্য "তমি"র এ ভাব দেখিয়া সাহস করিল না। অবশেষে মেজবাবু স্বয়ং ধরিবার জন্য বন্দুকটী নামাইয়া রাখিলেন। এতক্ষণ বাবা কিছু বলেন নাই এইবার তিনি বলিলেন বাবু আমিই ওকে ধরে দিব। এখন আপনি যেন ওকে ধরিতে যান না, কামড় দিতে পারে। বাবার নিষেধ না মানিয়া মেজবাবু যেই "তমি"র ঘাড়ে হাত দিতে যাইতেছিলেন অমনি সে তাহার হাতে কামড় বসাইয়া দিল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মেজবাবু বন্দুক তুলিয়া "তমি"কে লক্ষ করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন। বন্দুকের শব্দের প্রতিধ্বনি শেষ হইতে না হইতে "তমি"র দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। নাজির এবং বাবা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মা ঘর হইতে ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, আমি চোখে অন্ধকার দেখিলাম মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলাম! মেজে বাবু বলিয়া উঠিলেন যেমন পাজী তার তেমিন ফল। ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া তিনি ত্রস্ত ভাবে ঔষধ দিবার জন্য গৃহে ফিরিলেন। সেই দিন শিকার এখানেই শেষ হইল—কেবল আমাদের "তমি"কেই শিকার করিলেন।

"তমি" যে স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নাজির এখনও সেখানে আলো দেয় এবং প্রতিবৎসর তাহার মৃত্যুর দিন আমরা এখনও তাহার স্মৃতি পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না।

ম্যালেরিয়া।

(শ্রীরতিনাথ মজুমদার)।

Fair science did not frown on his humble birth,

And melancholy marked him for her own.

একদিন ইংরাজ কবিবর Grey আবেগভরে উপরোক্ত কবিতাটী গাইয় যাহাতে মৃত্যুর পর ঐ কবিতাটী তাহার কবরের উপরিভাগে শিলাখণ্ডে অঙ্কি থাকে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা আমার মৃত্যুর প যখন এই চির ম্যালেরিয়া লাঞ্ছিত দেহ ম্যালেরিয়া প্রদত্ত সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরিণামে ভস্মে পরিণত হইবে তখন সেই শ্মশান ক্ষেত্রে আমার কোন স্মরণার্থী ব্যক্তি পশ্চাল্লিখিত কবিতাটী যেন কোন স্মারক স্তম্ভে অঙ্কি করেন।

Cruel Cholera did not frown on his humble birth,

And malaria marked him for him own.

হায় কলেরা তোমাকে আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তুমি শৈশবে আমাকে পিতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, ভাই ভগ্নীর বাল্য খেলার অবসান না হইতেই ভগ্নীকে পৃথিবী হইতে কোথায় লইয়া গিয়াছ, জ্যেষ্ঠের স্নেহ প্রাপ্ত হইবার প্রথম সোপানেই তাঁহাকে কোন অজানিত প্রদেশে অন্তর্হিত করিয়াছ, বাল্য সীমা ভালরূপ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে অতুল মাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। অতএব হে কলেরা তোমাকে আমি দূর হইতে নমস্কার করিতেছি।

হে মানব কুসুম শোষী, বাঙ্গালী বিধ্বংসি ম্যালেরিয়া, তুমি আমার চির সহচর। বাল্যকাল হইতে তুমি আমার ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছ, তোমার কৃপায় আমার শরীরে কখন বৃথা ভার বর্দ্ধক মেদ মাংস অবস্থিতি করিতে সাহস করে নাই। মধ্যে দিন কয়েক তুমি আমার প্রেম ভুলিয়া গিয়াছিলে বটে, কিন্তু আমার পরিণয়ের পর বোধ হয় মনে করলে যে তোমার চির লব্ধ ব্যক্তি বুঝি অন্যের প্রেমে আবদ্ধ হয়, সেই ভয়ে তুমি আমাকে

অধিকতর আদরের সহিত আলিঙ্গন করিলে। আরব উপন্যাসের সেই সিন্ধু-বাদ বণিকের স্কন্ধস্থিত বৃদ্ধের ন্যায় তোমার সেই রক্ত-মাংসশোষী আলিঙ্গন হইতে পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে আমি অব্যাহতি পাই নাই, এখন এই পরিণত বয়সেও মধ্যে মধ্যে তোমার সেই মধুর আলিঙ্গনে আমি বঞ্চিত নাই। অতএব হে আমার চির সহচর ম্যালেরিয়া আমি তোমার এই ঋণ পরিশোধার্থ তোমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, নচেৎ লোকে আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবে।

তোমার জন্ম বৃত্তান্ত লিখিতে আমি তিন প্রকার চেষ্টা পাইব, প্রথমতঃ পৌরাণিক অনুসন্ধান (mythological) দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক (Historical) অনুসন্ধান তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক (Scientfio) অনুসন্ধান। এই তিন প্রকার অনুসন্ধানের সহ যদি অধিদৈবিক আধিভৌতিক প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া তোমার অসংখ্য কীর্ত্তি কলাপের কিয়দংশ ও কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হই, তাহাতে ও আমি ক্ষান্ত হইব না। ফলে এই দাস will spare no pains to spread and seing your country wide influence and unquestionable monerchs upon the poor and half-faded Bengalees, who now have broaded over the dreams of the new system of Self-Government or colonial Self-Government or স্বরাজ। কিন্তু আমারদোষ নাই প্রভু, তোমার অসামান্য প্রেম ভরে আমার যেন শেষে সেপের ভিতর আশ্রয় লাভ করিতে না হয়।

হে চির সহচর ম্যালেরিয়া, পুরাণাদি অনুসন্ধান করিয়াও তোমাকে পাইলাম না। তবে তোমার জ্ঞাতিদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত আমি দিতেছি:— মহাভারতে লিখিত আছে যে দেবাদিদেব মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ অবরোধ করেন তখন সেই রোষ কষায় নেত্র পঞ্চাননকে দর্শন করিয়া যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবী হরিণী রূপ ধারণ করিয়া, পলায়ন পরায়ণা হন। তখন ত্রিশূলপাণি ধূর্জ্জটি সেই পলায়মানা দেবীর পশ্চাৎ ধাবন করেন। তাঁহার সেই পশ্চাৎ ধাবনের ক্লান্তি বশতঃ তাঁহার ললাট দেশ হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম মৃত্তিকায় পতিত হয় তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি সেই হইতেই পৃথিবীর নরগণের উপর ইহার অদম্য প্রভাব। আবার হরিবংশে নরক বধ পর্ব্বে শৈব ও বিষ্ণু জ্বরের উৎপত্তির কথাও আছে

এবং পরে জরাসুরের উৎপত্তি বৃত্তান্তও আমরা পাইয়াছি। তুমি ও সেই জাতীয়, তোমার উৎপত্তি ত বড়ই উচ্চস্থান হইতে হইয়াছে। কিন্তু উচ্চ হইতে জন্মিলেও তুমি তোমার স্বভাব দোষে শূর পদবী প্রাপ্ত হও নাই। তুমি অসুরের দলে সন্নিবিষ্ট। তাই তোমার আদি পুরুষ জরাসুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি তোমার আদি পুরুষের তিন পদ। বোধ হয় তুমিও তিন পদী হইবে। তোমার তিন পদ হওয়া সঙ্গত। কারণ তুমি যাহার আশ্রয় গ্রহণ কর সে অচিরকাল মধ্যেই হয় চলৎশক্তি রহিত না হয় কোন ক্রমে তিন পদের সাহায্যে গতায়াত করিতে বাধ্য হয়। পুরাণে তোমার আদি-পুরুষের সাক্ষাৎ পাইলেও তোমার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তুমি বোধ হয় পৌরাণিক কালের নহ। তোমার যে তেজ তাহাতে তুমি পৌরাণিক কালের নহ বলিয়াই অনুমিত হয়। পৌরাণিক কালে জরের যাওয়া আইসার একটা নিয়ম ছিল। তুমি কিন্তু সে সমস্ত নিয়মের অধীন নহ। তুমি এখন আর পূজায় সন্তুষ্ট হও না, মানসে বাধ্য হও না, তন্ত্র মন্ত্র গ্রাহ্য কর না, শান্তি স্বস্ত্যয়নের ধার ধার না। তোমার আদিপুরুষেরা যে সকল ঔষধের অধীন ছিল তুমি এখন সে সমস্তের এক প্রকার গ্রাহ্যের মধ্যে আন না। কাজেই তোমার তত্ত্ব জানার জন্য পৌরাণিক চেষ্টা বৃথা। সেই কারণে তোমার জন্য আর অধিক কেতাব, পুরাণ ঘাটা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। দেখি ঐতিহাসিক যুগে তোমার কতদূর কি নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগেও তোমায় ধরা সুকঠিন। তুমি ভাল করিয়া কোথায়ও ধরা দিতে নারাজ। শুনিয়াছি সোণার গৌরনগরীটীকে তুমিই ইষ্টক স্তূপে পরিণত করিয়াছ। কিন্তু তথায় অনুসন্ধানে তোমায় ধরা যায় না। তুমি সৈয়দ বন্দরের নিকটবর্ত্তী ইস্মানিয়া প্রভৃতি স্থান উচ্ছিন্ন দিয়াছ। এসিয়ার বহু স্থানই তোমার বাহুবলে নির্জ্জিব ও শ্রীহীন। আফ্রিকায়ও নাকি তোমার ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তবে তাহারা বড় ইতিহাসের ধার ধারিত না, কাজেই তথায় ইতিহাসে ধরা পড়ায় তোমার কোন ভয় নাই। আমেরিকাতেও তোমার উৎপাত বড় কম ছিল না। শুনিয়াছি পানামা যোজকের উভয় পার্শ্বস্থ ভূভাগ তোমার উৎপাতে জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন তাহারা তোমার প্রভাব হইতে এক প্রকার মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তোমার জন্মস্থান কোথায় তাহা ইতিহাস বলিতে পারে না। কোথায় তোমার জাত কর্ম্ম ও অন্নাস, ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল তাহা আমরা ভালরূপ জ্ঞাত নাই। কিন্তু কোথায় তোমার নামকরণ হইয়াছে আমরা তাহা জানিয়াছি। ইতিহাস তোমার সে সংবাদ আমাদিগকে জানিয়া দিয়াছে। যেখানে প্রাচীন রোম রাজ্যের আর্বির্ভাব হইয়াছিল, যে স্থানের জ্ঞান ও সভ্যতার জন্য আধুনিক ইউরোপ গর্ব্ব করিয়া থাকে সেই সুজলা সুফলা পুষ্পময়ী দ্রাক্ষা সুশোভিতা ইটালী দেশে তোমার নামকরণ হইয়াছে। তুমি তোমার নামকরণ সময়ে ইটালীর কর্দ্দমময় জলাভূমিতে ছিলে তাহা আর তোমার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তুমি সেই ফল পুষ্প ও দ্রাক্ষালতা প্রসূতি ইটালীকে এক দিন মহা জ্বালাতন করিয়াছিলে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার প্রতাপে যে কত দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে কত দেশ শূন্য হইয়াছে, আর কত দেশ যে জ্বালাতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যাহা হউক প্রভু তোমার মূর্ত্তি কিরূপ তুমি কঠিন, তরল, না বায়বীয় পদার্থ? তুমি অকস্মাৎ আমার সহিত বসবাস করিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম তোমার মূর্ত্তিটী কিরূপ? তোমার স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া আমার শরীর কৃশ ও অবসন্নের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু হে ম্যালেরিয়া তোমার মূর্ত্তিটী কখনও দেখিতে পারিলাম না! ল্যাটিন ভাষায় ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ মন্দ বায়ু। তাহা হইলে তোমার মূর্ত্তি বায়বীয় কিন্তু তোমার জন্য বায়বীয় পদার্থ নিচয়কে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছে। বায়বীয় পদার্থের নানাপ্রকার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও তোমার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শেষে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন যে তুমি বায়বীয় পদার্থ নহ। তরল পদার্থেও তোমার অস্তিত্ব দেখা যায় না। কঠিন পদার্থেও তোমার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে হে ম্যালেরিয়া তুমি কিরূপ পদার্থ?

তোমার অনুসন্ধান জন্য নানা দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলাম তোমার কোথায়ও তেমন পরিচয় পাইলাম না। আয়ুর্ব্বেদ অনুসন্ধান করিলাম তোমার বহুতর জ্ঞাতির সাক্ষাৎ পাইলাম। কিন্তু তোমার চিহ্নমাত্র তথায় দেখিলাম না। সেই আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে তোমার জ্ঞাতিদের দমনের জন্য

বহু অস্ত্র-শস্ত্রের আবির্ভাব দেখিলাম কিন্তু তোমার দমনের কোন উপায় দেখিলাম না। এমন কি তোমার নামটীও তথায় খুঁজিয়া পাইলাম না। কিম্বা তোমার লক্ষণাক্রান্ত কাহাকেও তথায় দেখিলাম না। তোমার জ্ঞাতিরা যে সকল উপায়ে দমিত হয় তুমি সেই সকলকে বড় একটা গ্রাহের ভিতর আন না। বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভব সময়ে তোমার জন্ম হয় নাই। কাজেই আয়ুর্ব্বেদ তোমার নাম গন্ধ বর করেন না।

তাহার পর হাকিমি শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলাম তথায় ও তোমার বড় সন্ধান পাইলাম না। তোমার জ্ঞাতি বন্ধুদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই হাকিমি শাস্ত্র তাহার প্রসূতি স্বরূপা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ন্যায় বহু উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন কিন্তু তোমার জন্য বড় কিছুই করিতে দেখা যায় না। কাজেই তখন তোমার জন্ম হইয়া থাকিলেও সভ্য সমাজে বর্ত্তমান কালের ন্যায় তুমি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পার নাই। হোমিও প্যাথিক বল কিম্বা অন্য কোন দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রই বল, তাহারা তোমার প্রতিশোধের বিশেষ আয়ুধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কিন্তু সহজে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তুমি যাহার আশ্রয় গ্রহণ কর তাহার শোণিত মধ্যে এক প্রকার বীজাণু লক্ষিত হয়। এখন তাহারা বলেন ঐ বীজাণুই তোমার মূল কারণ, যাহা হউক প্রভু এখন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের হস্তে তুমি বীজাণুরূপে ধরা পড়িয়াছ। এখন পণ্ডিতেরা তোমার সেই বীজাণুর হিমামিবা আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। হে হিমামিবারূপি ম্যালেরিয়া, তুমি কোথায় অবস্থান কর এবং মানব শরীরে বা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়া থাক তাহা জানিবার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলী বহু গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকে মনে করিলেন তুমি বায়ু মধ্যে অবস্থান কর। বায়ু মধ্যে তোমার বহু অনুসন্ধান চলিল কত নগরে, কত পল্লীতে, কত জলাশয়ে, কত বনে, কত উপবনে, কত পুলিনে, কত জলা প্রদেশে তোমার অনুসন্ধান চলিল কিন্তু কোথায়ও তোমার কারণরূপি হিমামিবার দর্শন লাভ ঘটিল না। কি শুষ্ক বায়ুতে, কি আর্দ্র বায়ুতে, কি জলীয় বাষ্পময় বায়ু রাশিতে কোথায়ও তোমার হিমামিবার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। বায়ু রাশিকে বিশ্লেষণ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল বায়ুর আদিভূত

অম্লজান, যবক্ষারজান, অম্ল অঙ্গারক, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি মূল ভূত পদার্থের পর্য্যন্ত বিভাগ করা হইল কিন্তু কোথায়ও তোমার হিমাগিবার সন্ধিৎ না পাইয়া তাঁহারা বায়বীয় পদার্থ অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন তুমি তরল পদার্থে অবস্থান কর মনে করিয়া তরল পদার্থে তোমার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। নদীর জল, কূপের জল, পুকুরের জল, গর্ত্তের ও জলাভূমির আবদ্ধ জল সর্ব্বত্র তোমার অনুসন্ধান চলিল, কৈ তোমারাত চিহ্ন কোথায়ও মিলিল না তোমাকে অনুসন্ধান জন্য তাঁহারা নানা জলাভূমি সেই দাম দল আবরিত বিল ঝিল প্রভৃতিতে সেই ঘৃণিত কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা সেবিত জলাকীর্ণ ভূমি ভাগে কোথায় তোমার অনুসন্ধান করিতে বাকী রাখিলেন না। তুমি তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া বোধ হয় প্রচ্ছন্ন ভাবে মৃদু মৃদু হাসিয়াছিলে কিন্তু তাহারা অদম্য পরিশ্রমে তোমার হিমাগিবারূপি বীজাণুর অনুসন্ধানে কোনরূপ চেষ্টা করিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। কিন্তু কোথায়ও উহার অস্তিত্ব মিলিল না। জলকে তাহারা বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিলেন এবং বরুণ দেবের আদিভূত যবক্ষারজান, উদজান অঙ্গারক প্রভৃতি ভূত পদার্থ নিচয় লইয়া তোমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মায়া ধন্য তুমি এত তপস্যায়ও তাঁহারা তোমার অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তাঁহারা জলীয় পদার্থ ত্যাগ করিয়া তোমার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কঠিন পদার্থ অবলম্বন করিলেন এবং সমস্ত কঠিন পদার্থে তোমার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও তোমায় পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিলেন বুঝি অবস্থিতি আছে কিন্তু বিভূতি নাই অথবা তুমি বুঝি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। মনুষ্য শরীরে তোমার বিকাশ এবং মনুষ্য শরীরে তোমার পরাক্রম দেখাইবার স্থল। মনুষ্য শরীর ভিন্ন অপর কোথায়ও থাকিতে পছন্দ কর না। মনুষ্য-রক্ত ভিন্ন অন্য কোন আহারে তুমি তৃপ্ত নহ। কিন্তু বিজ্ঞানবিদেরা তোমার অনুসন্ধান না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তাই তাহারা মনুষ্যের সমস্ত আহার্য্য পদার্থে তোমার অনুসন্ধান চলিল। চাউল, ময়দা, মৎস, মাংস ও সমস্ত উদ্ভিজ্য পদার্থে তোমার অনুসন্ধান চলিল কিন্তু কোথায়ও তোমার কারণরূপি হিমাগি-বার দর্শন লাভ ঘটিল না। মহা সমস্যা, তোমার অনুসন্ধান লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, দ্বিগুণ বেগে আবার তোমার অনুসন্ধান

চলিল। তখন মৃত্তিকা, গুল্ম, কাষ্ঠ, লতা, পাতা, বৃক্ষ প্রভৃতিতে তোমার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল কিন্তু হায় সমস্তই বৃথা হইল, কোন পদার্থেই তোমার হিমামিবার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। মনুষ্যের পোষাক পরিচ্ছদ ও বিলাস দ্রব্যে তোমার অনুসন্ধান চলিল কিন্তু হে চির সহচর, তুমি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ধরা দিলে না। তখন গৃহ পালিত পশু পক্ষীতেও তোমার অনুসন্ধান চলিল, কত পশু পক্ষীর রক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইল কিন্তু কৈ অচিন্তরূপি চির সহচর তোমার অনুসন্ধান ত কোথায়ও মিলিল না। তৎপর যে সকল প্রাণী মনুষ্যের আশ্রয়ে বাসকরে তাহাদের মধ্যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কত প্রাণীর রক্তে পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্ত রঞ্জিত হইল কিন্তু তোমার হিমামিবা কোথাও মিলিল না। পণ্ডিতমণ্ডলী হতাশ হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে এই হিমামিবা রোগীর শরীরে প্রবেশ করে, এই বিষয় স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহারা বড় বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। মানব শক্তি যেন তোমার মূল কারণ অনুসন্ধানে পরাস্ত হইয়া পড়িল। বড়ই লজ্জার কথা পণ্ডিতমণ্ডলী আবার প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার হিমামিবার অনুসন্ধানে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন। এবার যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী মনুষ্য-রক্ত আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে তাহাদের উপর অনুসন্ধান চলিল। উৎকুন, জনোকা, ছাই-পোকা, মাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি প্রাণীর রক্ত বিশ্লেষণ ক্রিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে মশকী রক্তে তোমার হিমামিবার বিদ্যমানতা লক্ষিত হইল। পণ্ডিতমণ্ডলীর বহু কালের তপস্যার ফল দৃষ্টে মনুষ্য সমাজে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হে মশকী বাহিত ম্যালেরিয়া এখন তুমি ধরা পড়িলে। তোমার জুয়াচুরি ভাঙ্গিতে পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কি কোন উপায়েই তোমার একটু অপ্রতিভ ভিন্ন তোমাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। মশক শরীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে তুমি সকল মশক শরীরে বাস কর না। এন ফিনিস্ নামক এক প্রকার মশকী গর্ভে তোমার বিদ্যমানতা লক্ষিত হয়। আবার অনুসন্ধান চলিল। হিমামিবা কোথা হইতে এই মশকী শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাই তাঁহারা জানিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন বহু গবেষণার পর জানাগেল যে ম্যালেরিয়া গ্রস্থ রোগীর শরীর হইতেই হিমামিবা মশকী শরীরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

কিন্তু তুমি আদিতে কোথা হইতে কি প্রকারে মনুষ্য রক্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা আবিষ্কার করিতে এখনও পণ্ডিতমণ্ডলী অসমর্থ। অতএব হে মানব পণ্ডিতমণ্ডলী বিজয়ী ম্যালেরিয়া তোমাকে নমস্কার। হে বন্ধু প্রবর আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি যে তুমি কোনও কোনও দেশ হইতে তাড়িত হইতে বাধ্য হইলেও তোমার প্রিয়তম বঙ্গ দেশ হইতে কখন তুমি তাড়িত হইবে না। অতএব হে চির সহচর প্রিয় ম্যালেরিয়া তুমি আমাদের উপর অদম্য তেজে রাজত্ব করিতে থাক এবং প্রতিবৎসর আমরা তোমার রাজকর স্বরূপ রক্ত মাংস ও প্রাণ উপহার দিয়া এই বাঙ্গালী জন্ম সার্থক করিব।

বঙ্গীয় কায়স্থ মহা-সম্মেলন।

বিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ রবি ও সোমবার কুচবিহার রাজধানীতে বঙ্গীয়-কায়স্থ-সভার বিংশ বার্ষিক অধিবেশন মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের সমাবেশে অন্যান্য অধিবেশনের তুলনায় এবারের অধিবেশনের বিশিষ্টতা যথেষ্ট ছিল। ইঁহাদের জন্য ময়দানের উপর পৃথক পৃথক বস্ত্রাবাসের (তাঁবুর) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দূর হইতে জন সমাকীর্ণ স্বেচ্ছাসেবকগণ সংরক্ষিত পট মণ্ডপ এবং হর্ম্ম্যরাজি পরিশোভিত এই অভিনব 'কায়স্থ-পুরী' দেখিয়া সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। ফল কথা কুচবিহারাধিপতি তাঁহার রাজ্যে অতিথিগণের জন্য কুচবিহার রাজ্যের উপযুক্ত ঐতিহাসিক আতিথেয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি ব্যতীত এই বিরাট কার্য্য কুচবিহারস্থ কায়স্থ মণ্ডলীরপক্ষে এরূপ সুবন্দোবস্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

৩রা বৈশাখ বেলা ১০ঘটিকার সময় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিনিধিগণকে লইয়া ট্রেনখানি কুচবিহার ষ্টেসনে পৌছিবামাত্র চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়। স্বেচ্ছাসেবকদল ট্রেনের ধারে সার দিয়া দাঁড়াইল, কুচ-

বিহার শাখা সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র ভূষণ ঘোষ (ইনি মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের দৌহিত্র এবং ঋষি প্রতিম শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ (কুচবিহার রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট) অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ রায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য সভাগণ সকলেই ষ্টেশন প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন এবং মাননীয় সভাপতি ও প্রতিনিধিগণকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রতিনিধিগণকে লইবার জন্য বহু মোটর, ল্যাণ্ডো, ও পাল্‌কী গাড়ী ষ্টেসনে অবস্থিত ছিল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ গাড়ীতে করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ভবনে লইয়া গেলেন।

সেই দিন বেলা ১ঘটীকার সময় সভার অধিবেশন হয়। কুচবিহার সহরের রমণীয় সরোবর 'সাগর দিঘীর' পশ্চিম পাড়ের অবস্থিত সুবৃহৎ সুরম্য 'ল্যান্স-ডাউন হলে' (Lans down Hall) সভা অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। বড় বড় তৈল চিত্র, আয়না এবং ঝাড় ও বৈদ্যুতিক আলোকে বিস্তীর্ণ হলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল।

সভাস্থলে চেয়ার, টেবিল ও তদানুসঙ্গিক কোন আসবাবই ছিল না। দুগ্ধফেননিভ ফরাসের বিছানার উপর সকলে জুতা খুলিয়া বসিয়া খাঁটী দেশীয় ভাবে সভা করিয়াছিলেন। মছলন্দ পাতিয়া ও ছোট একটী সুন্দর ডেস্ক সম্মুখে রাখিয়া সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি এল মহাশয়ের পৃথক বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। মাননীয় কুচবিহারাধিপতি ও তাঁহার অনুজের জন্য পৃথক পৃথক মূল্যবান মছলন্দের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভার বিবরণ সংগ্রহকগণের জন্যও সবুজ রংয়ের বনাতে আবৃত ছোট ছোট ডেস্ক দিয়া লিখিবার ব্যবস্থা করা হয়। পূজনীয় ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের জন্য বসিবার স্বতন্ত্র স্থান করা হইয়াছিল।

সভাপতি মহাশয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ হল এবং বাহিরের বারেণ্ডা জন সমাগমে পূর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহুসংখ্যক কায়স্থ সন্তান এবং অন্যান্য জাতির বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ—

সভা-সমিতি।

বিগত ৮ই বৈশাখ শুক্রবার গৌরীপুর (আসাম) রাজধানীতে শ্রীশ্রী৺ মহামায়া দেবীর বাটীর নাটমন্দিরে পরমবিদ্যোৎসাহী অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর মহোদয়ের উদ্যোগে কায়স্থ সভার এক মহতী অধিবেশন হয়। সভাস্থলে গৌরীপুরস্থ গণ্য মান্য অনেক কায়স্থ এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থল বৈদ্যুতিক আলোকাদিতে সুসজ্জিত এবং জনসমাগমে অতি প্রীতি প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছিল। সমাগত কায়স্থ দিগের উৎসাহব্যঞ্জক মুখশ্রীতে স্বজাতির বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। সভাস্থলে ফরাস বিছানার সুন্দর বন্দোবস্ত এবং মহিলা দিগের জন্য যবনিকার (Screen) অন্তরালে স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আসামের মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রী৺ শঙ্কর দেবের প্রিয়তম শিষ্য কায়স্থাবতার শ্রী৺ মাধব দেবের ভাগিনেয় শ্রী৺ রামচরণ ঠাকুরের অধঃস্তন পুরুষ সুকবি শ্রী৺ কণ্ঠভূষণ ঠাকুর (শ্রীপাট৺দলগোমাসত্রের অধিকারী) মহাশয়ের বংশধর শ্রীযুক্ত অমৃতভূষণ ঠাকুর অধিকারী (ইনি আসামীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ নামঘোষা ও কীর্ত্তন ঘোষার প্রকাশক) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করতঃ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বর্ণধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়কে উপরোক্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। প্রচারক মহাশয় প্রচারক মহাশয় সুললিত স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপাশীষ প্রার্থনা করিয়া, তদনন্তর শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সহযোগে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করতঃ তাঁহাদের সেই লুপ্ত স্বধর্ম্ম (ক্ষত্রিয়াচার) গ্রহণের প্রয়োজনীতা ও কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকলকে উদ্বোধিত করেন। অতঃপর তিনি কায়স্থদিগের মধ্যে পরস্পর

আদান প্রদান (আন্তর্গণিক বিবাহ) প্রচলন বরপণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন দুস্থ কায়স্থ-পরিবারের প্রতিপালন এবং শিক্ষাবিস্তার বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচলন প্রভৃতি "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র অনুমোদিত আবশ্যকীয় প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সমবেত কায়স্থমণ্ডলী প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং অচিরকাল মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া যথারীতি ক্ষত্রিয়োচিত আচারাদি প্রতিপালন করিতে উৎসাহিত হন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রচারক মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদানন্তর তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন; এবং উপসংহার সময়ে জানাইলেন,—কায়স্থবতার শ্রীশ্রী৺শঙ্করদেব ও মাধব দেবের শিষ্যানুশিষ্য আসাম প্রদেশে মহাপুরুষীয় ধর্ম্মপ্রচারক কায়স্থ গোস্বামী অথবা সত্রের অধিকারীদিগের বংশ এবং ধারা মধ্যে এখনও অনেকের উপনয়ন গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে দেখা যায়; তিনি ও একজন উপবীতী। তবে যাঁহাদের উপনয়ন গ্রহণ করিবার প্রথা রহিত হইয়াছে, অতি সত্বর তাঁহাদের উপনয়ন গ্রহণ করা আবশ্যক। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে, আসামীয় অনুপবীত কায়স্থগণের সংস্কার অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। আসাম অঞ্চলে যে সমস্ত কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পশ্চিম দেশ হইতে এবং দক্ষিণ রাঢ় ও বারেন্দ্রভূম হইতে আগত। নানা কার্য্যাদি উপলক্ষে বহু পুরুষ যাবত তথায় বাস করা নিবন্ধন এখন উপনিবেশী।" সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষে শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া এবং গমঠা বংশীয় শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র বড়ুয়া ও মহাপুরুষ শঙ্করদেবের বংশীয় জনৈক বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন; তৎপরে মাননীয় রাজা বাহাদুর মহোদয়কে এবং শ্রীযুক্ত সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

আমরা গৌরীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর মহোদয়কে জাতীয় উন্নতি বিষয়ে এযাবত নিরব দেখিয়া আসামীয় কায়স্থ ভ্রাতাগণের

সংস্কার সম্বন্ধে নিতান্ত নিরাশ ছিলাম। এবার তাঁহার এই উৎসাহ জনক জাতীয় স্পৃহা অবগতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। রাজাবাহাদুরের নিকটে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—আশাকরি তিনি স্বজাতির উন্নতি জনক সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। কায়স্থ সভার মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র প্রচারের দ্বারা যাহাতে অতি সত্বর আসামের অনুপনীত কায়স্থ দিগের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে প্রবর্ত্তিত হয়, রাজাবাহাদুর সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া কায়স্থ সমাজে চির বরণ্যে এবং গৌরব ভাজন হইবেন।

কায়স্থোপনয়ন।

বিগত ২৭শে পৌষ মাদারিপুর জ্ঞানসাধনমঠে পরমহংস শ্রীমৎনারায়ণ তীর্থ-স্বামী মহোদয় ইদিলপুরের কুচইপট্টী নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসু এবং চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ গাভা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ দস্তিদার মহাশয়দ্বয়কে যথারীতি উপনয়ন সংস্কারান্তে সাবিত্রী দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ১০ই ফাল্গুন ইদিলপুর সমাজস্থ শিঙ্গারডাহা নিবাসী অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কালীকুমার গুহ মহাশয় তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার গুহ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার গুহ সহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং বেজনিসার নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র বশিষ্ঠ মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে আচার্য্য ও তন্ত্রধারকতাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এ জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম :—

বিগত বৈশাখ মাসে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরজীর একনিষ্ঠ ভক্ত, ইদিলপুর সমাজের অন্তর্গত মূলগাঁও নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বলরাম গুহ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহ মহাশয় তাঁহার

একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহ সহ উপনয়ন সংস্কারান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী অঞ্চলে সূর্য্যনগর ষ্টেসনের সন্নিকট নাওডুবি গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে এক কেন্দ্র করতঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবীণ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত ৬ জন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নাওডুবি, ত্রৈলোক্যনাথ কর ঐ, মহেশচন্দ্র দেব দয়ালনগর, অনাথবন্ধু বসু ঐ, সতীশচন্দ্র নন্দী মহাদেবপুর, সুরেন্দ্রনাথ গুহ বাগমারা।

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কলিকাতায় নিমতলা ৬৪নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে যশোহর জেলার ইতিনা নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের কাঠগোলায় একটী কেন্দ্র হয়; উক্ত কেন্দ্রে কোটালিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ইতিনা বাসী ১০ জন এবং খাসিয়ালের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ও ননীলাল ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি সর্ব্বসমেত দ্বাদশ জন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র সংস্কারান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে আষাঢ় রবিবার ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া জয়পুর, জয়রামপুর, নরগ্রাম, মধুরদীয়া প্রভৃতি গ্রামের নবতি বর্ষের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ হইতে একাদশ বর্ষের বালক পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৭৮ জন কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে।

এই কেন্দ্র সংস্থাপন জন্য খানখানাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয় যেপ্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অর্থব্যয়াদি করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য; এবং স্বজাতির প্রকৃত উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয় তাহার কথঞ্চিত উল্লেখ করা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গীক হইবে না।

অনেক দিবস যাবত জয়পুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের কায়স্থদিগের উপনয়ন জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাঁহারা নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করতঃ এযাবত অযথা সময় অতিবাহিত করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা বিশেষ

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ যে অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা আজকাল অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার ও ভাবে ভ্রান্তি ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইতঃস্তত করিয়া থাকেন। তাই আজ প্রায় স্থানেই মাঝে মাঝে এরূপ দেখা যায়। যাহউক জয়পুরবাসী কায়স্থগণের বহুবিধ আপত্তির মধ্যে উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অনুপস্থিতিই প্রধান আপত্তির কারণ ছিল। উক্ত ঘোষ মহাশয় দিনাজপুরাধিপতি মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে বাটীতে আসিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করা স্বত্বেও তিনি আসিতে পারেন নাই অথবা আসেন নাই। পরিশেষে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয় অনন্যো উপায় হইয়া উক্ত ঘোষ মহাশয়কে আনাইবার জন্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়কে মহারাজ বাহাদুরের নিকট দিনাজপুরে প্রেরণ করেন। প্রচারক মহাশয়ের প্রমুখাৎ বিস্তারিত অবস্থা অবগত হইবামাত্র কায়স্থ সমাজ সংস্কারে অগ্রণী স্বজাতির উজ্জল মুকুটমণি মহারাজ বাহাদুর উক্ত ঘোষ মহাশয়কে উপনয়ন গ্রহণের জন্য প্রচারক মাখন বাবুর সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই কেন্দ্রে যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কুলপুরোহিতগণই কেন্দ্রে যোগদান পূর্ব্বক পৌরহিত্যাদিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কেন্দ্র স্থলে বহু গণ্যমান্য কায়স্থ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে লক্ষীকোলের রাজ কুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায় বর্ম্মা বাহাদুর এবং খানখানাপুরের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহোদয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বিগত ১০ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৩৷৹ ঘটিকার সময় ধুবরীর ৺হরিসভাগৃহের বিস্তীর্ণ কক্ষে কায়স্থ সভার একটী অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:— শ্রীযুক্তশীতশপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্তউপেন্দ্রশরণ সান্যাল বি এল, শ্রীযুক্তউমেশচন্দ্র দেব (রেভিনিউসেরেস্তাদার এবং শ্রীশ্রী৺ শঙ্কর দেবের জীবন চরিত ও অন্যান পুস্তক লেখক)' শ্রীযুক্ত কেদারনাথ গুহ বি এল, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ভবানীকান্ত দাস বি এল, (গভর্ণমেন্ট

উকিল), শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পালিত (ট্রাফিক রেজিষ্টার) শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ (সেক্রেটারী ধুবরী লোন আফিস) শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ (নায়েব বগ্রিবাড়ীষ্টেট) শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব বড়ুয়া (তালুকদার), শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দেব (সিভিলকোর্টপেস্কার), শ্রীযুক্ত রামচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার সর্ব্ব সন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ হুগু উকিল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়কে সভার উদ্দেশ্য বিষয় বলিবার জন্য বলেন। প্রচারক মহাশয় প্রারম্ভে সুমধুর কণ্ঠে করুণাময় শ্রীহরির জগন্মঙ্গল স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি নানা পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, ইতিহাস, শিলালিপি এবং তাম্র শাসনাদির প্রমাণ্য শ্লোকদ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়া সকলকে উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। সভাস্থলে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কয়েকটী বিরুদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা মাখনবাবু তাহার সদুত্তর প্রদানিয়া সকলের সন্দেহ নিরাকরণ করেন। অতঃপর রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সভাপতি এবং প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ করা হয়।

নানা কথা।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

বিগত ২১শে ফাল্গুন বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে ৺গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺উমাসুন্দরী দেবীর আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্রঃ শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ বর্ম্মা এবং ললিতমোহন ঘোষ বর্ম্মা ও মনমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় ত্রয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। স্বজাতি এবং ৩০ জন ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হয় ।

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে ৺পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺সুরবালা দেবীর আদ্যকৃত তদীয় পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র রক্ষিত বর্ম্মা যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করেন।

বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কাটাজানি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বর্ম্মা নিয়োগী মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

নূতন র‍্যাঙ্গলার।

ময়মনসিংহ বারের উকীল শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দেব মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি-এ, পাশ করিয়া বিলাত গমন করেন। তিনি সিবল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও ঐ সার্ব্বিসে কাজ পান নাই। যুদ্ধফেরত অনেক লোককে কাজ দেওয়ায় প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা অতি অল্পলোক গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি ঐ সার্ব্বিসে ঢুকিতে পারেন নাই। কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপোস্ পরীক্ষা দিয়া তিনি র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন। যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, তিনি পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ঠিক কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাঁহার এই কৃতিত্বে ময়মনসিংহবাসী বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের গৌরব পরলোকগত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া র‍্যাঙ্গলার হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও কিরণবাবুর ন্যায় এত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ এরূপ সম্মানে এই ট্রাইপোস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন-নাই কিরণবাবু ভবিষ্যতে নিজকার্য্যদ্বারা ময়মনসিংহের নাম আরও উজ্জ্বল করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

লস্কর তাড়াইবার উদ্যোগ।

'ঈজিপ্ট" জাহাজ ডুবিবার কালে ঐ জাহাজের লস্কর অর্থাৎ ভারতীয় নাবিকগণ নিজ নিজ প্রাণরক্ষা করিবার জন্য গোলমাল করিয়াছিল, পিস্তল ও রিভলভার দেখাইয়া ইংরাজ নরনারীদিগকে সরাইয়া নিজেরা জলিবোটে উঠিয়াছিল ইত্যাদি নানা প্রকার কথা রটনা করিয়া দিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে যে লস্করদিগকে আর জাহাজে কাজ দেওয়া উচিত নহে। ঐ জাহাজের লস্করগণ বলিতেছে যে জাহাজ ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে তাহারা জলে পড়িয়া যায়. পরে ফরাসাদের সিন জাহাজ জলিবোট দিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া লয়। তাহারা যখন জাহাজে যাত্রা করে তখন অনুসন্ধান করিয়া

তাহাদের সঙ্গে যাহাতে একগাছি লাঠি পর্য্যন্ত না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। জাহাজে পিস্তল রিভলভার তাহাদের নিকট আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহারা বলিতেছে যে এই সকল দুর্ণাম সর্ব্বৈব মিথ্যা। যুদ্ধের সময় ভারতীয় লস্করগণের বিশেষ সুনাম কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। এখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, ইংলণ্ডে বহুলোক বেকার অবস্থায় ঘুরিতেছে। সুতরাং এখন লস্করগণ খারাপ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি। (চারুমিহির)

ফরিদপুরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

ভারত গৌরব সর্ব্বজ্ঞানী আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গত ২৯শে আষাঢ় মাদারীপুর হইতে ষ্টিমারে ফরিদপুর আগমন করেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল। ষ্টিমার ষ্টেসনে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র ফরিদপুর শিল্প-সমিতির সভ্যগণ এবং অন্যান্য বহুলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মথুরবাবুর সহিত তাঁহার বাটীতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বেলা ৬॥ ছয়টার সময় স্থানীয় টাউন থিয়েটার হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার মহিলা এবং পুরুষে প্রায় ২।৩ হাজার লোক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী খদ্দরবাণী শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিল। স্থানাভাব সত্ত্বেও বহুলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেই সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দাতিশর্য্যে করতালী প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। অতঃপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র "চরকা এবং তাহার প্রচলন" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, অত্রস্থ উকিল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমবেত জন সাধারণের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হইয়া। পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমে তিনি শিল্পসমবায়ে যান। তৎপর ৺মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করেন। বালিকাদিগের স্তোত্র পাঠে ও চরকা প্রস্তুত সূতা দেখিয়া তিনি সবিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন। তৎপর কুঠির শিল্পের (Home Industry) তাতের কারখানা দেখেন। বেলা প্রায় ১১টায় ফরিদপুর মূক-বধির বিদ্যালয়ের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দ্বিপ্রহরে ফরিদপুর হইতে রাজবাড়ী যাত্রা করেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়গোপাল সরকারবর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব পর্য্যায় । Reg. No. C. 653

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ] ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা]

শ্রাবণ ও ভাদ্র—১৩২৯ সাল ।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ ।

সহকারী-সম্পাদক ।

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা ।

ফরিদপুর ।

বার্ষিক মূল্য—২৲ । এই সংখ্যা—।৵০

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

নবপর্য্যায়] ওঁ ১৩২৯ সাল

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ খণ্ড। { শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস। } ৪র্থ ৫ম সংখ্যা

মা।

(শ্রীমদনমোহন বসু বর্ম্মা)

পঙ্কিল ঘোর সংসার আঁধারে,
তুমি ধর মোরে দীপ জ্বালায়ে,
পাপ পথ রত এই মনে তুমি,
পূত ভাব তোল জাগায়ে।
শোক-দুঃখে তুমি আমার শান্তি,
পরিতাপ-খেদে আমার ভ্রান্তি
অনাটনে তুমি কমলা রূপিনী
দাও সুখ তরী ভাসায়ে।
অভিমানে তুমি নয়নের বারি,
সন্তোষ, সুখে, আশা নিরাশার,
শূন্য হৃদয়ে পরমেশ তুমি
বিপদ সাগরে সুহৃদ আমার।

মোহে হেরি মোর জীবন পূর্ণ
হিসাবের দিনে সবই যে শূন্য
(মাগো) কিছু নাই মোর কেহ নাই, শুধু
সদা পাশে তুমি দাঁড়ায়ে।

মোক্ষের স্বরূপ।

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বি; এ)।

ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ। যে অন্তর্ভেদী অতৃপ্ত জ্ঞান লালসা যুগযুগান্ত ধরিয়া—"কিম্ কিম্"—রবে বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে বিশ্বাতীত রহস্যলোকের পানে ছুটিয়া গিয়াছিল, শুধু দুষ্ট কৌতুহল তাহাকে উদ্দীপিত করে নাই। ভারতে দার্শনিক চিন্তা শুধু উর্ব্বর মস্তিষ্কের অলস বিলাস নহে, উহা উদ্দেশ্যমূলক। অনিত্য সংসার দুঃখের আবাস ভূমি; দুঃখের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইতে হইলে এই সংসার—এই "গতাগতি পুনঃ পুনঃ" ইহার পরিসমাপ্তি চাই। কর্ম্মবিপাক সংসারবন্ধের হেতু; সুতরাং কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিতে হইবে। বাসনাই মানবকে কর্ম্মজালে জড়িত করে, সুতরাং রোধ কর এই বাসনা-সন্তান, তবেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে এবং দুঃখের নিবৃত্তিই—মোক্ষ।

এ হিসাবে চার্ব্বাক-দর্শন একটা উন্মার্গগামী Exotic মতবাদ বলিয়া মনে হয়। ভারতের চিন্তাধারার সহিত ইহার কোন সঙ্গতি নাই। ঐহিক সুখাস্বাদনকেই যে দর্শন জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গণ্য করে, এবং দেহকে ভস্মীভূত করিয়াই যে দর্শন জীবন নাট্যে সমাপ্তির যবনিকা টানিয়া দেয়, কৌপীনবন্ত যে দেশে "ভাগ্যবন্তঃ"—সেই অমৃতের পুত্রের দেশে সে দর্শনের উদ্ভব কেমন করিয়া সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিক রহস্যের বিষয়। আরও রহস্যের বিষয় এই যে চার্ব্বাক-দর্শন যে দার্শনিক গবেষণার শৈশব সময়ে অপরিণত চিন্তা-প্রসূত, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ভারতীয় দর্শনগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য

নির্ণয় এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া স্থির হইয়াছে। চার্ব্বাক-দর্শনেও সূক্ষ্মতর মতবাদের উল্লেখ আছে।

চার্ব্বাক মোক্ষ চাহেন না, দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন আত্মার বিলয়, তখন আত্মার মুক্তির জন্য কৃচ্ছ্র সাধন মূর্খতার কার্য্য। জীবনে দুঃখ আছে? থাক্ দুঃখময় জীবনে যতটুকু সুখভোগ সম্ভব, ততটুকুই লাভ। কাঁটা আছে বলিয়া মাছ খাইব না, এ কেমন কথা? সুতরাং যেমন করিয়া পার জীবনটাকে উপভোগ করিয়া লও। সম্ভোগই ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাঠি, ইন্দ্রিয়ের যাহাতে পরিতৃপ্তি হয়, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই মোক্ষ। চার্ব্বাকের ভোগসর্ব্বস্ব নীতিবাদ তাঁহার দেহাত্মবাদের অপরিহার্য্য ফল।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণ নিত্য স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে চঞ্চল ক্ষণিক জ্ঞানলহরী,—যে "রাত্রি দিন ধুক্ ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ" একটীর বুকে একটী লুটাইয়া আমাদের এই জীবন বাহিনী সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সমষ্টিই আত্মা। এই বিজ্ঞানধারার পরিসমাপ্তি হইলেই মোক্ষ। সে পরিসমাপ্তির পর কিছুই থাকে না। চেতনাবাহিনীর অতিরিক্ত কোন অনুবর্ত্তমান আত্মার অস্তিত্ব যখন নাই, তখন মোক্ষে আত্মার ও বিলয়,—চৈতন্যেরও বিলয়। আমি-হীন, চৈতন্য-হীন সে এক বিরাট 'কিছুই না',—ইহাই নির্ব্বাণ। দীপটা জ্বলিতেছিল—নিবিয়া গেল, তার পর আবার থাকিবে কি?

ন্যায়-বৈশেষিক মতে মোক্ষ আত্মার এক নিষ্পন্দ, নিষ্ক্রিয় স্থবির অবস্থা। বুদ্ধি, রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, প্রযত্ন ধর্ম্ম প্রভৃতি আত্মার গুণ। ইহারাই আত্মার সংসারাবস্থা বা জীবত্বের হেতু। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে এই বিশেষগুণাবলীর ধ্বংস হয়। আত্মা তখন সাংসারিত্ব বা জীবত্বের বৈচিত্র্য পরিমুক্ত হইয়া নির্গুণ নির্ব্বিকার পারমার্থিকতার শুদ্ধাতায় ডুবিয়া যায়। সুখ নাই, দুঃখ নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই. চৈতন্য নাই, সে মোক্ষ দশা যেন আত্মার শবত্ব প্রাপ্তি। বৈদান্তিকের মুক্ত আত্মা চিদ্ঘন আনন্দ স্বরূপ। নৈয়ায়িকের মুক্ত আত্মা চিদানন্দস্বরূপ ত নহেনই, চিন্ময় আনন্দময়ও নহেন, তিনি নিঃশেষ বিশেষ-গুণ-বর্জ্জিত। মোক্ষে দুঃখের অত্যন্তাভাব, কিন্তু দুঃখের অভাব হইলেই সুখের অস্তিত্ব বুঝায় না। মোক্ষাবস্থায় সুখের কল্পনা করিলে

সুখই মুখ্য কাম্য হইয়া পড়ে। কিন্তু মোক্ষ যে পরম পুরুষার্থ (Sumum bonum) সুখের সরণী ত নয়। মোক্ষ চাই মোক্ষেরই জন্য, সুখের জন্য নয়। আবার কামনা বা রাগ বন্ধের হেতু; সুতরাং সুখের কামনায় মোক্ষান্বেষী ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় মোক্ষ পশ্চাতে ফেলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় সংসার-গহনেই আসিয়া পড়ে।

জৈন-দার্শনিক মোক্ষের এই স্বরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বিপুল জড়ত্ব প্রাপ্তিই যদি মোক্ষ হয়, তবে কাজ নাই আমারসে মোক্ষে। তার চেয়ে আমার এ সুখ-দুঃখে বৈচিত্র্যময় জীবত্বই ভাল। চিন্ময় প্রাণময় (Spiritual) জীব আমি, জড়ত্ব আমার পরম পুরুষার্থ হইবে কেমন করিয়া? আবার কি সংসারাবস্থায়, কি মোক্ষাবস্থায় সুখই ইষ্ট, দুঃখ অনিষ্ট, দুঃখের অভাব যেমন ইষ্ট, সুখের অভাব তেমনিই অনিষ্ট; মোক্ষে যদি সুখের অভাব হয় তবে ত তাহা ইষ্ট হইতে পারে না আবার যে সুখস্পৃহাকে বন্ধের কারণ মনে করাও ভুল, পার্থিব বিষয়ের প্রতি পার্থিব সুখের প্রতি অনুরাগই জীবকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সংসারাতীত মোক্ষ-সুখ-স্পৃহা মোক্ষ সমাধিগত হইলে স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। অতএব জৈন মুমুক্ষু—জড়ত্ব চাহেন না; আত্মসংযম ও বিষয়-বৈরাগ্য হইতে যে সুখ, তাহাই পরম সুখ, তাহা দুঃখসম্পৃক্ত নহে।

প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতে জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-বিলোপই মুক্তি। ভোগায়তন দেহ, ভোগকরণ ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্যবিষয় এই ত্রিবিধ বন্ধনে পুরুষ জগৎ-প্রপঞ্চে আবদ্ধ। এই প্রপঞ্চ হইতে আত্মা যখন বিশ্লিষ্ট তখন হন, ইহার মোক্ষাবস্থা। বেদান্তের মোক্ষে মায়াপ্রপঞ্চ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু মীমাংসকের মতে জগৎ নিত্য; সুতরাং আত্মার মোক্ষেও জগতের বিলোপ ঘটে না। অতএব মোক্ষ শুধু "প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ-বিলয়"। আত্মা নিত্য সুখের আশ্রয়, বন্ধাবস্থায় সে সুখ প্রতিবন্ধক কারণ হেতু স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পায় না। মোক্ষে ঐ প্রতিযোগি কারণ সমূহ অপসৃত হইলে, আত্মার নিত্যসুখের অভিব্যক্তি ঘটে।

সাংখ্যমতে বন্ধ ঔপাধিক, স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক নহে। পুরুষের বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই; তিনি নিত্য, অপরিণামী নিষ্ক্রিয় উদাসীন চেতন সাক্ষী মাত্র চঞ্চল প্রকৃতির অনন্ত লীলা বৈচিত্র্যের বহু ঊর্দ্ধে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন নিঃসঙ্গ কূটস্থ পুরুষ। কিন্তু চঞ্চলা গতিশীলা অচেতন প্রকৃতির সহিত পুরুষের অভেদবুদ্ধিই ইহার বন্ধের হেতু। বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য্য; এই বুদ্ধিসঙ্গে পুরুষ

প্রতিবিম্বিত হইলে মলিন দর্পনে প্রতিফলিত মুখমণ্ডলের মালিন্যপ্রতীতির ন্যায়, বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি মলিনতাও পুরুষে প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধিক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পুরুষের এই সংযোগই বন্ধ। যখন জ্ঞান হইবে—আমি নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকার চেতন পুরুষ, প্রকৃতি চঞ্চলা পরিণামী ও অচেতন, সুতরাং পুরুষ প্রকৃতি বা প্রকৃতিকার্য্য বুদ্ধ্যাদি নহেন, তখন বুদ্ধিগত সুখ দুঃখ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি আর পুরুষে উপচরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি পুরুষের এই বিবেক-খ্যাতি বা ভেদজ্ঞান হইলেই মুক্তি, বিবেক-জ্ঞান সমুদিত হইলে প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান অপসৃত হয়। প্রকৃতি তখন পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। প্রকৃতি পুরুষের তুষ্টির জন্য বিচিত্র লীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যখন মোহভঙ্গে পুরুষের বিবেকজ্ঞানোজ্জল নেত্র তাঁহার উপর পতিত হইল, তখন তিনি বিলোললীলাভিনয় ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহার সমক্ষ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। পুরুষ তখন প্রকৃতির সঙ্গ বিরহ হেতু নিঃসঙ্গ উদাসীন অবিক্রিয় কেবল পুরুষ—"অসীম একেলা" Plotinus এর 'The Alone.' পুরুষের এই কৈবল্যই মোক্ষ। মোক্ষদশায় ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। কিন্তু ইহা শুধুই নিবৃত্তি, শুধুই অভাব, মোক্ষে দুঃখের সমুচ্ছেদ হয় বটে কিন্তু সুখের অপেক্ষা থাকে না, সুখ কারণ জন্য বলিয়া অনিত্য এবং বিনাশী।

বৈদান্তিক বলেন, মোক্ষলাভ স্বরূপতঃ অর্থশূন্য। যাহার মুক্তি হইবে সেই "আমি" ত নিত্যমুক্তভাববান। "আমি ছাড়া নিত্য পারমার্থিক সত্তা আর কিছুই নাই; আমার বাহিরে "তুমি" বলিয়া যদি কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবে তাহা অলীক; ব্যবহারিক হিসাবে সত্যমাত্র, আজ আছে ব্যবহার ফুরাইলে কাল থাকিবে না। সুতরাং আমার বাহিরে বস্তুতঃ যখন কিছুই নাই, তখন আমাকে আবার বাঁধিবে কে? বন্ধন যখন নাই, তখন মুক্তিও নাই। "বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। কিন্তু বন্ধন নাই বলিলে ত চলিবে না। এই যে সংসার চক্রনেমির সহিত কর্ম্মপাশে সংবদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নিষ্পিষ্ট হইতেছি এ কঠোর বন্ধনকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? বৈদান্তিক আশ্বাস দিয়া কহিলেন—জীব! তুমি যে জননমরণাত্মক সংসার দেখিতেছ এ যে "ভুলে ভুলে দেখা"। সংসার আবার কি? তুমিই বা কে? সংসার একটা মস্ত ভুল, তুমি—তোমার জীবত্বও একটা ভুল। ভুলিয়া যাও তোমার জীবত্ব,

শোন তোমার পরমাত্মার বাণী :—

"দৃশিস্বরূপং গগনোপমংপরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্।
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তঃ॥"

এইত তোমার স্বরূপ বিরাট, নিত্যমুক্তবুদ্ধস্বভাব তোমার বন্ধন ত কল্পিত।

কি এক অপরূপ মোহের বশে এই নির্লিপ্ত নির্গুণ পরমাত্মা আপনাকে বদ্ধ সংসারী জীব বলিয়া মনে করেন। ঘনচ্ছন্নদৃষ্টি মূঢ়ব্যক্তি যেমন সবিতাকেই ঘনাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ দেখে, মোহাচ্ছন্ন জীবও সেইরূপ স্বীয় জননমরণাদি ধর্ম্ম পরমাত্মায় আরোপ করে। পরমাত্মায় এই জীবত্বের অধ্যাসই বন্ধ। অধ্যাস সত্যজ্ঞান নহে, যাহা যা নয় তাহাতে উহা আরোপই অধ্যাস: "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সত্যজ্ঞান নহে, যথার্থজ্ঞানের উদয় হইলে মোহ কাটিয়া যায়, অধ্যাস নিবৃত্ত হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে আত্মার অজ্ঞান বা মোহ যখন অপসারিত হয়, তখন সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় সেই মোহবিজৃম্ভিত জগতের "ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি" এবং জগৎ-প্রপঞ্চ বিলয়ের সঙ্গে আত্মা চিদানন্দ স্বরূপ আপনাকে ফিরিয়া পান। আত্মার এই স্বরূপোপলব্ধিই মোক্ষ, "আনন্দাত্মক ব্রহ্মাবাপ্তিশ্চ মোক্ষ:"। মোক্ষে অনধিগত কোন কিছুর প্রাপ্তি ঘটে না। উহা নিত্যসিদ্ধ। কণ্ঠমণি আমার কণ্ঠেই রহিয়াছে, অথচ বিস্মৃতি বশতঃ এখানে ওখানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। পরে কেহ দেখাইয়া দিলে আমি যেমন প্রাপ্ত কণ্ঠমণিকে পুনঃপ্রাপ্ত বলিয়াই মনে করি, সেইরূপ আমি মোহবশে ভুলিয়া ছিলাম যে আমি নিত্যমুক্ত, নিত্য আনন্দ স্বরূপ; পরে যখন মোহ কাটিয়া গেল তখন সেই নিত্যসিদ্ধ আনন্দাত্মক মোক্ষকে যেন পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম। ইহাই বেদান্তের মোক্ষ। ইহা শুধু দুঃখের নিবৃত্তি নহে। শাশ্বত নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি। বেদান্তের সর্ব্বত্যাগী ঋষি এই পরমানন্দে বিভোর হইয়া সংসার জ্বালাজর্জ্জরিত জীবকে সে অমৃত সাগরের পথ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার কর্ণকুহরে বৈরাগ্যের মন্ত্র দীক্ষা দিতেছেন,—

"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥"

———

প্রায়শ্চিত্ত।

(শ্রীশ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী)

বেলা প্রায় একটা বাজিয়াছে। মিত্র মহাশয় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। মিত্র গৃহিণী মনোরমা স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া দালানের রোয়াকে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা সম্পন্ন করিতেছেন, এমন সময় "বড়মা" 'বড়মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দশম বর্ষীয়া একটী বালিকা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। মেয়েটীর নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মী পদ্মালয়া পদ্মার মতই অনিন্দ্য সুন্দরী, তপ্তকাঞ্চন বর্ণা। চেহারায় এমন একটু মাধুর্য্য ঢল ঢল করিতেছে যে দেখিলেই ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। সে প্রতিবেশী জমিদার গোবিন্দ দত্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা; তাহার সমস্ত ভালবাসার, আদরের, কথোপকথনের ও খেলার একমাত্র সামগ্রী।

লক্ষ্মী প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মিত্র-নন্দন নারায়ণকে মাতৃ সন্নিধানে উপবিষ্ট দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "বাঃ! নারাণ দা আজ স্কুলে যাওনি?" নারায়ণও হাসিতে হাসিতে বলিল 'আজ যে আমাদের বন্ধ।' 'কেন' বলিয়াই বালিকা রোয়াকে উঠিয়া তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিল। 'কাল যে ইন্‌স্‌পেকটর বাবু আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে এসেছিলেন, তিনি আমাদের স্কুল দুই দিন বন্ধ দিয়া গিয়াছেন। আচ্ছা' দাদা, ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু তোমাকে কি বলে গেলেন? পুত্র গৌরবে গরবিনী মিত্র গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মা আজ বড় একটী সুখবর আছে। কাল ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু নারাণের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ও তাহার আর্থিক অবস্থার কথা শুনিয়া তাহার পোষাক পরিচ্ছদ খরিদ করিবার জন্য দশ টাকা দিয়া গিয়াছেন; প্রতি মাসে চারি টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।' শুনিতে শুনিতে বালিকার মুখখানি আনন্দে তড়িতালোক ভাসিত প্রফুল্ল সরোজের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে প্রফুল্ল হৃদয়ে বলিল 'আমি জানি, আমার নারাণদাকে যে দেখিবে সেই ভাল বাসিবে। এমন প্রতিভা দীপ্ত সুপ্রশান্ত ললাট ও আকর্ণ প্রসারিত স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল এমন দুটী নীল-নয়ন, বল দেখি বড় মা আর কাহার আছে?'

এই কথা বলিয়াই বালিকা কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া 'বলিল কিন্তু বড় মা, আজ তোমাদের সঙ্গে আমার আড়ি। আমি আর তোমাদের বাড়ী আসিব না' ন রায়ণ বলিল 'কেন বল দেখি!' 'এমন সুসংবাদ আমাকে বুঝি জানাতে নাই' কাল যে স্কুল হ'তে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। আজ সকালে তুমি পড়তে থাকিলেই বলব মনে করেছিলেম। কিন্তু তুমি তো আর আসলে না, আমার যে কত কাজ ছিল! তুমিও তো ডাক্ দিলে পার্ত্তে। "তুমি রোজ পড়তে আস সেই জন্যই তো নিশ্চিন্ত ছিলাম। তোমাকে বলবার জন্য আমার কত ঔৎসুক্য তা বুঝি তুমি জাননা! আচ্ছা না আসলে, বেশ!" মিত্র গৃহিণী উভয়ের বাগ্বিতণ্ডায় বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। সহসা বলিলেন "মা তোর দাদার সাজ পোষাক দেখ্‌বিনে?" "কই" বলিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল ও মনোরমার নির্দ্দেশ মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কাগজের একটী মোড়ক আনিয়া সমস্ত খুলিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল বা ভারি সুন্দর পোষাক হয়েছে তো? দাদা বুঝি এখনও পর নাই! এস এখন সব পর দেখি। নারায়ণ হাসিতে হাসিতে ধুতি সার্ট কোট ও জুতা পরিধান করিল। লক্ষ্মী বলিল বেশ মানিয়েছে এস দাদা পড়ার ঘরে চল, আজ নূতন সাজে আমাকে পড়াবে এস বলিয়া নারায়ণকে এক রকম টানিয়াই পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। মিত্র গৃহিণী নিমীলিত নয়নে অভীষ্ট দেবতার পদে এক অভিনব প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

লক্ষ্মী নারায়ণকে ও নারায়ণ লক্ষ্মীকে কতখানি ভালবাসিত, তাহা উভয়ে কেহই জানিত না। শশাঙ্ক আগমনে সমুদ্রবক্ষ যেমন আপনিই স্বগৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ইহাদের একের হৃদয়ও অন্যকে দেখিলে সেইরূপ গৌরবে নাচিয়া উঠিত। নারায়ণ যত্ন পূর্ব্বক লক্ষ্মীকে পড়াইত, কত গল্প শুনাইত ও একত্রে খেলা করিত। লক্ষ্মী পুস্তক খুলিয়া বসিবা মাত্র নারায়ণ সযত্নে সরল ভাষায় সমস্ত পাঠ বুঝাইয়া দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল 'বল দেখি কি বুঝলে?' 'কিসের কি বুঝব' কেন এই যে প্রশ্নটী কই আমি তো এ প্রশ্নের কিছুই জানি না! আমি যে এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম? "কই আমি তো কিছুই শুনি নাই!" তবে এতক্ষণ কি কল্লে "দাদা তোমার পোষাকটী ভারি সুন্দর হ'য়েছে, তোমাকেও বেশ মানিয়েছে। তোমার এই উজ্জল গৌরবর্ণ, তাহার উপর এই কাল কোটটী! আহা কি

চমৎকার হয়েছে। 'যাও তুমি ভারি দুষ্ট হয়েছ।'—'না দাদা রাগ করোনা; আজ আনন্দের দিন কি পড়াশুনা ভাল লাগে? চল বড়মার কাছে যাই। লক্ষ্মী দাদাটী! রাগ যেন ক'রো না!" এই বলিয়া দাদার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে টানিয়াই লইয়া চলিল।

(২)

গোবিন্দ দত্তের প্রপিতামহ রামচন্দ্র মিত্রের প্রপিতামহকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া এই গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও যথেষ্ট জমী-জমাও করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র মিত্রের পিতার অনবধানতায় তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। রামচন্দ্র মিত্র এখন নিকটবর্ত্তী বন্দরে এক মহাজনের ঘরে যৎকিঞ্চিৎ অর্জ্জন করিয়া অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। তাহার পুত্র নারায়ণ প্রতিভাশালী ছেলে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে রামচন্দ্র কোন মতেই তাহার পড়ার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। সে দিন ইন্‌স্পেক্টর বাবু নারায়ণের প্রশ্নোত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হীনাবস্থা দর্শনে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি বালকের পিতার অবস্থার কথা বালকের মুখে অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পরিচ্ছদের জন্য ১০৲ দশ টাকা দান করিলেন ও তাহার পড়ার খরচের জন্য প্রতি মাসে চারি টাকা করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গেলেন। গোবিন্দ দত্তের অর্থের কোনই অভাব ছিল না। শুনা যায় প্রথম যৌবনে প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়া তিনি কিছু উশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তোষামোদকারী বন্ধু দলেরও অভাব ছিল না, তাহাদের উত্তেজনায় মদ্যপান আরম্ভ করিয়া ছিলেন। এমন কি চরিত্র গৌরব পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ছিলেন। কিন্তু দত্ত গৃহিণী বড়ই পতিব্রতা ও সুশীলা ঃ তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দত্তমহাশয়ের চরিত্র সংশোধিত হইতে থাকে। এমন সময় লক্ষ্মী জন্ম গ্রহণ করিল। পতিব্রতা পত্নী ও লক্ষ্মী স্বরূপিনী কন্যা লাভ করিয়া দত্ত মহাশয় সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়াছেন কিন্তু শুধু তাহার গর্ব্বিত অভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সম্পর্কিত হইলেও হীনাবস্থার জন্য দত্ত মহাশয় মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে বড় মেশামিশি করিতেন না; এমন কি মিত্র বাড়ীর সীমানায়ও পদার্পণ করিতেন না; মিত্র মহাশয়ও দত্ত বাড়ী প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেন না। তবে দত্ত গৃহিণী প্রায়ই মিত্র

বাড়ী আসিতেন ও মিত্র গৃহিণীকে 'বড় দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লক্ষ্মী প্রতিদিন অনেক ব'রই মিত্র বাড়ী আসিত, বড়মার সঙ্গে কত পরামর্শ করিত, কত বিষয় মীমাংসা করিয়া লইত ও প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময় নারায়ণের নিকট লেখাপড়া শিখিত। নারায়ণ মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলেও তাহার আসা যাওয়া বৃদ্ধি বই হ্রাস হইল না।

(৩)

'বড়মা!' 'কেন মা!' 'কিছুতেই হয় না?' "না মা কিছুতেই হয় না" খুব ভাল ছেলে হলেও হয় না? 'নামা হয় না।' "কেন হয়না বড়মা"? "সে বড়লোকের খেয়াল আমি কি জানি মা।" "আচ্ছা নারানদার মত সুবোধ সুশ্রী ছেলের সঙ্গেও হয় না?" 'বড়লোক দরিদ্রের ঘরে তাহার মেয়েটীকে কষ্ট কর্ত্তে কেন দেবে মা।' "আচ্ছা কয়েক দিন পর নারাণদাও তো বড় লোক হবে!" "এখন তো হয় নাই" "বড়লোকের ছেলে যদি দুঃশীল ও দুশ্চরিত্র হয়?" "তাতে তাহাদের বিবাহের বাঁধা হয় না মা?" লক্ষ্মীর মুখ খানা ক্রমশই বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে বলিল "ভাবিয়াছিলাম নারাণদার খুব বড়ঘরে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হবে।'—সে আর কোন কথা বার্ত্তা না বলিয় নারাণদার চিঠি আসিয়াছে কি না, সে কেমন আছে ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া চিন্তিত মনে বাড়ী চলিয়া গেল।

দত্ত মহাশয়ের বাড়ী লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহদ্বয়ের দৈনিক পূজা যত্নের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। লক্ষ্মী কত ভক্তি সহকারে পুষ্প দুর্ব্বাদি আহরণ করিয়া থাকে। পূজার ঘর পরিষ্কার রাখা ও পূজার বাসনাদি মার্জ্জনের ভার লক্ষ্মী নিজেই গ্রহণ করিয়াছে। পুরোহিত পূজান্তে প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে উপবেশন করিয়া নিমীলিত নয়নে কত প্রার্থনা করিয়া থাকে। আজ মিত্র বাড়ী হইতে আসিয়া লক্ষ্মী পূজা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং অভীষ্ট দেবতাদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর বচনে বলিতে লাগিল 'লক্ষ্মী" মা! আমার মনোবাসনা কি পূর্ণ হবে না? নারায়ণ তোমার স্বামী, তবে নারায়ণ আমার স্বামী হইবে না কেন মা? লক্ষ্মী নারায়ণ! আহা কি সুন্দর নাম! আমার পক্ষে কি এ নাম সার্থক হবে না?' লক্ষ্মীর মনে যেন ক্রমেই নূতন আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া দেবতার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইল।

দত্ত মহাশয় আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া এক খানা বই পড়িতেছিলেন, এমন সময় দত্ত গৃহিণী সেখানে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'তুমি যে কেমন নিশ্চিন্ত পুরুষ তাহাই ভাবিয়া কূল পাচ্ছি না। পুরুষ মানুষ কিনা?' 'অপরাধ' 'অপরাধ আবার কি?' 'তুমি মেয়ের বিবাহ দিবে না?' 'ও সেই কথা!' "আচ্ছা মেয়ের বিয়ে বলিয়া তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?" 'ভালই তো', মায়ের ব্যথা হবে কেন। ব্যথা হবে তোমার! আমার একটা কথা রাখবে?' "রাখার হলে অবশ্যই রাখব" "তুমি নারাণকে অবশ্য দেখেছ" "কোন্ নারাণ?" "মিত্র বাড়ীর" "তাহার কি হয়েছে?' "আচ্ছা মানুষ কিন্তু তুমি! এ পাড়ায় সুধু সেই এক ছেলে, দেখ্‌তে শুন্‌তে লেখা পড়ায় সকলেই তার প্রশংসা করে, অথচ তুমি তাহাকে দেখও নাই। আমি বলি কি"—"ওগো থাম থাম, আমি তোমার বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝেছি, আর বলতে হবে না। রাম মিত্রের ঘরে আমার লক্ষ্মী" দালানের প্রাচীর গাত্রে ২।৩ টী টিক্ টিকি যুগপদ টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল, ও হঠাৎ লক্ষ্মী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দত্ত মহাশয় কন্যাকে দেখিয়াই বলিলেন "এই যে মা'! এস, এতক্ষণে বুঝি ছেলেকে মনে পড়েছে!" বল দেখি তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" "বড় মার কাছে একবার গিয়েছিলাম বাবা "হারে তোর বড়মা কি তোরে খুব ভাল বাসেন?" বড়মা যে আমাকে কত ভালবাসেন তা কেমন ক'রে জানাব বাবা! বোধ হয় নারাণ দাদাকেও এত ভাল বাসেন না।" "দূর পাগলি, তাও কি হয়! আচ্ছা তোর নারাণ দা এখন কি করে?" "বা! সে যে এখন কলকাতায় পড়ছে; তাও জান না? বাবা নারাণদা বড়ই ভাল ছেলে, যেমন দেখতে শুন্‌তে তেমনি লেখা পড়ায় সে মাইনর ও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। এখন এলে পড়ছে। এলেতেও বৃত্তি পাবে। কেমন নয় বাবা? খুব ভাল ছেলে!" নারাণের প্রশংসা করিতে করিতে বালিকার হৃদয় যেন আনন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিল। সমস্ত মুখ মণ্ডলে একটা স্বর্গীয় রক্তিম আভা মুহূর্ত্তে বিকাশ ও মুহূর্ত্তে লয় পাইতে লাগিল। দত্ত মহাশয় স্থির দৃষ্টিতে বালিকার মুখ পানে তাকাইয়া তাহার আবেগ ভরা বক্তৃতা স্রোত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং বালিকার মুখ মণ্ডলের সজীবতা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী যেন একটু লজ্জিত

হইল। "বাবা বুঝি এখনও পান তামাক খাননি, এই আমি আনছি" এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিল। দত্ত গৃহিণী দত্ত মহাশয়ের মুখ পানে তাকাইয়া তাহার গম্ভীর ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দত্ত মহাশয় কোন কথা বলিলেন না. নীরবে এক দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে বালিকা পান, তামাক সাজিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ও পিতার হস্তে আলবোলার নলটী অর্পন করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল। পিতাকে নিবিষ্ট মনে তামাক সেবন করিতে দেখিয়া বালিকা ধীর মধুর আব্দারের স্বরে বলিল "বাবা" "কেন মা" "আমার একটী কথা রাখবে বাবা?" "তোমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ থাকে মা? বল দেখি এখন তোমার কথাটী কি?" "আগামী বৃহস্পতি বার লক্ষ্মীনারায়ণের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, মা বলিলেন দেব পূজায় আবার বাধা কি মা? "গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে লক্ষ্মী নারায়ণের প্রসাদ দিতে হবে!" দত্ত মহাশয় বলিলেন "তাতো বেশ হবে, কিন্তু রান্না করবে কে? তুমি ও তোমার জননী। তবেই হয়েছে।" কেন মা বুঝি একা রান্না কর্ত্তে পার্ব্বেন না? না হয়, বড়মা রাঁধবেন।" 'তিনি কি এত কষ্ট কর্ত্তে স্বীকৃত হবেন? দত্ত গৃহিনী বলিলেন "দিদিকে তুমি জাননা, তাই একথা বলছ। দিদি সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকৃত হবেন, বিশেষতঃ ইহা লক্ষ্মীর উৎসব!" দত্ত মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী প্রফুল্ল মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

(৪)

আজ লক্ষ্মীর লক্ষ্মীগোবিন্দের অভিষেক উৎসব। লক্ষ্মীগোবিন্দের মন্দির আজ বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া কতই শোভা বিস্তার করিতেছে, লক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহদ্বয় নব বসন ভূষণে ভুবন মোহন রূপ ধারণ করিয়াছেন। বিবিধ নৈবিদ্যাদি উপচার শোভিত পুষ্প চন্দন ধূপ ধুনা গন্ধামোদিত মন্দির খানির প্রতি তাকাইলেই হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। পবিত্র বসন পরিহিত সৌম্যমূর্ত্তি পুরোহিত বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে উপবেশন করিয়া বিগ্রহদ্বয়ের পূজা সম্পন্ন করিতেছেন। লক্ষ্মী আনন্দোজ্জ্বল মুখে পবিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া যুক্তকরে বিগ্রহদ্বয়ের মুখ পানে দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিয়া ভক্তি গদ গদ চিত্তে মন্দিরের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পাড়ার বালক বালিকাগণ আনন্দ-কোলাহলে বাড়ী খানা মুখরিত করিতেছে। প্রতিবেশিনী রমণীগণ মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। মিত্র গৃহিণী কতই উৎসাহে

দুই তিন জন প্রতি বেশিনী মহিলার সহিত রন্ধন কার্য সম্পন্ন করিতেছেন। দত্ত মহাশয় ও মনের উল্লাসে সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তিনি কখনও বা পূজা মন্দিরের সম্মুখে, কখনও বা বৈঠকখানা গৃহে, কখনও বা বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিতেছেন, ও কার্য্যোপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এরূপ কার্য্যোপলক্ষে তিনি একবার অকস্মাৎ রন্ধন গৃহের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি এপর্য্যন্ত কখনও মিত্র গৃহিণীকে দেখেন নাই। আজ হঠাৎ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, ও অনতিবিলম্বে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি কিসের জন্য সে স্থানে গিয়াছিলেন সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। সারাদিন উন্মনস্ক ভাবে কোনরূপে উপস্থিত নিমন্ত্রিতগণের আদর অভ্যর্থনা করিয়া লক্ষ্মীর উৎসব সম্পন্ন করিলেন। রজনী যোগে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। প্রাতে আবশ্যকীয় বাহ্য-কর্ম্ম সত্বর সম্পন্ন করিয়া একাকী বৈঠকখানা ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন।

এতরূপ! এত সৌন্দর্য্য যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা সে দিন মূর্ত্তিমতী হয়ে আমার রান্নাঘরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জলদ জালাবৃত গগণ মণ্ডল যেমন তাড়িতালোকে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, ধূম সমাচ্ছন্ন গৃহখানিও যেন তাহার রূপ প্রভায় সেইরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ঘর্ম্মাক্ত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বদন মণ্ডলে অগ্নিশিখা প্রতিফলিত হইয়া শিশির সিক্ত সৌরকর ভাসিত প্রফুল্ল কমলের মত দেখাইতেছিল, আহা! কি দেখিলাম! কে বলে রামমিত্র ঐশ্বর্য্যহীন! এই রূপৈশ্বর্য্য যাহার ঘর প্রতি নিয়ত উজ্জ্বল করিয়া রাখে তাহার আবার দৈন্য? গোবিন্দ দত্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

* * * * * *

মিত্র গৃহিণী আহারান্তে রোয়াকে উপবেশন করিয়া তাম্বূল সেবন করিতেছিলেন। মিত্র মহাশয় কার্য্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন—শূন্য বাড়ীটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মিত্র গৃহিণী তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে শূন্য দৃষ্টিতে এক দিকে তাকাইয়া আছেন এমন সময় পদধ্বনি শ্রবণে চাহিয়া দেখিলেন দত্ত মহাশয় ধীরে ধীরে অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছেন। মিত্র গৃহিণী বিস্ময় স্তম্ভিত ও কিং

কর্ত্তব্য বিহীনা হইয়া পড়িলেন তিনি শীঘ্র হস্তে রোয়াকে একখানা আসন পাতিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। দত্ত মহাশয় রোয়াকের পার্শ্বে যাইতেই 'বড়মা" 'বড়মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লক্ষ্মী প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনায় দত্ত মহাশয় হতবুদ্ধিবৎ হইয়া পড়িলেন। 'ঘোর প্রায়শ্চিত্ত" এই কথাটী অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে অস্পষ্ট উচ্চারিত হইল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বকর্ত্তব্য স্থির করিয়া এই বিশ্রী ঘটনাটিকে সুশ্রী করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। তিনি বলিলেন 'হারে লক্ষ্মী! সে দিন তোর বড়মা যে এত পেটে অন্নপূর্ণার মত তোর যজ্ঞ উদ্ধার করে এলেন, তাঁকে কি আর একদিন ডাকতে হয় না? বউদি সেদিন তুমি আমার বাড়ী পায়ের ধূলী দিয়ে আমায় মর্য্যাদা বড়ই বাড়িয়েছ। ঘটনা বশতঃ আমাদের দুই বাড়ীর ঘনিষ্টতা বিছিন্ন হতেছিল, আমি সেই জন্যই কয়েকটী কথার উদ্দেশ্যে তোমাদের বাড়ী এসেছি। দাদা যে এসময় বাড়ী থাকেন না, আমি জান্তেম না। এখন দেখছি, একেবারে বোবার বাক্যে এসে পড়েছি। ভাগ্যে ভগবান লক্ষ্মীকে এসময় এখানে পাঠিয়াছেন। নারায়ণও কি বাড়ী নাই!' লক্ষ্মী বলিল "ঐত নারাণ দা আসছে। আমি দূর হ'তে দেখেই বড়মাকে খবর দিতে এসেছি।" এই বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বড়মা লক্ষ্মীকে একেবারে কোলে তুলিয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইল ও দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। সে দূর হইতে দত্ত মহাশয়কে অনেক বারই দেখিয়াছে কিন্তু তাহাকে বাড়ী আসিতে এক দিনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ হইল না। সে তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে তাহাকে প্রণাম করিল। দত্ত মহাশয়ও সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল "এস বাবা ভাল ত" এই বলিয়া তাহার মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ও তাহার মুখপানে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যেন এরূপ সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বদন মণ্ডল আর কখনও দেখেন নাই। তিনি নারায়ণকে মাতৃ সকাশে যাইতে অনুমতি দিয়া মিত্র গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বউদি! আজ হতে তোমার লক্ষ্মী তোমারই থাকিল; এত স্নেহ ভাল বাসা লক্ষ্মী সংসারে আর কোথাও পাইতে পারে না। দাদা আসিলে, আজই আনাকে খবর দিও, নতুবা তিনিই যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার বাড়ী পদার্পন করেন। এখন তবে

আসি" এই বলিয়া দত্ত মহাশয় চলিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মীকে মাতৃ ক্রোড়ে দেখিবামাত্র নারায়নের উজ্জ্বল মুখখানা আনন্দে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচে আজ আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। লক্ষ্মীও নারায়ণকে দেখিয়া সলজ্জ আনন্দপূর্ণ নয়ন দুটীর দৃষ্টি মৃত্তিকা পানে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। মিত্র গৃহিণী লক্ষ্মীকে কোলে করিয়াই রোয়াকে প্রত্যাগমন করিলেন, ও সেখানে উপবেশন করিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বনে তাহাকে বিব্রত করিয়া বলিলেন "ষাট লক্ষ্মী! আমার মা আমার হবে নাতো কার হবে?" এমন সময় লক্ষ্মার মা সেখানে আসিয়া লক্ষ্মীকে মিত্র গৃহিণীর ক্রোড়ে লজ্জা নম্রবদনে উপবিষ্ট দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বা! একেবারে বউ বরণ সেরেছ বড়দি! আমাদের অপেক্ষাও কল্লে না?" মিত্র গৃহিণী সাদরে বলিলেন "এস দিদি, আজ দত্ত মহাশয় আমাকে লক্ষ্মী দান করেছেন" "তবে তুমিও আমাকে নারায়ণ দান কর" এই বলিয়া দত্ত গৃহিণী গৃহ হইতে সলজ্জ নারায়ণকে ধৃত করিয়া আনিলেন ও তাহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

সাহিত্য সাধনা *

(শ্রীসত্যবিগ্রহ মুখোপাধ্যায়, এম, এ

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ব বাসনা,
গুণানুবন্ধি প্রতিভান মদ্ভুতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কম্পানুগ্রহম্।

আজ বাহির আমাকে ডাক দিয়াছে। তাহার পরিপূর্ণকোষাগারে স্থান পাইবার মত বস্তু আমার অন্তরের কোথায় যে সঞ্চিত আছে, বাহিরই তাহা জানে। তবে বাহিরের মত জবরদস্তি করিয়া ডাক দিতে, আপনার আদেশের পঞ্চশরমুখ

---

* ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

ঘোষণা জ্ঞান রাজ্যের অজ্ঞাত পল্লীর অধিবাসীকে শুনাইয়া দিতে এমন অপ্রতিহতশক্তি নাকি কাহারও নাই, তাই আমার শিশু অন্তরকে আজ অর্থহীন কলভাষ শুনাইতেই হইবে। তবে বাহির! তোমাকে প্রণাম করিয়া আমি আমার চিন্তার গন্ধহীন কুসুম সম্ভারে অপটু হস্তে মালা গাঁথিয়া তোমারই কণ্ঠে পরাইয়া দিই।

জীবনের সম্মুখের রাজপথে সুন্দরের অভিযান সাধ মিটাইয়া দেখিবার মত চোখ, বায়ুর চির-পুরাণ চির-নব বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত শুনিবার মত কান আমি পাই নাই, তবু ত আমার চিত্তের আঙিনায় তাঁহার চরণের অলক্তকরাগ কম করিয়া লাগে নাই। বর্ষার নিশীথে তাঁহার অভিসার আমার কুঞ্জেও ত প্রতিদিনই চলিয়াছে। আমারই চোখের উপর দিয়া ত কত তমাল বনভূমির বিরাট অন্ধকার রূপ ভাসিয়া যায়। অন্তরের প্রদীপ জ্বালিয়া সেই অন্ধকারকে বরণ করিবার কত শুভ অবসর বহিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের নীপমূলে কত বংশীর মধুরাগ ত আসিয়া লাগিয়াছে, আমার দীনতা রাজরাজেশ্বরের সম্পদের তপ্তস্পর্শে রূপে শোভায় অমর হইবার শুভ অবসর লাভ করিয়াছি; কাজেই ভরসা হয় সুন্দরের কথা বলিবার অধিকার হয়ত আমারও থাকিতে পারে।

আমি আজ সাহিত্যের কথা বলিব। সাহিত্য সেই সুন্দরের পূজারী, যিনি তরুলতার কোমল পত্রে শ্যামলতার ঢেউ খেলাইয়াছেন। যিনি আকাশের নীলাম্বরীতে তারকা খচিত করিয়া ধরণীর প্রসাধন করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণের মলয়ে যিনি আমাদের বসন্তোৎসবে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠাইয়া দেন বর্ষায় যাঁহার করুণা সলিল সলিল-রূপে গলিয়া পড়ে। সাহিত্য চিরদিন সাধ করিয়াছে, স্বপ্ন দেখিয়াছে, কল্পনা করিয়াছে, সেও অনন্তসুন্দরের গলায় একখানি ফুলমালা পরাইয়া দিতে। সাহিত্যের তরুণ আঁখি চির সজাগ হইয়া একটি দিনের অপেক্ষা করিয়া আছে, যে দিন তাহার বুকে পরম সুন্দর আসিয়া চন্দন রাগের গৌরব নিজের হাত দিয়া যাইবেন। তাঁহার রূপকে সাহিত্য তর্কের অর্গলে রুদ্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করে নাই। সে কেবল কল্পনার কুঞ্জবনে সেফালিকা চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়াছে, মানস বিহঙ্গমের সঙ্গীতকে রূপ দিয়াছে, হৃদয়ের বিচিত্র কামনার নব নব সিংহাসনে বসাইয়া, 'আপন মনের মাধুরী দিয়া

তাঁহার নিত্য নব মূর্ত্তি গড়িয়া, পূজা করিয়াছে ভাল বাসিয়াছে, হাসাইয়াছে কাঁদাইয়াছে, মানভিক্ষা করিয়াছে, এমনি কত কি! তাহার সাধের বিচিত্র রূপ দেখিয়া জ্ঞানী বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়াছে। বিজ্ঞানী শিশুসুলভ চপলতা বলিয়া উপহাস করিয়াছে, ঐতিহাসিক তাহার ভিতর শিলালিপির মত সত্য ভাষিতা না দেখিয়া অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের চিত্ত আকাশে তাহাতে অবসাদের মেঘ দেখা দেয় নাই। সে আপনার উপাস্য দেবতাকে লইয়া—

"শ্যামবন্ধু লাগি কলঙ্কিনী হঞা

অমিয় ছানিয়া খায়।"

তাহার দেবতা প্রাণময় গতিশীল; সাহিত্য তাহাকে একরূপে বিদায় দেয় আর রূপে ফিরাইয়া আনে, যাঁহাকে হিয়ার উপরে রাখিয়া সাধ মিটেনা পাটের জাদ করিয়া কেসের মধ্যে লইয়া অন্যের অলক্ষ্যে উপভোগ করিয়াও পরিতৃপ্তি হয় না; তাঁহাকে পাইবার মত করিয়া পাইতে, শিখিয়াছে কেবল সাহিত্য। বিরহের ভিতর দিয়া যখন প্রিয়তমের আগমনীর বাঁশী বাজিয়া উঠে, তখন সেই সাহানার ভিতর দিয়া হৃদয়ের যে আনন্দ ধ্বনিত হয় সাহিত্য তাহাই ভোগ করিতে চায়। তিনি তাহার কাছে ধরা দিয়াছেন মূর্ত্তি রসরূপে, গতিভঙ্গিমায় অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় নটবর রূপে। সাহিত্য যখন তপ্ত আঁখিজল ফেলিয়া শক্তি-হীন সামর্থ্য দিয়া বিদায়কালে প্রিয়জনের গমন বাধা জন্মাইয়া দেয়, যখন সে তর্ক না করিয়া, যুক্তি না দেখাইয়া, অশ্রুসিক্ত একখানি ফলগীতিতে হৃদয়খানি ঢালিয়া দেয় তখন তাহার সে রূপ অপূর্ব্ব, চিন্তার অতীত, কল্পনার সত্য।

ধনীর প্রাসাদের পার্শ্বে দরিদ্রের উটজ, সংসার বিরাগী ঋষির মালিনীতীর-বর্ত্তী আশ্রমে রাজার প্রমোদবিনোদের আয়োজন মিলনের এমন সহজ সুন্দর রূপ কল্পনা করিয়াছে শুধু সাহিত্য। ভাঙা ভিতের উপর অসথ গাছ জন্মিয়াছে দারিদ্র্যরূপী বাদুড় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে সাহিত্য ফুটাইয়াছে লাবণ্যের স্ফুরিতাধরের হাস্য, রসের স্বচ্ছ বেগময় লীলাচঞ্চল ধারা। আমার চক্ষে মধ্যাহ্নের তপন আসিল দাহন মূর্ত্তিতে, কবি তাহার মধ্যে দেখি-লেন সন্ধ্যামিলন বিধুর আত্মতাপ তপ্ত উদাও নীরকরাজকে। আপনারা বলিবেন

সাহিত্য যদি তাহার চক্ষু হইতে কল্পনার নীল চশমাখানি একটীবারের জন্য সরাইয়া রাখিত তাহা হইলে সে দেখিত সূর্য্য কেবল পোড়ায়, পুড়েনা। আকাশ যে শূন্য সেই শূন্য, চন্দ্রাতপের সহিত তাহার দূর জ্ঞাতি সম্বন্ধ স্থাপন বদ্ধ পাগল না হইলে সেও আর করিবে না। কিন্তু সাহিত্য চায় না সে আপনাদের মত বাস্তব হয়। সে বস্তুকে ফেলিয়া অবস্তুকে বরণ করিয়াছে, সত্যকে রাখিয়াছে মন্ত্ররূপে, অনুমানকে স্নেহরূপে আর সবার উপর রাণীত্বের গৌরব লইয়া, তাহার না পাওয়ার মধ্যে সবার চেয়ে বড় পাওয়া হারানের মধ্যে সবার চেয়ে বড় অর্জ্জনে সুন্দরী লীলাময়ী কল্পনাকে। তাহার চোখে হাট মাঠ আঁধার আলো জানা অজানা, শান্ত অনন্ত সকলেই কল্পনার খেলার সাথী। সাহিত্য রাজ্যের অধিবাসির মধ্যে কাজের মানুষ বড় কেহ নাই। কর্ত্তব্যের লৌহ মুকুট পরিবার জন্য সুধীজন সম্মত কোন সাহসে পোষণ করে না। সে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে কখন অরুণের অবস্তু আলোর মুকুট তাহার মাথায় সেই অকাজের দেবতা অবস্তুর উপাদেয়, অন্তহীন অজানা আসিয়া পরাইয়া দেন। কতকালের কতলোক কোথায় কোন সুদূর পল্লীতে তাহাদের বিচিত্র সুখদুঃখ লইয়া বাস করিত, কত দিন সেখে কত শিশুর ভবন মুখগামী কল ভাষিত কত নীরব রাত্রিতে কত অজনা আঙ্গিনায় জ্যোৎস্নার উৎসুক শশঙ্ক পাদক্ষেপ সমস্ত এমনই ছন্নছাড়া ঘটনার মারা জাল বুনিতে কাব্যের প্রয়োগ। তাহার দিন তারিখ মনে নাই, পোর্ব্বা পর্ব্ব মনে নাই, সত্যাসত্য মনে নাই, প্রয়োজন অপ্রয়োজন চিন্তা নাই, কিন্তু মানুষ যাহা লইয়া আজিও অতীতের প্রতিচ্ছবি ভবিষ্যতের অঙ্কুর — মনে আছে সেই কয়টী গোড়ার কথা মনে আছে কোন তরঙ্গ রাশির উপর ভরদিয়া মানুষের জীবনের খেয়া নৌকা পাল তুলিয়া যায় মনে আছে সপ্তস্বরার সেই একটী ঝঙ্কার যাহার সহিত মানবের জীবন সঙ্গীত অনুরণিত। তাহার বিলাসি সুলভ শরীরে বস্তুর ভার সহিতেই পারে না। তাহার অঙ্গের পেলবতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একই স্রোতে বহিয়া যাইতে পারে যাহার বস্তু নাই, ভার নাই, পরিমাণ নাই। যাহা বিন্দু হইয়া সিন্ধুর আনন্দ দিতে পারে রেখারূপে যাহা তল ও ঘনকে আপনার বুকে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ। সাহিত্যের প্রভাত সঙ্গীত ময়, প্রভাতে বিগ্রহ কুঞ্জনময় উষার প্রকট রূপ সেখানকার জাগরণ, পুষ্পভারাবনমিত

তরুলতার পবনাহত মন্দান্দোলন। সাহিত্যের রাজ প্রাসাদে কোথায় দীপালির গৌরবময় উৎসব কোথাও দীপহীন কৃষ্ণবর্ণ মসী চিহ্নিত কক্ষ কিন্তু এই বিচিত্তার মধ্য দিয়া একটী অনবরুদ্ধ রস প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান। এই রসের পাকে জাল না দিয়া কবি কাব্যামোদীর জন্য মোদক প্রস্তুত করেন নাই এই খানেই তাহার বিশেষত্ব, এই খানেই সাহিত্যের সোণার কাঠির অস্তিত্ব। ইহা লইয়াই সাহিত্য স্বতন্ত্র। এমন করিয়া বিচিত্র হইতেও বিচিত্রতর রূপ দিয়াও সাহিত্যের সাধ মিটে নাই। যিনি নিত্য নব নব রূপে নব নব বস্তুতে, মহত্বে, হীনতায় গৌরবে গ্লানিমায়রূপে অরূপে প্রস্ফুট তাহাকে প্রকাশ করিবার বৃথা চেষ্টা জনিত ঘোর লজ্জা সে অনুভব করে না। কেন না রূপের অনুধাবন করিয়াই পতঙ্গের আনন্দ, মরণ গৌরবময়, আলোক ময় সুন্দর। এই অসীম জগতের মধ্যে ক্ষুদ্র জীবনের অসমাপ্ত আশা তাহাকে দীনতার অন্ধকারে আকর্ষণ করে না। সে চায় আপন বুকে কামনারই রক্ত নিশান উড়াইয়া রাখিতে। এই কামনারই মহিমা গান করিতে সে—

উদ্গাস্তুমিচ্ছতি কিন্নরানাং তান প্রদায়িত্বমি রোপ গন্তুম্

কাঁদিয়া হাসিয়া ভাল বাসিয়া অভিমান করিয়া, নিশীথ পবনে বাঁশরী বাজাইয়া, তারকার মালা গলায় পরিয়া চাঁদের সুধায় মাতাল হইয়া মরণেই তাহার সুখ। তাহার বুকে সে ক্ষণপ্রভাবই বিকাশ দেখিতে চায়, চির প্রভাব নয়। সে মুক্তি চায়না ভক্তি চায় সে যে গান শুনাইতে চায় তাহাতে থাকে কাঁদিবারই একটী বিচিত্র সাধ—

"ধুয়ার ছলনা করি কাঁদি"

তাহার আকাশে "দিবসের আলো ম্লান হোয়ে আসে" রাত্রি হইয়া কাঁদিবার অপূর্ব্ব সুখ উপভোগ করিবার জন্য তাহার পর আবার ঊষার গর্ভ হইতে অরুণালোকিত নব জীবনের গৌরব লাভের জন্য। চিরস্নিগ্ধ মধু মাসের গীতি গন্ধ ভরা বাতাসের ডাক তাহার অন্তরের ডাকঘরে তাহার নামে চিঠি পাঠায় আর সে তখন তাহাব কল্পনা দূতীকে ডাকিয়া বলে

সখী সে গেল কোথায়
তারে ডেকে নিয়ে আয়

এই লুকোচুরী খেলায় এই লুকোচুরীর আনন্দে তাহার জীবনের শুভক্ষণ গৌরবময় হয়। হে গৌরবান্বিত অতিথি আমার, আজ তোমার আবাহন

সভায় আমার ছিন্ন বীণায় যে রাগিনী আলাপ করিলাম তুমি তাহাতে বিরূপিনী হইবেনা ভরসা লইয়াই এই সাহিত্যের দক্ষিণ বায়ু বিকশিত উপবনে আসিয়াছি। তোমাকে প্রণাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মর্য্যাদা করিতে শিখি। যেন তোমার একনিষ্ঠ সাধকের মত বলিতে পারি

জননী বঙ্গভাষা জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান।
শুধু যদি পাই ও দুটী অমল কমল চরণে লভিতে স্থান॥

রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা।

(শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য এম্, এ।)

ভারত বর্ষের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে যখনই এ দেশে জাতীয় জীবন কলুষিত ও বিকৃত হইয়া উপায় ও উদ্দেশ্যকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে তখনই এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ও প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

গিতার এই অভয়বাণী ভারত ইতিহাসে অনেক বার সফলতা লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ভারত ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায়। এই সময়ে বণিক ইংরাজের মানদণ্ড সহসা ভারত বাসীর মস্তকের উপর রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল ও ইংরাজ বণিকের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় ভারতবাসী কেবল তাহার ঐশ্বর্য্য ও শিল্প বিদ্যাকে আহুতি দিয়াই পরিত্রাণ পাইল না; জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্রকে বলি দিতে বসিল। পরাধীন বিজিত জাতী ইংরাজী সভ্যতার দিকে ঝুকিয়া পড়িল। ভারতবর্ষকে ইউরোপের একটী সুলভ সংস্করণে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কাল পশ্চিম হইতে আসিল ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা, সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বর নাস্তিকের উচ্চ আস্ফালন। দরিদ্র রুধির পুষ্ট

ইন্দ্রিয় ভোগ মূলক পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের সংহতি শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিল। পাশ্চাত্যের নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও জড়ের জঞ্জাল দেশে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতের স্বভাব ধর্ম্ম ইহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিল—এইরূপে ভারতের নানা স্থানে যখন ধর্ম্ম মতের উৎপত্তি, বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন ও পণ্ডিত শশধরের হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা, পাঞ্জাবে শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ স্বামীর বেদ ধর্ম্মের আন্দোলন তখন সমগ্র ভাব বিপ্লবের মধ্যে, লোক লোচনের অন্তরালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে এক দীন দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক, সর্ব্বকালিক ও সার্ব্বদৈশীক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রকাশ করিতে লোকের হিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন।

একদিকে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান প্রভূত ধন ধান্য নাস্তিকতা, তীব্র ইন্দ্রিয় সুখস্পৃহা. অঙ্গে অঙ্গে মরণের উন্মাদ রাগিণী, সভ্যতা নামধারী প্রচণ্ড অন্যায় ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায় অপর দিকে বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণ মহামারীর উৎসাদন ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জা চর্ব্বন, অনশন, অর্দ্ধাশন, দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগ শোকের কুরুক্ষেত্র, আশা উদ্যম আনন্দ উৎসাহের, কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশ্মশানে—দুই নেত্র করি আঁধা, জ্ঞান বাঁধা, কর্ম্মে বাঁধা, গতি পথে বাঁধা, আচারে বিচারে বাঁধা, লুপ্তাচার লুপ্তক্রিয় ম্রিয়মান ভারতবাসী।

শাস্ত্র শুনিবে কে ?বুঝা তো দূরের কথা তাই হিন্দুর বেদ বেদান্ত হইতে অপরাপর জাতীর যাবতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থে নিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থা সকলের কথা যে সত্য এবং বাস্তবিকই যে মানুষ এই সকল পথ দিয়া চলিয়া এইরূপ অবস্থা সকল লাভ করিতে পারে। শাস্ত্র কি প্রকারে ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন তাহা দেখাইবার জন্য এবং এ প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্পর্শ মাত্র হীন ভারত প্রচলিত কুসংস্কার খ্যাত ধর্ম্মভাবে গঠিত জীবন মূর্খ দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ কুমার শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে বিচার বুদ্ধিবলে চাল কলার বিদ্যা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বান্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন

এবং ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিব, স্পর্শ করিব, পূর্ণভাবে আস্বাদন করিব এই মানস মুকুল হইতে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী প্রবল তপস্যায় যে ফল ফলিল তাহা আজ সনাতন শাস্ত্রের অসীম অনন্ত ভাব ও সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় জগতে প্রচার করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারের সকলে যে পথে চলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া, পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্য ও সংযমাদির অভ্যাসে আপনাকে ভগবনের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া দেখাইলেন, যে ভারত ও ভারতেতর দেশে প্রাচীন যুগে যত ঋষি আচার্য্য অবতার পুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া যত প্রকার ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম মতে ঈশ্বর লাভের যত প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে। প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণসত্য। বিশ্বাসী সাধক ঐ ঐ পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া এখনও তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বর দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারেন—দেখাইলেন যে পরস্পর বিরুদ্ধ সামাজিক আচার রীতি নীতি প্রভৃতি লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পর্ব্বত সদৃশ্য ব্যবধান বিদ্যমান থাকিলেও উভয়ের ধর্ম্মই সত্য; উভয়ে একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনা করিয়া বিভিন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া কালে সেই প্রেমস্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়। দেখাইলেন যে ঐ সত্যের ভিত্তির উপর দাণ্ডায়মান হইয়াই উহারা উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবে এবং বহু কালের বিবাদ ভুলিয়া শান্তি লাভ করিবে; এবং দেখাইলেন যে কালে ভোগলোলুপ পাশ্চাত্যও ত্যাগেই শান্তি একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশা প্রচারিত ধর্ম্ম মতের সহিত অন্য ধর্ম্ম সমূহের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া কর্ম্ম জীবনের সহিত ধর্ম্ম জীবনের ঐক্য সাধন করিবে। তাই পরমহংস দেব দেশ বিশেষ জাতী বিশেষ সম্প্রদায় বিশেষ বা ধর্ম্ম বিশেষের সম্পত্তি নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতী শান্তি লাভের জন্য তাঁহার উদার মতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যত মত তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথায় বলিতেছি "সব মতের লোকেরা আপনার মত বড় করে গেছে যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। তাই বহিঃশৈব, হৃদে কালী মুখে হরিবোল। আমার ধর্ম্ম ঠিক, অপরের ধর্ম্ম ভুল,—এ মত ভাল নয়। ঈশ্বর এক বই দুই নাই তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে শিব। যেমন পুকুরে জল আছে। এক ঘাটের লোক

বল্‌ছে পানি, হিন্দু বল্‌ছে জল। খৃষ্টান বল্‌ছে water কি জানো তিনি নানা ধর্ম্ম কোরেছেন অধিকারী ভেদে যার যা পেটে সয়। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা ছেলেদের জন্য সেই মাছ ঝোল অম্বল ভাজা আবার পোলাও করিলেন। সকলের পেটে পোলাও সয় না তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করছেন। তারা পেট রোগা। সকলে ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারী হয় না। তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা কোরেছেন। আঁধারে কেহ বা হাতীর কান কেহবা পা কেহ বা লেজ ধরিল ও গোলমাল করিতে লাগিল যে হাতী কুলোরমত, থাম্বার মত কিন্তু সত্যিকার হাতী তাহাদের মত হইতে কত প্রভেদ। একটী পোকা এক সময়ে লাল, এক সময় নীল, এক সময় হলদে, সাদা, কাল রং হয় আবার এক সময় রং নাই—যে লাল রঙের সময় দেখেছে সে বলে লাল যে নীল রঙের সময়ে দেখে সে বলে নীল বস্তুতঃ কেহ পোকাটীর আসল রূপ জানে না! কালী সাকার আকার নিরাকারা। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বোঝা যায় না। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার তিনি আরও কত কি কে বলিতে পারে।"

কি সুন্দর গল্পের ছলে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বুঝানো হইল। গীতাতে আমরা দেখিতে পাই—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

এবার নিরক্ষর ভাবে ঠাকুরের আগমন তাই প্রচারের প্রণালীও পৃথক ও অসাধারণ। তিনি সরল মধুর গ্রাম্য ভাষায় আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্ব সকল সাধারণ দৃষ্টান্ত ও রূপকাদির সহায়ে বুঝাইয়া সাধকের মনের সম্মুখে একটী জলন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরিতেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্যই যে শাস্ত্র এবং শাস্ত্রে যে জ্ঞান, মত বাদ আকারে মাত্র রহিয়াছে। সিদ্ধ পুরুষে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি,—সিদ্ধ পুরুষ বেশাস্ত্রের মূর্ত্তিমান বিগ্রহতিনি তাহা নিজের জীবনের দ্বারা কিরূপে দেখাইয়া গেলেন এক্ষণে তাহার কিছু আলোচনা করিব। গীতায় আছে প্রকৃতি বা মায়া জগৎ বিকাশের মূল কারণ স্বরূপ শক্তি বিশেষ। অর্থাৎ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থা। আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়। এতদুভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে।

যথা :—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান।

১৩। ১৯

কার্য্যকারণের হেতু প্রকৃতি—

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে।

১৩। ২০

এই জটিল সাংখ্য দর্শন রামকৃষ্ণ কেমন সহজ ভাবে বলিতেছেন—"ওতে পুরুষ অকর্ত্তা কিছু করে না। প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। পুরুষ প্রকৃতির সকল কাজ করেন। পুরুষ প্রকৃতির সকল কাজ সাক্ষীরূপে হয়ে দেখেন। প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোন কাজ করিতে পারেন না। ওই যে গো, দেখনি বে বাড়ীতে কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে আলবোলায় তামাক টান্‌ছে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে, একবার এখানে একবার ওখানে ছুটোছুটি করছে এ কাজটা হল কি না ও কাজটা হল কি না সব দেখছেন্ শুনছেন্, আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাত মুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন এটা এই এই রকম হল, ওটা ঐ রকম হল এটা কর্ত্তে হবে, ওটা করা হল না ইত্যাদি। কর্ত্তা তামাক টান্‌তে টান্‌তে সব শুনছেন্ ও হাঁ হাঁ করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন।

গীতায়—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মানি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। ৫।১৫

তিনি কাহারও কর্ত্তৃত্ব উৎপাদন করেন না এবং কাহারও কোন কার্য্যও করে না। কোন কর্ম্ম ফলের সহিত তাহার বাস্তবিক সংযোগও নাই, কিন্তু জড়াত্মিকা প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বি পরিবর্ত্ততে। ৯।১০

কারণ সৃষ্টাদি কার্য্যেতে আমি (আত্মা) কেবল সাক্ষী দ্রষ্টা স্বরূপে থাকিলেই জড়াত্মিকা প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে, হে

কৌন্তেয়ঃ এই হেতুই এই অনন্ত জগৎ স্থিতি এবং লয়াবস্থাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্লোকগুলি মূর্ত্তি ধরিয়া সাধকের মনের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আবার হয়ত প্রশ্ন উঠিল "মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেতেই রহিয়াছেন, তবে কি ঈশ্বরও আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ? রামকৃষ্ণ বুঝাইলেন "নারে ঈশ্বরের মায়া হলেও এবং মায়া ঈশ্বরে সর্ব্বদা থাকিলেও ঈশ্বর কখনও মায়াবদ্ধ নয়। এই দেখনা— সাপ থাকে কামড়ায় সে মরে! সাপের মুখে সর্ব্বদা বিষ আছে। সাপ সর্ব্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্চে, ঢোক গিলছে, কিন্তু সাপ নিজে তো মরে না।

গীতায়—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ।৯।৫

ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অগোচর চৈতন্য মাত্র স্বরূপের দ্বারা এই অনন্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে। আমাতেই এই সমস্ত জগৎ অবস্থিত করিতেছে।

নচ মৎ স্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরম
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূত ভাবনঃ।৯।৫

আমি ভূতের আধার অথচ ভূতস্থিত নহি, আমি ভূতভাবন অথচ ভূতের সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, মায়ার সহিতও আমার বিমিশ্রিত সম্বন্ধ নাই।

শ্লোক গুলি আমাদের কাছে কিরূপ সহজ হইয়া আসিল। প্রশ্ন উঠিল— 'পুরুষ প্রকৃতি এক কিম্বা দুই?' বেদান্ত বলে—অভেদ। সাংখ্য বলে দুই। কোনটি ঠিক? রামকৃষ্ণ বুঝাইলেন 'সেটা কি রকম জানিস্?' যেমন সাপটা কখনও চলছে আবার কখনও বা স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে তখন হল পুরুষ ভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে, আর যখন সাপটা চল্‌ছে তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করছে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লে আর একটাকে মানতে হয়, তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ও শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্ম ভাবা যায় না। নিত্য

ছেড়ে লীলা, আবার লীলা ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। এক সচ্চিদানন্দ শক্তি-ভেদে উপাধি ভেদ, তাই নানারূপ। যেখানে কার্য্য সেই খানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাকিলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল, সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ শক্তিময়ই গুণ। তিনিই মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। গীতায় আছে ঃ—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।৭।১৪

আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া অতিশয় দুরত্যয়া, কিন্তু যাহারা কেবল আমাকেই প্রপন্ন হইতে পারেন, তাঁহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

জগৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের খেলা। তাই ত্রিগুণাতীতনা হইতে পারিলে কর্ম্ম করিতে হবে।

রামকৃষ্ণ বলিতেন দেহ থাকিতে কাম ত্যাগ করিবার যো নাই। পাক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই। (কর্ম্মকাণ্ড আদিকাণ্ড।)

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।

জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম্ম নয়—ঈশ্বর। তবে ঈশ্বর দর্শন করিতে কর্ম্ম চাই। পানা পুকুরের জল খেতে হলে পরিশ্রম করে পানা ঠেলতে হবেই—পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না। তাই কর্ম্ম না করিলে ভক্তি লাভ হয় না। মাখন যদি চাও তবে দুধকে দৈ পাৎতে হয়। তারপর নির্জ্জনে রাখতে হয়। তারপর দই বসলে পরিশ্রম করে মাখন করিতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। কোথা হতে যত অভিমান এসে জোটে বোঝা যায় না। কৃপনাঃ ফলহেতবঃ—তাই বলছে, অনাশক্ত হয়ে কাজ কর।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান্। ২।৪৫

কিন্তু একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। ঈশ্বরকে লাভ করিলে তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা বোধ হয়।

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে; যেমন নারদ ও জনকাদি। কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে, মুখ মুছে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায় আবার কেউ একটী আম পেলে সকলকে দেয় আর আপনি খায়।

কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ

এখন কর্ম্ম করিতে গেলে আগে চাই একটী বিশ্বাস—সেই সঙ্গে জিনিষটি মনে করে আনন্দ হয় তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটীর নীচে একঘড়া মোহর আছে, এই জ্ঞান এই বিশ্বাস প্রথমে থাকা চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়, তার পর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হয়। ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়িতে থাকে। গীতায় আছে—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ।

কামনা শূন্য হয়ে কর্ম্ম করিলে শুদ্ধ সত্ব হয়। শুদ্ধ সত্ব হইলে ঈশ্বর লাভ হয়।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা, যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ। ৩। ৩০

তাই যে কর্ম্ম কর ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কামনা শূন্য হয়ে করিতে হয়। অভ্যাস যোগে সব সহজ হ'য়ে যায়। ও দেশের ছুতোরদের মেয়েরা সব চিঁড়ে ব্যাচে। তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোনো। ঢেঁকির পাট পড়ছে, হাতে ধানগুলো ঠেলে দিচ্ছে, আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দেরের সঙ্গে গল্প করছে। কিন্তু তার সব মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত ও এক আনায় অন্যান্য কর্ম্ম।

গীতায় আছে—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।

সাধন করিতে গেলে জ্ঞান বিচার প্রথমে করিতে হয়। নেতি নেতি ক'রে আত্মাকে ধরার নাম—জ্ঞান। তিনি পঞ্চভূত নন, ইন্দ্রিয় নন, মন নন, বুদ্ধি নন, অহঙ্কার নন, সকল তত্ত্বের অতীত। ছাতে উঠতে হবে, তাই এ:কে একে সকল সিঁড়ি ত্যাগ করে যেতে হয়। সিঁড়ি কিন্তু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপরে পৌছে দেখা যায় যে যে জিনিষে ছাদ তৈরী, ইট চুন সুরকী. সেই জিনিষে সিঁড়িও তৈরী। জ্ঞান পথে তাঁকে পাওয়া যায়, তবে এ পথ বড় কঠিন। দেহাত্ম বুদ্ধি এসে পড়ে। অশ্বত্থ গাছ এই :কেটে ফেল, মনে করলে মূল শুদ্ধ উঠে গেল কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখ ফেঁকড়ী দেখা দিয়েছে। দেহাভিমান যায় না। গীতায় আছে—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম
অব্যক্তাহিগতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

তার পর পরমহংস বলিতেছেন—ব্রহ্ম সত্য,জগৎ মিথ্যা,সেত বিচারের কথা। যার অটল আছে তার টলও আছে। যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধ আছে। জগৎ মিথ্যা হ'তে যাবে কেন? আমায় কালী ঘরে দেখিয়ে দিলেন যে সব চিন্ময়। কোশাকুশী চিন্ময়। চৌকাট চিন্ময়, মার্ব্বেলের পাথর সব চিন্ময়। প্রতিভা চিন্ময়, বেদ্ম চিন্ময়। ঘরের ভিতর দেখি সব যেন চিদানন্দ রসে ডুবে রয়েছে।

গীতায় আছে—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণাইব।
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতাম্।
অসক্তং সর্ব্বভূত্বেব নিগুর্ণং গুণভোক্তৃ চ।

যারা তাকে পেয়েছে তাঁরা জানেন তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর মায়া

জীব জগৎ। একটা বেল ওজন করিতে দিলে কি, খোলা ও বিচি ফেলে দিয়ে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? তাহলে ওজনে কম পড়বে। খোলটা যেন জগৎ। জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব ও জগৎকে অনাত্মা বলে বাদ দেওয়া চলে। বিচার হয়ে গেলে সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। অনুলোম, বিলোম, ঘোলেরই মাখম। মাখমের ঘোল। তাই যারই নিত্য তারই লীলা। শুধু জ্ঞান যেন, ভস করা একটা তুবড়ী, খানিকটা ফুলকেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। শুধু জ্ঞানী যারা তারা ভয় তরাসে, তাদের ভাব 'আমি যো সো করে যাচ্ছি আবার কে আসে। যেমন সতরঞ্চ খেলায় লোকেরা তাকে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। ভক্তের কিছু ভয় নাই, সে নিত্য লীলা দুই লয় তাঁকে চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও, আনন্দ। আবার লয় না হলেও লীলাতে রেখেও আনন্দ। তাই ভক্তি যোগ যুগধর্ম্ম। ভক্তি যোগই সোজা।

গীতায় আছে—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ।

তারপর সমাধি না হইলে 'আমি' যায় না। তাই থাক শালা দাস, আমি হয়ে। ভক্তের আমি আমির মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টি খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। অদ্বৈত জ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়, তখন দেখে—সর্ব্বভূতে চৈতন্য রূপে তিনি আছেন। চৈতন্য লাভের পর আনন্দ।

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যে ব্রাহ্মণকুমার আমাদিগকে স্বীয় জন্মদ্বারা পবিত্র, কর্ম্মদ্বারা উন্নত ও তাঁহার অমোঘ বাণীদ্বারা পৃথিবীর দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন। যাহার করুণা-কণা লাভ করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব-পূজ্য

হইয়াছেন, তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদে জগতের প্রতি জীব-হৃদয়ে আবার "যত্র জীব তত্র শিব" মন্ত্র অনুভূত হউক। জগতে সেই জগন্মঙ্গল দেবতার আশীর্ব্বাদে আবার স্বর্গ মর্ত্তের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইক।

তুমিই আমার।

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ)

তুমিই আমার জীবন মরণ জনম পাপ পুণ্য।
তোমারি মহিমা শিরে ঢালবলে হই ভবমাঝে ধন্য॥
সংসার মায়ায় হইগে মলিন ঝেড়ে দাও তুমি ধুলি।
মোহের সাগরে ডুবি গো যখন তুমি নেও কোলে তুলি॥
পথ-হারা হয়ে সংসার মরুতে যখনই মরি ঘুরি।
তুমিই তখন দেখাইয়া পথ নিয়ে যাও হাত ধরি॥
সমর মাঝারে বাহুবল তুমি তুমিই বর্ম্ম-খড়্গ।
শত্রু যখন ঘেরিয়া আইসে তুমিই তখন দুর্গ॥
ক্ষুধাতুর হ'লে দাও গো অন্ন সান্ত্বনা দেও শোকে।
পীড়িত হইলে চিকিৎসক তুমি সহায় হও গো দুঃখে॥
সংসার জ্বালায় অবসন্ন হলে, তুমিই দাও গো শক্তি।
মৃত্যু যখন ঘনাইয়া আসে তুমিই তখন মুক্তি॥
বিপদে সম্পদে রোগে শোকে দুঃখে তুমি ছাড়া নাই অন্য।
দেহ মনঃপ্রাণ তোমারই প্রভু! ঘুচাও হিয়ার দৈন্য॥

শিক্ষা।*

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বিশ্বাস)

"জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে,
সকল শিক্ষার সার, মানব-জীবনে।"

শিক্ষা মানব জীবনের এক অতুলনীয় স্বর্গীয় সম্পত্তি। এ জগৎ সংসারে ইহার সহিত তুলনীয় আর কিছুই নাই। ব্যবহারিক জগতের পরমোৎকৃষ্ট কোন পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার সময়, মানব যাহা কখনও চাক্ষুষ উপলব্ধির পথে আনয়ন করিতে পারে নাই, সেই কাল্পনিক স্পর্শ মণি, পীযুষ, স্বর্গের নন্দন-কানন অথবা সুরভি প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া আত্ম তৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু এই শিক্ষা উপমা রহিত; উল্লিখিত উপমেয়ের কোন একটীর সহিত তুলিত হইলে ইহার সর্ব্বতঃ-প্রসারিণী শক্তিকে খর্ব্ব করা হয়। ইহা একাধারে ঐ সমস্তেরই উপমা স্থল। তাই বলি, ইহা উপমা রহিত। সাগর কিম্বা আকাশের ন্যায় এই শিক্ষাই শিক্ষার উপমেয়। এই শিক্ষাই শাস্ত্র, বিবেকবান্ জীবকে শাসন করিতেছেন;—এই শিক্ষাই গুরু, অন্ধ জীবের চক্ষু ফুটাইয়া জ্ঞান ও ভক্তির অমৃতাস্বাদনে জীবকে পাগল করিতেছেন; আবার এই শিক্ষাই চরম শ্রীভগবান্। ইহা স্পর্শমণি নহে; স্পর্শমণি অপেক্ষা অনেক উপরে ইহার স্থান। যে হেতু স্পর্শমণি সংস্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় মাত্র; যে লৌহ খানি স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল, সেকি অন্য একখানি লৌহের লৌহত্ব ঘুচাইতে পারে? কিন্তু শিক্ষা অন্ধের চক্ষু। যাহার চক্ষু অমৃত স্পর্শনে একবার ফুটাইয়া দিল, সেই শুধু স্বীয় মানব জীবন সফল করিতে পারিয়া চরিতার্থ হইতে পারিল তাহা নহে, পরন্তু চিত্ত সুরভিতে জগৎ আমোদিত করিয়া, অপর অন্ধেরও অন্ধত্ব ঘুচাইয়া, এইরূপ নন্দন কাননের সৃষ্টি করিতে সামর্থ্যবান হয়। ইহা অমৃতও নহে, অমৃত অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর প্রাণপ্রদ প্রেরণা ইহার উপাদান; যেহেতু, সুধা পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু অমৃত তাঁহাদের চিত্তে

* ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

শাশ্বত শান্তির ফোয়ারা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কি? তাঁহারাও সময় সময় দৈত্যের দৌরাত্ম্যে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী বেশে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় পথে পথে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বর্গের নন্দন-কানন দেবতার চির নিবাস স্থল, পারিজাত কুসুমের সুরভি দেবতার নিত্য উপভোগ্য, কিন্তু তাঁহাদের এই শান্তির পেছনে কত কি অশান্তির বিকট মূর্ত্তির তাণ্ডব নৃত্য ছিল, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এরূপ ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ডে পরিমাণকালে যাবতীয় সামগ্রীই হার মানিয়া যাইবে। শিক্ষার শক্তি-স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। শিক্ষার অমৃতাস্বাদন যাহারা একবার করিয়াছেন তাঁহারাই অমর, দেবতা অপেক্ষা উন্নততর, অসুর তাঁহাদের ত্রিসীমানার বাহিরে বিষাদ কালিমায় অঙ্গগোপন করিতে ব্যস্ত। ইহার নন্দন কাননে সৌভাগ্যবশে যাঁহারা একবার প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তও নন্দন কাননে পরিণত হয়; পরিজাতসৌরভে নিত্যই তাঁহারা আমোদিত। ইহার আর বিচ্ছেদ ঘটে না। তাইবলি এই শিক্ষাই ভগবান, এই শিক্ষাই গুরু, এই শিক্ষাই শাস্ত্র। ভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বিতা শিক্ষারূপে জগতের অন্ধকার দূরীকরণ মানসে আত্ম প্রকট করিয়া সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রদর্শনে বিশ্বকে স্তম্ভিত করিতেছেন। অমৃত আলোক পশরা শিরে নিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে পরম দয়াল তিনিই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ক্লান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, মান নাই, অপমান নাই, কেবলই ঘুরিতেছেন; কিন্তু আমরা—তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব—কি করিতেছি? মায়ার কপাট অভিমান অর্গলে রুদ্ধ করিয়া, 'প্রমত্ত ইন্দ্রিয় ইয়ারের' দলে তরল আমোদ প্রমোদে উষার সংবেশ সুখ কল্পনা করিয়া, মানবতার অমৃতময় ক্রোড় হইতে দূরে—বহুদূরে সরিয়া পড়িতেছি। জীবনে শান্তি-অমৃতের পরিবর্ত্তে অশান্তি হলাহল প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছি। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি কত রূপেই যে শিক্ষা মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়-দ্বারে উপস্থিত হন! কিন্তু আমরা গুরু সাজিয়া, অসঙ্কোচে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। কি সাহস! বলুন, ইহার জন্য দায়ী কে? সে বিষয় কি আমরা মানব কখনও চিন্তা-পথে আনিয়াছি? অথচ নির্লজ্জের মত মানব বলিয়া গর্ব্ব করিতে বিরত হই না। শিক্ষাই এই মানবতার জননী। শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, অথচ আমরা মানবতার গর্ব্বে স্ফীত. ইহা হাস্যাস্পদ নয় কি? জন্মমুহূর্ত্তে অনেকটা একরূপ থাকিয়াও কেন বয়োবৃদ্ধি-সহকারে চিত্ত বৈসম্যে

ভিন্ন ভিন্ন পন্থ ধর্ম্মী হইয়া এ পৃথিবীকে একটা ভয়াবহ স্থানে পরিণত করিতেছি। এই শিক্ষা কি ইহার মূলীভূত কারণ নয়? সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের আনন্দ-প্রাণের গড়া আমরা আজ কি হেতু সেই আনন্দ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া নরাকারে পশু লীলাতে বিভোর রহিয়াছি? শিক্ষার অভাবে নয় কি? সিংহের শিশু হইয়া কেন ভীতি সঙ্কোচ চিত্তে মেষের সঙ্গে পলায়ন তৎপর? সেই পরম দেবের নির্ম্মাল্য স্বরূপ এই দুর্লভ জীবন খানি কেন আজ অপদেবতার পদ দলিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি না? ইহা কুশিক্ষা মোহ মদিরা পানের বিপরিণাম নহে কি?

যেখানে শিক্ষা, সেই খানেই পরীক্ষা। আমাদের চিত্তক্ষেত্রে বোধ শক্তির সহিত নানাবিধ সদ্‌গুণের বীজ তিনিই নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আবার তাহাদের উন্মেষের মুখে বহু পরি পন্থী তিনিই দাঁড় করিয়া রাখিয়াছেন। এক দিকে যেমন করুণারূপিণী শিক্ষার ঘন আলোক সম্পাত আমাদের চিত্ত গুহার গাঢ় অন্ধকার নিস্কাসিত করিতে তৎপর, অন্য দিকে তেমনই আবার নানাবিধ অন্তরায় ঐ গাঢ় অন্ধকারকে গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম করিতে ব্যস্ত। ইহাই পরীক্ষা। এই পরীক্ষার পরীক্ষক তিনি, সম্পাদনকারী তিনি, তিনিই আবার পরীক্ষার্থী। মধুরতমের মধুর লীলাই বটে, অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়াই এই লীলার প্রাণ। তিনিই এই মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠান করিয়া, যাবতীয় কুশিক্ষাকে সুখের মোহন প্রলেপে আবৃত করিয়া অতি রমণীয় বেশে মানব নেত্রপথে ধারণ করেন। মায়া শক্তিতে হত প্রাজ্ঞ মানব আমরা, ইহার ভেদ বুঝিতে না পারিয়া আপাত মনোরম সুখ জননী কুশিক্ষার চরণে আত্মমন চিরকালের অত সমর্পন করিয়া বসি, জীবনকে তমঃ সাগরের অন্তস্তলে ডুবাইয়া দিই, কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান, যাহাদের বিবেক প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা কিছুতেই ভোলে না। এই ভীষণ চাতুরী প্রহেলিকা তাঁহাদের নিকট হার মানিয়া যায়, শিক্ষার অমৃত ধারা সম্পাতে তাঁহাদের জীবন বল্লরী নবনধর মূর্ত্তিতে সঞ্জীবিত, মনোহর ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত, তাঁহাদের অমৃত দর্শনে জীব স্বভাবতঃই ভক্তি আনত। এই শিক্ষার গুরু তিনি, জীবের কাম কণ্টকময়ী চিত্ত মরুভূতে উপদেশ বারি নিক্ষনে সুখ-শীতল মরুদ্যানের সৃষ্টি

করেন। তাঁহারই লীলাময়ী শিক্ষা জননী তাঁহারই লীলা কাহিনীর মধুময় মলয় সমীরণে সংসার আতপ ক্লান্ত জীবের মুমূর্ষু যন্ত্রণার শান্তি বিধানের জন্য আকুল উচ্ছ্বাসে বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা কিন্তু গুরুভার মোহ মদিরাতে আত্ম বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাকে আহ্বান না করিয়া ভীতি সঙ্কোচ চিত্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আত্মরক্ষা করিতেছি। জীবনে শান্তি রসের পরিবর্ত্তে অশান্তির কূট কণ্টক যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছি। পক্ষান্তরে গুরু ব্যবসায়ের পশার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় অতিকষ্টে স্বীয় মনোবেদনা গোপন রাখিয়া সভা মজলিসে বক্তৃতা দ্বারা স্বনাম প্রচারে ব্যস্ত হই। এইরূপে প্রতিষ্ঠা কুহকিনীর কবলে পড়িয়া জীবনকে ক্রমেই অসার করিয়া তুলিতেছি, তাই আমাদের আজ এই দুর্গতি। এখন বলুন দুর্গত জীবের উপায় কি?—উপায় সাধুসঙ্গ। সাধুই শাস্ত্র, আবার শাস্ত্রই গুরু, গুরুই হইতেছেন শ্রীভগবানের আনন্দ ঘন মূর্ত্তি।

সাধু সঙ্গের প্রভাবেই চিত্তকালিমার ক্ষালন হইবে। তৎপর নির্ম্মলচিত্তে শাস্ত্রমর্ম্ম অবধারণ করিয়া চিত্তকে শাসিত করিতে পারিবে। চিত্ত সংযত হইলেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। শ্রীগুরুর কৃপাই ভগবানে ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দিবে। যত দিন ব্যাকুলতার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করিতে না পারিব ততদিন অমৃত স্বরূপ ভগবৎ করুণা প্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত। আকুল প্রাণে কাঁদিতে না পারিলে কখনও তাহাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব না, জগতে তাঁহার মোহন লীলা দর্শনে বঞ্চিত থাকিব।

প্রবন্ধের মুখবন্ধ শ্লোকের চরনদ্বয়ে মানব জীবনে শিক্ষার সার তিনটী বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। উহাদের প্রথমটী দ্বিতীয় সাপেক্ষ, আবার দ্বিতীয়টী তৃতীয় সাপেক্ষ। সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ শিক্ষার আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই তৃতীয়—'ভক্তি নারায়ণে' কিরূপে হয় দেখিতে হইবে। নারায়ণে ভক্তি বা ভগবৎ করুণা প্রাপ্তির প্রধান এবং প্রথম সোপান সাধুসঙ্গ। এই সাধুসঙ্গের প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘুচে না, অথচ একবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেই যেমন অনলত্ব প্রাপ্ত হয়, সাধুসঙ্গেও সেরূপ সমল-চিত্ত মানব, অনল জ্যোতিতে দগ্ধ

উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে এই নিষ্কর্ষ সত্য মহান্ সংশয়-সমাচ্ছন্ন। যেহেতু আমরা সাধুসঙ্গের ঐ অমৃত ফল হইতে সর্ব্বদা বঞ্চিত। বঞ্চিৎ হইব কেন? এ কথার উত্তর যে দেওয়া যায় না তাহা নহে। যখন আমরা ছাত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উপদেশে জীবন ধন্য করিতে সাধু সমীপ গমন করি, তখন গুরুতা-কুহকিনীর নিকট মূর্ত্তি ঐ ছাত্রত্বের অনুগামিনী হয়। সুতরাং সাধুর উপদেশ অভিমান-গরিমাতে ভর দিয়া শুনি,—কতকটা উপেক্ষার বাতাসে উড়িয়া যায়, আর কতকটা বাগ্মিবিজয় ও শিষ্যের নিকট প্রতিপত্তি লাভের বাসনায় গুরুভার হাতে সঞ্চিত রাখি। জীবনে কোন একটা উপদেশও কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না, কাজেই ঐ অমৃত ফল লাভে চিরতরে বঞ্চিত হই। আর এক দলের আমরা, তর্ককে সঙ্গে করিয়া সাধু মহাত্মাকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাধুসঙ্গ করিতে যাই। তাঁহারা কি প্রয়োজনে ঠেকিয়াছেন যে আমাদের সঙ্গে বৃথা আলাপনে অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন? 'সাধু কোন কাজের নয়' ভাবিয়া বিফল মনোরথে বাটী প্রত্যাগমন করি। অনুতাপের পরিবর্ত্তে সাধুর অশেষবিধ নিন্দাবাদ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করি। মহিষ স্বভাবতই মাছির উপদ্রব সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় এই উপদ্রবের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া থাকে। এক একবার তীরে উঠে। কিন্তু শরীরের জল শুষ্ক হইবামাত্র পুনরায় মাছির উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া, আবার জলে ডুব দেয়। বারংবার এরূপ করিলে কি কেহ কখনও সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারে? আমরাও এই দলের যখনই ত্রিতাপ জ্বালায় অনুভূতিতে চিত্ত মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হয়, তখনই সাধু সঙ্গ করি। অভিমান সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সাধুপোদেশের মোহন আলোক ঐ ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার পথ নির্দ্দেশ করে দগ্ধপ্রাণে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করি; কিন্তু অভিমান মোহের তমোময়ী প্রবল বাত্যা ঐ আলোক অবিলম্বে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, হৃদয়ও পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে থাকে। আর এক দল মহিষ আছে, মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য জলে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু তাহারা জলে ডুব দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, কর্দ্দম লিপ্ত শরীরে জল হইতে তীরে উত্থিত হয়। শরীর শুষ্ক হইয়া গেলেও মাছি আর বিরক্ত করিতে

পারে না; বেশ শান্তিতে তাহারা আপন মনে বিচরণ করে। আমারাও যদি এইরূপে সাধু মহাত্মার উপদেশের স্রোতে 'গা' ভাসাইয়া দিয়া প্রাণ পণে তাহা জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমাদের চিত্ত-মরুভূমিতে রমণীয় মরূদ্যানের সৃষ্টি হইবে। শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক, বিঘ্নও বহু, অল্পায়ুঃ মানব আমাদের পক্ষে শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেও সার বিষয় অবগত হইয়া জীবনে কৃতার্থতা লাভ করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং 'মহাজনো যেন গতঃসঃ পন্থাঃ'—সাধু মহাত্মার পন্থানুসরণ ব্যতীত আমাদের আর দ্বিতীয় উপায় নাই; যদি সৌভাগ্যবশে এই সাধু সঙ্গ কখনও হয়, তবেই শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষণ সত্য সত্যই হইবে, এবং এই সাধু সঙ্গ প্রভাবে অমল-চিত্ত হইতে পারিলেই নিয়ত সেই উপদেশ গুরু গম্ভীর শব্দে চিত্তে ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে। গুরুদেব অনন্ত মূর্ত্তিতে তাহারও প্রতিধ্বনি করিবেন, তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়িবে সে দিকেই গুরুদেব উপদেশ অঙ্কুশে মনকে সংযত করিতেছেন দেখিয়া স্তম্ভিত হইব; আর আপনাতে আপনি থাকিব না, আত্মহারা হইয়া কেবলই গুরুপূজা করিতে থাকিব। এইরূপে গুরু পূজাতে সিক্ত সরল অন্তঃকরণ, বাসন্তি হিল্লোলে তাঁহারই গন্ধ, তাঁহারই অমিয় স্পর্শন পাইয়া শিহরিয়া উঠিবে, তটিনীর পুলক উচ্ছ্বাস তাঁহারই অভিনব নর্ত্তন লীলা প্রদর্শন করিবে; সমুদ্রবক্ষবিহারী উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে, প্রবল ঝটিকার ভীষণ প্রবাহে তাঁহারই তাণ্ডব লীলা হিরণ্যকশিপু বধের প্রহশন দেখাইয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করিবে। অবাক্ নয়নে সে কেবলই দেখে, তাহার সীমানা সেও তখন পায় না, ক্ষণিকের মধ্যে কি যেন হইয়া যায়, এইরূপ সুবর্ণ সুযোগ থাকিলেই জীবন কৃতার্থ। অমৃতই তাহার চির ভোগ্য। ইহাই ভগভক্তির জননী, এই শিক্ষার অমৃত বর্ষণে ভক্তি লতা নব নধর মূর্ত্তিতে চিত্তে নন্দন কাননের সৃষ্টি করে, গুরুদেবই তখন ভগবন্মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া ঐকান্তিকী রতির মদিরা পানে ভক্তকে পাগল করিয়া দেন, ভক্ত আত্মহারা হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'আমি'কে সেই ভূমা 'আমির' চরণে ঢালিয়া দেয়, 'আমার' বলিয়া আর কিছুই থাকে না; সেই বৃহৎ 'আমি-সাগরে' সব ভাসিয়া যায়,—ইহাকেই বলে স্বার্থত্যাগ। স্বার্থত্যাগ মুখের জিনিষ নয়। ইহা অন্তরের—অনুভবের। ভাল, বাসার মোহন ইঙ্গিতে যখন এই স্বার্থত্যাগ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান সম্পন্ন হয়,

তখন 'আমি'র গণ্ডী না থাকা হেতু জীবে দয়া স্বতঃসিদ্ধ; যেহেতু তখন সে জীব দেখে না, কাহাকে দয়া করিবে? সে,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি,
সর্ব্বত্র দেখে সে এক ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।"

তখন সে,—

"যিনি এই পৃথিবীর ভিতরে বাহিরে,
পৃথিবী শরীর যাঁ'রি ধরে লীলা গান।
ভিতরে থাকিয়া যিনি শাসেন মহীরে,
পৃথিবী জানে না, কিন্তু তিনি ভগবান্।"

এই অমৃতের সন্ধান পাইয়া আপনাতে আপনি বিভোর! কে কাহার সন্ধান লইবে? কাহার সুখ, দুঃখের দোলাতে উঠিয়া তাহার চিত্ত দুলিবে? তথাপি জীব তাহার, জীবেতাহার ইষ্ট মূর্ত্তির লীলা তরঙ্গ দৃষ্টি গোচর করিয়া সে পাগল হইয়া যায়, সে যাহা দর্শন করে, তাহাই তাহার ইষ্ট মূর্ত্তি। ভালবাসার বাহু প্রসারণ করিয়া অকৈতব আলিঙ্গনে হৃদয় জ্বালার নির্ব্বাণ করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয়। তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" এইরূপে পৃথিবী তাহার অদ্বিতীয় সুখস্থানে পরিণত হয়। পরোক্ষ ভাবে তাহারাই জীবের শিক্ষক। মায়ামুগ্ধ দুর্গত জীবের পরমার্থ জগতের পথ নির্দ্দেশ করিয়া পরমোপকার সাধন করে। প্রেম ভক্তির বিমল জ্যোৎস্নায় অমানিশার তমঃ আবরণ ঘুচাইয়া পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে। তাহারাই পৃথিবীর জীবনী শক্তি। পৃথিবী তাহাদের কৃপাতেই অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। তাহাদের অবস্থানে পৃথিবী সুখ-স্থান বলিয়া আদৃত হইতেছে, নতুবা এই শ্মশান-পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়া কেহই সাধ করিত না।

অতএব, আমার মত মন্দভাগ্য জীব যদি কেহ থাকেন তবে আসুন! আসুন, সৌহার্দ্দের বিনোদবাহু প্রসারণ পূর্ব্বক মধুর অলিঙ্গনে এক হইয়া প্রেমানন্দের অতল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ি। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় নিচয়কে অন্তর্ম্মুখীন করিতে বদ্ধ-পরিকর হই। চতুর্দ্দিকের অনন্ত গুরুমূর্ত্তি আমাদের সহায় হইবেন। উপদেশের মোহন ইঙ্গিতে—

প্রেম ভক্তি সরোবরে আনন্দ উৎপল,
মধুরূপী ভগবান্—
এ বিশ্ব জগৎ প্রাণ,
লভিতে মানস ভৃঙ্গে, করিগে পাগল ;—
জীবনের মহাব্রত,
হইবেক উদ্‌যাপিত,—
মানব জনম মোদের হইবে সফল।

আমরা নির্ভয়, নির্ভাবনার অমৃত-ময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়া, এই মর জগতেরও অনরত্বের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে পারিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিত পারিব। জীবন কৃতকৃত্য হইবে।

॥ ওঁ শান্তি ওঁ ॥

পাগ্‌লা।

(শ্রীধীরেন্দ্রভূষণ রায়।)

১

পাগ্‌লা ব'লে ডাকৃত সবে,
চিন্‌ত তারে কে,
জান্‌ত না কেউ কোন গাঁ হ'তে,
কোন্ অজানা অচিন্ পথে,
বুড়ো শিবের বটতলাতে,
কিসের তরে যে—

উল্টো রথের দিনের শেষে,
উদাস চোখে মলিন বেশে,
গাড়লে বেছে হঠাৎ এসে,
আস্তানাটী সে।
দায় পড়েছে লোকের ভারী
সে সব খবরে।

২

আদর ক'রে যেই-যা তারে
দিত, সে তা' খেত,
পেটের দায়ে ভিখের তরে,
কোন লোকের বাড়ীর দ্বারে,
ঠিক্ যেন সে জিদের পরে,
কভু নাহি যেত;
এত দেমাক্ যে পাগ্‌লার,
তারে কে রোজ যোগাবে আর,
জলই শুধু সম্বল তার,
মাঝে মাঝে হ'ত।
সব তেয়াগী, বিষম জেদী,
এ কি তার ব্রত॥

৩

কাছেই নদী, অপর পা'রে
ধূ ধূ জ্বলে চিতা;
পাগল ভাবে সজল চোখে,
কোন্ সুদূরে কোন্ সে যুগে,
কেটেছে তার অনেক সুখে,
ছিল মাতা পিতা;

রাজার মত বিষয় কড়ি,
মস্ত দালান অনেক গাড়ী,
লোক জনেতে বোঝাই বাড়ী,
ছিল প্রিয়া সীতা।
একটি ক'রে সব খেয়েছে
ঐ সে কাল্ চিতা ॥

৪

ওপার পানে ছিল যে তার
চেয়ে থাকা কাজ,
চুপ্‌টি ক'রে থাকৃত তথা,
কইত না সে অধিক কথা,
জাগ্‌লে প্রাণে গভীর ব্যথা
যাতে হানে বাজ,
লাফিয়ে গিয়ে পড়্‌ত জলে,
সাঁত্‌রে নদী কিসের বলে,
উঠ্‌ত গিয়ে অপর স্থলে,
পুণ্যভূমি মাঝ।
শ্মশান ভূমি সার যে তার
হ'য়েছিল আজ ॥

৫

দেবীর পূজা বোধন আজ,
চারিদিকে হাসি,
আজ সন্ধ্যায় সবাই মিলে,
উৎসবটা জাগিয়ে নিলে,
মহামায়ায় সাজিয়ে দিলে,
ফুলের রাশি রাশি ;

কে কার আজ খবর রাখে,
বাঙলা জুড়ে ডাক্‌ছে মাকে,
গভীর সেই প্রাণের ডাকে,
বাজে যেন বাঁশী।
পাগ্‌লা নিল ডেরা তখন
শ্মশানেতে আসি॥

৬

এম্‌নি রাতে এম্‌নি স্থানে,
হারিয়েছিল সে
যার বাঁধনে ঘরের মাঝে,
আস্‌ত ছুটে সকল কাজে,
যার অভাবে ভীষণ বাজে,
হিয়ার মাঝারে।
সেই যে সীতা তারই ছিল,
কোন্‌ দানবে ছিঁনিয়ে নিল,
বিসর্জ্জনের রোদন দিল,
বোধন রাতেতে।
জীবন হারা দেহের ভারা
বইবে বল কে॥

৭

রইল প'ড়ে ধন দৌলত,
গাড়ী ঘোড়া বাড়ী,
দেখ্‌লে না সে ফিরেও চেয়ে,
চল্‌লো সরু পথটি বেয়ে,
যে দূর দেশে একটি মেয়ে,
দিয়ে গেল পাড়ি;

আজও তার আশাই আছে,
এম্‌নি রাতে শ্মশান মাঝে,
মিল্‌বে তারে বুকের কাছে,
যে গিয়েছে ছাড়ি ;
তাই সে ছুটে চিতার পাশে
বড্ড তাড়াতাড়ি ॥

৮

হঠাৎ যেন ঢুক্‌লো কানে,
কার আর্ত্তস্বর,
চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লে ফিরে,
কল্‌সী প'ড়ে নদীর তীরে,
ওই বুঝি সে যায় গো ফিরে
স্রোতে ক'রে ভর।
সব ভাবনা ফেল্‌লে ঠেলে,
ঝাঁপ দিয়ে সে পড়লে জলে,
তুল্‌লে টেনে অসীম বলে,
নারী মরমর ;
বাঁচিয়ে তা'রে পুলক ভরে
আঁখি ঝরেঝর ॥

৯

যাদের মেয়ে হারিয়ে গেছে,
খুঁজে খুঁজে ফিরে,
যখন তারা রাত দুপুরে,
কি আশঙ্কায় মনটি পুরে,
কল্‌সী দেখে একটু দূরে,
এসে নদী তীরে,—

আঁছ্ড়ে প'ল বাপ মা তার,
বুক ফাটান সুর কান্নার,
প'শলো বুঝি সে পাগ্লার,
কানে গিয়ে ধীরে।
সে বলে হেঁকে, 'খুঁজিস কা'কে
এ মেয়েটা কিরে ?'

১০

মিল্‌লো মেয়ে, ফুট্‌লো হাসি,
কান্না গেল দূরে,
মেয়ের কাছে আনসে সবে,
পাগ্‌লা থেকে বাঁচলে তবে,
এ পাগ্‌লাকে দিতেই হবে,
খেতে ভরপুরে ;
যাবার বেলা—কোথা পাগল ?
নেইত সে যে পাবে নাগাল,
হাসির পরে কান্নার দোল,
দিয়ে গেল ঘুরে।
পাগ্‌লা গেছে ঝুলিটা আছে.
বটের সে ঝুরে॥

নারীর স্থান।

(শ্রীসতীপ্রসাদ কর।)

যখন বাঙ্গালী ধর্ম্মকর্ম্ম বিহীন, অবসাদ গ্রস্থ জীবন লইয়া মোহ-সাগরে কেবল হাবু ডুবু খাইতেছিল, অতীতের স্মৃতি কথা যখন আর তেমন ভাবে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে না পারিয়া কেবল মাত্র "ঘুম পড়ানী মাসী পিসী"র উপকথায় সুবোধ শিশুর ঘুম আনিবার জন্য ঠাকুরমার মুখেই তন্দ্রা জড়িত স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল, তখন কাহার যেন মর্ম্মস্পর্শী বাণী ঘরে ঘরে নারী জাগরণের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাতে কেহ জাগিল, কেহ জাগিয়া একবার মাত্র চাহিয়াই পাশ ফিরিয়া আবার শুইল। যাহারা জাগিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠিক সোজা হইয়াই দাঁড়াইল, আবার কেহ হঠাৎ জাগিয়াছিল বলিয়া দাঁড়াইয়াও নিদ্রালসে ঝিমাইতে লাগিল। আহ্বানটা কর্ণকুহরে ভাল করিয়া প্রবেশ করিল না। কেহ বা 'হরিহে দীনবন্ধু' বলিয়াই হাই তুলিয়া আবার ঘুমাইল। যাহারা দাঁড়াইয়া ঘুমের ঘোরে আহ্বানটা শুনিল, তাহারা তাহার বিকৃত রস গ্রহণ করিয়া একটু হাসিল। 'কাল' আপনার কার্য্য আপনি করিয়া যাইতে লাগিল।

ঠিক এমনি করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরীর নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের প্রেরণায় বিশ্ব-বিজয়ী ধর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে বুদ্ধদেবের হৃদয়, শঙ্করের বিদ্যা এবং শৈব-শক্তি লইয়া ভগ্নী নিবেদিতা প্রভৃতিকে পৃথিবীর সম্মুখে নারী জীবনের আদর্শ করিয়া দাঁড় করাইলেন। মহাত্মা রামমোহন, বিজয়কৃষ্ণ, কেশব সেন সেই একই বাণী কাল বৈশাখীর রুদ্রমূর্ত্তিকে সংযত করিয়া ধীর, স্থির, শান্তভাবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচার করিল। তুমি নাক সিট্‌কাও ক্ষতি নাই, যে কাল যাহা চায় তোমাকে অবশ্যই তাহা দিতে হইবে। কেবল আত্মাহীন ফলপ্রসূ বৃক্ষ বলিয়া এখন আর তাহাকে ধামা-চাপা দিয়া রাখিলে চলিবে না। তাহাকে নিজের পায়ে দাড়াইবার চেষ্টা করিতে দাও। নচেৎ হিন্দু! তুমি যে মরিতে বসিয়াছ, নিশ্চয় তোমাকে মরিতে হইবে, কেহ

তোমাকে বাচাইয়া রাখিতে পারিবে না। যে শাস্ত্র কখনও নারীকে অমানুষ বলিয়া মানবের সম্মুখে ধরে নাই, যে শাস্ত্র কখনও নারী পীড়ক ছিল না যেখানে—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

সেই হিন্দু শাস্ত্র আজ নারী পীড়ক হইয়া মানব মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। এস, শত শত বৎসরের সেই আবর্জ্জনা গুলিকে অপসারিত করিয়া যতদূর পারা যায় পুনঃ সংস্কার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। যথা সম্ভব সংস্কারের বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বসিয়া বসিয়া নাক মুখ সিঁটকাইলে কাজ হইবে না।

তুমি আহ্বান ভাল করিয়া শুনিতে পাও নাই, বিকৃত রস গ্রহণ করিয়াছ। ঘুমঘোরে যাহা শুনিয়া তুমি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে নারী জাতীর স্বাধীনতার অলীক স্বপ্ন দেখিতেছ, তাহাতে তোমার জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে না। তুমি যে সভ্যতা, যে স্বাধীনতা নারীকে দিতে যাইতেছ, তাহাতে ইডেন্ গার্ডেনের নিভৃত; কুঞ্জে প্রেমালাপ রত প্রেমিক যুবক যুবতীরই সৃষ্টি হইবে। তুমি যে আদর্শে নারীকে শিক্ষিত করিবার বাসনা করিয়াছ, তাহাতে বিএ, এম এ, পাশকরা প্রেমিক বধূরই সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। তুমি যে আদর্শ লইয়া জাতীকে সমাজ ও রাজ নৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছ, সেই আদর্শে বিলাতের *Suffragette*দের বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতাই আসিবে, তাহাতে অহল্যা বাঈ কিম্বা দেবী চৌধুরানীর জন্ম হইবে না। তুমি যে আদর্শ ধরিয়াছ, তাহা কার্থেজের সহিত রোমের এবং আর্গসের যুদ্ধে নারীর দৃঢ়তা, সে স্বদেশ-প্রেমিকতা আনিবে না, তাহাতে কেবল ভোগ বিলাসের দৃঢ় স্রোতই প্রবাহিত হইবে। হিন্দুর যে দোষটুকু অবলোকন করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকে নারীজাতির পরম শত্রু বলিয়া গল্পে, গানে, কবিতায় এবং বক্তৃতায় তুমি যে কুৎসা রটনা করিতেছ, সেই হিন্দুর ঘরেই সীতা সাবিত্রী, খনা, মৈত্রীর মত শত শত বীর-রমণীর জন্ম। তোমার আদর্শে,

তাহাদের ঘরে পর পুরুষের হাতে হাত মিলাইয়া আনন্দ ভোজে নৃত্য করিবার প্রবল বাসনা লইয়া ত.নারীর জন্ম হইবে না। হিংসা ছাড়িয়া দেখ কোথায় তোমার গলদ্। কিপলিন সাহেবের সত্যবাণী তোমাকে কি অক্ষরে অক্ষরে সেই কথা প্রমাণ ক'রয়া দিতেছে না! "The West is West and the East is East, never the twin shall meet".

এই পরিবর্ত্তনের যুগে জগতে আজ সকলেই রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, কত সুনীতি দু.নীতির মীমাংসা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন; কিন্তু নারী-সমস্যার জন্য ত তেমন আগ্রহ কাহারও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যদি বা কেহ একটু সাড়া দিতেছেন, তাহা এমনি ক্ষীণ, এমনি দুর্ব্বল যে বিশ্ব-কোলাহলে, গভীর নিশীথে সারমেয়র করুণ আর্ত্তনাদের মত আপনি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তবে নারি! সত্যই কি তুমি আত্মাহীন জড়পিণ্ড? আচার্য্য বসুর নবাবিষ্কারে বৃক্ষের ত একটা অস্তিত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে, তোমার কি তাহাও নাই? নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা কি তুমি একেবারেই হারাইয়াছ? পরের মুখের দিকে চাহিয়া আর কতদিন কাটাইবে। যাহাদের সাহায্য-আশা, তাহাদের মধ্যেই বা আজ মানুষ কোথায়! প্রভু শ্রীজীব গোস্বামীর দ্বারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, মীরাবাই মধুর-গর্জ্জনে বলিয়াছিলেন— "এই বৃন্দাবনের রাজা গোবিন্দজীউ ছাড়া আর পুরুষ কোথায়? তুমিও ত নারী!"—তবে আবার কাহার আশায় তুমি বসিয়া রহিয়াছ? আলস্যে অনেক দিন গিয়াছে এখন আহ্বান আসিয়াছে, শত অবহেলা শত লাঞ্ছনার প্রাণঘাতী ঢেউগুলিকে তোমার লুপ্ত তেজদ্বারা অপসারিত করিয়া তোমাকে বুঝিতে হইবে, এই বিশাল ভারত-বক্ষে পুরুষের ন্যায় নারী চিরদিনই তাহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া এই পতিত জাতিটাকে এতদিন গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। হিন্দুর শেষ বীর পৃথ্বিরাজের পরাজয়ে সংযুক্তার যে কর্ত্তব্য বুদ্ধি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পৃথিবী আজও ভুলিয়া যায় নাই। জহরের লেলিহান দাবানল শিখা আজও ভারত-নারীর বক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই। বেহুলা সাবিত্রীর কর্ত্তব্য বুদ্ধি আজও ভারতের ঘরে ঘরে উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া বিরাজ করিতেছে। মানস-প্রতিম মিরাবাঈর ভারতপ্লাবন-

কারী হরিগুণ গাথা ত এখনও আকাশে, বাতাসে, নীরব কান্তারে সমভাবেই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য পথে অভিমানিনী চঞ্চলকুমারীর নির্দ্দিষ্ট স্থান ত এখনও ইতিহাস জোর গলায় সাক্ষ্য দিতেছে। নারি! তোমার স্বতন্ত্র স্থান লইয়া তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে।

নারী জাগিবে। এতে পুরুষ! তোমার হিংসা করিবার কিছুই নাই। নারী ত কেবল উপভোগের জিনিষ নয়। সংসারের অনাটন ও দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়া অনন্ত কাল একটানা ভাবে জীবন যাপন করিয়া নীরবে সকল জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্যই তাহার জন্ম হয় নাই। কেবল রন্ধনশালার অন্ধকার কুঠরিতে বন্ধ হইয়া থাকিবার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। কেবল অসূর্য্যম্পশ্যা নারী হইয়া সেত চিরকাল থাকিতে পারে না। যাহা অতীতে কোন দিন হয় নাই, বর্ত্তমানেও তাহা কখন হইতে পারে না। যে কাল যাহা চাহিয়াছে, তদনুযায়ী তাহা সে করিয়াছে। এখন বুঝিতে পারিয়াছে, তাই তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে কোন্ এক অজ্ঞাত যন্ত্রীর নিপুণ অঙ্গুলি সঞ্চালনে অতি সুমধুর তানের স্বরলহরী তালে তালে বাজিয়া উঠিয়াছে। এখন পুরুষ! তুমি তোমার পথে চলিয়া নারীকে তাহার স্বতন্ত্র পথের অনুসন্ধানে সাহায্য কর। চিন্তার কোন কারণ নাই। তোমাকে একাকী ফেলিয়া তাহারা সরিয়া দাঁড়াইবে না। তোমাকে দূরে রাখিয়া তাহারা নিশ্চিন্তে হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিবে না। তাহারা তোমার পশ্চাতে তোমারি বাহুতে, তোমারি হৃদয়ে একটা অনন্ত শক্তি একটা অনন্ত তেজ লইয়া ছায়ার মত অনুসরণ করিবে। যে শক্তি একদিন গৃহ হীন শ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত রাণা প্রতাপ সিংহের প্রাণে চিতোর জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল; আপন হাতে স্বামী পুত্রকে রণ সাজে সজ্জিত করিয়া যাঁহাদের শক্তি শৈলেশ্বর-মন্দিরে পূর্ণমূর্ত্তিতে বিকাশ প্রাপ্ত হইত; আজও সে শক্তি লইয়া তোমাদের অনুসরণ করিবে। ইহাতে ভয় বা চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। নারী চিরদিনই নারী হইয়া পুরুষের সেবা করিবে। তোমাকে নীচে রাখিয়া সে কদাপি তোমার মাথার উপর উঠিবে না।

নারীর নির্জীবতা দর্শনে প্রথমতঃ হয়ত তোমার মনে একটু গণ্ডগোল আসিতে পারে; কিন্তু এ নির্জীবতার কারণ তোমরাই। তোমরাই তাহাকে

ভেদবুদ্ধি দ্বারা এমন একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে আজ তাহারা শক্তিহীনা হইয়া নিজের অস্তিত্বকে হারাইতে বসিয়াছে। তাহারা নিজের কোন একটী শক্তির উপরই এখন আর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছে না। এমনি অন্ধকারের মধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; এখন তাহারা উন্মুক্ত আলোর পানে মোটেই তাকাইতে পারিতেছে না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ির রাজপ্রাসাদে নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও মহারাজ কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া এক পতিতা নৃত্যকারীর আকুল কণ্ঠনিঃসৃত সুললিত পদাবলী শ্রবণে প্রীত ও ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন "গান শুনিয়া ভাবিলাম এই আমার সন্ন্যাস, আর এই স্ত্রীলোক পতিতা নারী, এ ভেদ জ্ঞান ত আজও যায় নাই। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি কি কঠিন! মা! আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতে ছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।" আজন্ম ব্রহ্মচারী বিশ্ব বিজয়ী ধর্ম্মবীর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটা পতিতা, মানব সমাজের নিকৃষ্টতম জীব, সেই ঘৃণিতা বার বিলাসিনীর নিকট হইতে যে, আদর্শ টুকু লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেও দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন না। যাহার ভাবোচ্ছাসিত কণ্ঠের প্রতি ছন্দটী অগ্নি শিখার ন্যায় স্বামীজির ভেদ বুদ্ধিকে বিদ্ধ করিয়া বলিয়াছিল "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" সেই স্থলে এই পতিতা নারী ত ছার, এমন অনেক মাতৃস্থানীয়া শক্তিময়ী দিগকে ভেদ বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে এমন ভাবে আমরা চাঁপিয়া বসিয়া আছি, যাহাদের শক্তির কণামাত্র বিকশিত হইতে পারিলে হয়ত এই দুঃখ দারিদ্র জরাজীর্ণ ভারত আবার ধন ধান্যে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিত।

অতএব দেশের এই দুর্দ্দিনে, দুর্ভিক্ষ নিষ্পেষিত আর্ত্ত ভীত মুমূর্ষ দেশবাসীকে নূতন প্রাণে জাগ্রত করিবার জন্য তাহার হস্তে যে মস্ত একটা কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আজ তাহার ক্ষুদ্র স্রোত লইয়া বিশ্বের অনন্ত স্রোতে তাহাকে মিশিয়া যাইতে হইবে। আজ আবার উদার দৃষ্টিতে বিশ্বের আপাত প্রতীয়মান বিরুদ্ধ শক্তি নিচয়ের বিরুদ্ধ কর্ম্মাবলীর মীমাংসা করিতে হইবে। তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে যে সে দুর্ব্বলা নারী নয়, তাহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত তেজ সুপ্ত রহিয়াছে। তাই

বর্ত্তমান যুগের পুরুষ শ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "আমি আগাগোড়াই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি যে, ধর্ম্ম এবং সহিষ্ণুতায় নারী জাতি সকলের উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মিমাংসার পর যখন প্রকৃত কাজ আসিবে, তখন জাতীয় জীবন গড়িতে মেয়েদের সাহায্যই একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইবে। তখন ভগবান নিজেই আমাদের অন্তঃপুরের অন্তরাল ভাঙ্গিয়া দিবেন।"

অনেকের ধারণা নারীজাতি স্বাধীন হইলে তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দুর্ব্বলতা আসিতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার সহিত চরিত্রের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা অধিক পরিমাণে স্বভাবের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত স্বাধীনচিন্তা-পরায়ণা নারীজাতির মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধিক সমাবেশ হইতে দেখা যায়। যদি জোড়-গলায় কেহ তর্ক করিতে চান, তবে তাহাদের উত্তরে আমি পূজনীয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কথা পুনরায় উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি "অসূর্য্যম্পশ্যাদের মধ্যে দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন পাওয়া যায়, যার ফল আমরা পথে ঘাটে দেখে শিউরে উঠি।" তাই অতশত চিন্তা করিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবে না। বর্ত্তমানে যাহা অভাব তাহাই পূরণের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। জাপান যখন নারীজাতিকে উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দিল, তখন তাহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে নাই, দেশ তাহাতে অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া যায় নাই, তাহাদের অমূল্য রত্ন সতীত্বের গায়ে আঁচরটুকু কেহ দিতে পারে নাই। জাপান আর কয় দিনের, কিন্তু অনন্ত যুগ ব্যাপিয়া যাহাদের সভ্যতা, যে আদর্শ এক দিন সামগানে ও বেদ পাঠে পরিস্ফুট হইয়া জগৎবাসীকে মুগ্ধ করিত, আজ সেই আদর্শই যদি নৈতিক চরিত্রের দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, তবে আমি মনে করি সে জাতির মৃত্যুই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বভাব কোন প্রথাকেই মানিয়া চলে না। সেখানে সামাজিক বন্ধন শত দৃঢ় হউক না কেন, কিছুতেই তাহা টিকিতে পারে না। যুগে যুগে কত প্রথা, কত ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে; কিন্তু মানবের স্বভাব যাহা তাহাই থাকিয়া যাইতেছে। এ স্বভাব স্বাধীন হইলেও যেমন

নির্ব্বিকার শত বন্ধনের মধ্যেও তেমনি, তাই বলিয়া যুগধর্ম্মকে অমান্য করিয়া কেহ চলিতে পারে না; বোধ হয় কোন দিন পারিবেও না। এস নারি তোমার উপযুক্ত স্থান তুমি নিজেই বাছিয়া লও। তোমার অমূল্য সতীত্ব রত্ন, তোমার একনিষ্ঠ পতিভক্তি, তোমার সভ্যতা, তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেশে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে। এস; ধর্ম্মকে লক্ষ করিয়া সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা বিরোধী অবিরোধী যাহা আমাদিগকে দুঃখ দারিদ্রের করাল কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্যে জীবন পণ করিয়া লাগিয়া যাও। সামান্য ওকালতি, কাউন্সিলের সদস্যপদ সে ত হাতের মুঠোর ভিতর; এগুলি আপনি চলিয়া আসিবে। উহার জন্য সময় নষ্ট করিয়া বৃথ শক্তি ক্ষয় করিলে কোন ফল হইবে না। এস, আজ শত শত, আর্ত্ত পীড়িত গ্রাম বাসী তোমাদের দিকে চাহিয়া আছে; শত শত শিশু, দুঃখিনী মায়ের কোল শূন্য করিয়া দলে দলে অকাল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, শত শত পুত্রহারা মায়ের করুণ আর্ত্তনাদে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; এস, আগে তাহাদিগকে রক্ষা করি। সমাজ, তাহাতে পুরুষের যেমন তোমারও তেমনি অধিকার আছে। তুমিও একজন কর্ত্রী হইয়া সমাজ প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করতে পার। কোন বাধা মানিও না, তোমার নিকট যাহা সত্য ধর্ম্ম তাহা অবশ্য করণীয়। ইহার জন্য পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিঘ্নকে অবহেলায় অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্যে অটল থাকিতে হইবে। দেখিবে তোমাদের আদর্শ লইয়া এই মরন্মোখ জাতিটা আবার নূতন প্রাণে সঞ্জিবীত হইয়া উঠিয়াছে। তখন আর কেহ বলিতে সাহস করবে না যে, নারীর জাগরণে, নারীর শিক্ষায় জাতির ধর্ম্ম কুল মান সম্ভ্রম সব রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। তখন সমস্ত বাকবিতণ্ডা অতিক্রম করিয়া তোমাদের মহিমা আপনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, হিংসার দেওয়াল আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তখন যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া মানব দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া গাহিবে:—

বিদুষী মৈত্রী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহুবীর বালা বীরেন্দ্র প্রসূতি;
আমরা তাঁদের সন্ততি।

কোন্‌টা আগে ?

(শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু)

সমাজ-দেহের জোঁক ।

ওরে, স্বরাটশূন্য স্বরাজকামী, দুঃখ যে তোর চারিধার ।
ঘুচবে কি সব, পাস্‌ যদি তুই রাষ্ট্রনীতির অধিকার ?
শাসক সাথে দ্বন্দ্ব তোদের, নিজেদের নেই সহযোগ ;
জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহে ঢুকছে তোদের নানা রোগ ।
শান্তি-নিলয় পল্লী ছেড়ে কল্লি বাসা সহর মাঝে,
পিশ্‌তে কলম, চাট্‌তে ধুলা, ধোঁয়া খেতে সকাল সাঁঝে
তোর অভাবে গ্রামগুলি সব এক হয়ে যায় শ্মশান-সাথে ।
ছেলের পালে ব্যাধির তরে দিচ্ছে তুলে যমের হাতে ।
শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুর-নদী,—কুকুর তারও শুষ্ক জিভ্‌,
চামচিকা বাস মন্দিরে সব, বেলপাতা আর পায়না শিব ।
কারোর দ্বারে অতিথ্‌ এলে দেখিয়ে দিচ্ছে অন্য বাড়ী,
অন্নসত্রে আজকে সে কাঁদছে বসে শূন্য হাড়ী ।
নর-নারী পড়ছে লুটে মরণ-রথের চাকার তলে ;
দিবস রাত্র শ্মশান-বুকে চিতাই শুধু ধূ-ধূ জ্বলে ।
ঘরের পাশে ঝোপ-ঝাড়েতে সাপ্‌-শিয়ালে নিচ্ছে বাসা ;
পল্লী-রাণীর কুঞ্জখানি মন্দ শোভায় দেখায় খাসা !
ম্যালেরিয়া ওলাউঠা, প্লেগ বসন্ত মহামারী—
শমনরাজের টেক্স আদায় কচ্ছে সেথায় বাড়ী-বাড়ী !
পুঞ্জে পুঞ্জে মশা-মাছি গুঞ্জরিয়া বেড়ান্‌ সেথা ;
(দেশোদ্ধারের চাঁদা আদায় কচ্ছে হেথায় দেশের নেতা !)
হাতুড়ে আর অশিক্ষিত বদ্যি যত বিদ্যানিধি,

দিচ্ছে বড়ী নাড়ী টিপে, 'পার্কাসানে'* দেখচে হৃদি।
রোগীর রুধির শুষ্‌ছে রোগে, তারাও শোষে অন্যধারে;
রোগ যদিও দয়া করে, ডাক্তারে তার দফা সারে।
উকিল, বদ্যি—এঁদের মত তিল্‌কে কে তাল কর্ত্তে পারে?
মারেন এঁরা ধনে-প্রাণে চাপেন্ যখন যাদের ঘাড়ে!

মাতার অজ্ঞতা শিশুমৃত্যুর কারণ।

বিধির বরে আতুড় ঘরে বাঁচলে শিশু পেঁচোর হাতে,
আটকৌড়ে ও ষষ্ঠীপূজার ধুম লেগে যায় আঙ্গিনাতে;
দুমাস পরেই শুকিয়ে আসে মায়ের স্তনে স্তন্যধারা,
গাভীর দুগ্ধ শঠির পালো খাওয়াতে হয়, নেইক চারা;
প্রহর মধ্যে পাঁচটী দফায় শিশুর আহার হতেই হবে,
সাধ্য কি যে তার বিরুদ্ধে একটীও কেউ কথা কবে?
মুখের মধ্যে ঝিনুক ঠেসে ঢক্‌ঢকিয়ে দুধ খাইয়ে,
হাসি মুখে মরেন মাতা সোনার বাছার বালাই নিয়ে;
হজম করা দূরের কথা, দুধের সাগর পেটেয় ধ'রে—
রাখতে যদি না পেরে সে হড়হড়িয়ে বমন করে,
'আলাই-বালাই-ষাট'—বলে মা আবার দুগ্ধ খাওয়ান তারে;
এই ক'রেত পেট রোগা হয়, লিভার বাড়ে মাসেক চারে।
'অন্নপ্রাশন' শেষ হ'লে তার দুবেলা ভাত চল্‌তে থাকে,
বিলাতী ফুড, চুষি মিঠাই—কতই চলে ভাতের ফাঁকে।
এই ভাবে হয় শিশু পালন বাংলা দেশের প্রতি ঘরে,
এই ক'রে ত কাঁচা বংশ ঘুণ ধ'রে হায় নুইয়ে পড়ে।
বাঙ্গালী মা'র পাঁচ বছরের কোল্-জোড়া ধন আঁচল নিধি,
দু'পা রাস্তা হাঁটতে গেলেই—দুর্‌দুরিয়ে কাঁপে হৃদি;

হাত পা পাছে ভাঙবে ব'সে থাকবে খোকা ঘরের কোণে,
(এমনি ক'রেই রসাতলে যাচ্ছে ছেলে মায়ের গুণে !).

শিক্ষার পেষণে বালকের সর্ব্ব প্রকারের অনিষ্ঠ।

হাতে খড়ি হ'লে বাছার ঢোকেন সুখে বিদ্যালয়ে,
'বিদ্যাভুতুম্' হবেন তিনি সেক্ষপীরের পরিচয়ে।
নেল্‌সনাদির জীবন-চরিত, গ্রীসের পুরাণ, রোমের কথা,
হেন্‌রী রাজার কোন্ স্ত্রী ছিল সবার চেয়ে পতিব্রতা,
জ্যামিতি আর ত্রিকোনমিতি, বীজগণিতের আশীষ্-রাশি,
বইতে মাথায় শুকিয়ে আসে বাছার মুখের মধুর হাসি।
রামায়ণ আর মহাভারত, বেদ-বেদাঙ্গ রইল প'ড়ে—
'বটতলা' আর 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী'র গুদাম ঘরে ;
'শ্রীরামচন্দ্র কাহার জায়া, সীতা ছিলেন কাহার ভাই' !—
অনেক ধাড়ী খোকার মধ্যে এরূপ প্রশ্নের অভাব নাই !
স্বাস্থ্য-নীতি, স্বদেশ-প্রীতি, দেশের ইতিবৃত্তগুলি—
বিদ্যালয়ের কাজীরা সব যত্নে রাখেন শিকেয় তুলি।'
"স্বাস্থ্য খোঁজে আস্ত গাধায়, ভজে কেষ্ট-রাধা-রাম ;
বাস্তবের এ 'মডার্ণ' যুগে পুরাণ-কথার নেইক দাম।
ও-সব রেখে ম্যাথু-মিলের ক্যান্ট-মেকলের ভক্ত হ'লে ;
কিছু না হোক্ সবার মাঝে উপাধি-হার গলায় দোলে"—
এই ব'লে যে উচ্চ-শিক্ষা করতে ছোটে কত ছেলে !
প্রাণ কাঁদে হায় বেচারীদের শেষ অবস্থা ভাবতে গেলে !
ছাত্র চেয়ে পাঠ্য বইয়ের ওজন অনেক বেশীই হবে,
সরস্বতীর ব্যবসাদারী এমনটী আর কোথায় ভবে।
ধর্ম্মনীতি বিবর্জ্জিত যে শিক্ষালয় তৈরী করে—
কেরাণী-পাল, উকিল, দালাল, শাসক দলের সুখের তরে,
গরীব পিতার মুদ্রা চোষে, ছেলের শোষে রক্ত যে—
কর্ম্মনাশা শিক্ষাদাতার ঘুঘুর বাসা পুড়িয়ে দে।
অর্দ্ধ জীবন দুঃখে কষ্টে অনিদ্রা আর অশ্রুজলে,

হয় কাটাতে যার সেবাতে পাষাণ কঠিন চরণ তলে,
যাহার কৃপায় দুধের বাছায় অজীর্ণ ক্ষয় ধ'চ্ছে ঠেসে ;
যাহার তুলি ফেরায় 'কলি' অনেক যুবার কালো কেশে,
যাহার তরে দেশের দশের ভবিষ্যতের আশা স্থল—
হচ্ছে কৃশ, কাণা, কুঁজো, বধির ব্যাধির বিন্ধ্যাচল,
পূজাতে যার প্রতি মন্ত্রে হচ্ছে দিতে স্বর্ণাঞ্জলি,
খড়্গা যাহার বছর বছর হাজার শিশু দিচ্ছে বলি,
চিনিয়ে জগত, স্বরূপ দেখতে কৌশলে যে রাখছে বাকী,
মনুষত্ব হরণ ক'রে গড়ছে খাঁচায় তোতাপাখী ;
যাহার দয়ায় দ্বারে দ্বারে কলম পেশা রুটির তরে,
শুষ্ক মুখে বি, এ, এম, এ, বিফল হয়ে ঘুরে মরে,
যাহার ফন্দী—স্বাধীন চিত্ত বন্দীশালে বদ্ধ করা,
ভাবিস্ কিরে এখনও তার পূর্ণ হয়নি পাপের ভরা ?
ভাঙরে তারে কঠিন হাতে, নূতন ক'রে আবার গড় ;
স্মৃতি শিক্ষা, স্বাস্থ্য দীক্ষা, নৈব ভিক্ষা প্রচার কর !

নারীর শোচনীয় দুরবস্থা।

দেখরে চেয়ে অন্যদিকে পল্লীবালার মলিন মুখ ;
পল্লী সাথে তারও আজি ফুরিয়ে গেছে সকল সুখ।
লোকাচার আর সমাজ-শাসন, কুসংস্কার দেশাচার,
সর্ব্বোপরি রোগের জ্বালা ছিড়ছে তাদের প্রাণের তার।
একে একে নিভছে তাদের ঘরের আলো, জীবন তারা ;
চক্ষে ঝরে সলিল-ধারা—হ'চ্ছে স্বামী-পুত্র হারা।
অর্দ্ধাসনে এক-কাপড়ে কাল কাটাচ্ছে সীমন্তিনী ;
তাদের প্রাণের হাসির উৎস শুকিয়ে গেছে অনেক দিনই।
বারোয় যাদের হচ্ছে বিয়ে, তেরোয় তাদের কোলটী যোড়া ;

বছর-বছর যে না বিয়োয়, সে নাকি হয় কপাল-পোড়া !
সমাজ- বুড়োর চোখ ফুটাতে মর্‌ল কত স্নেহলতা,
তবুও কই ঘুচল না ওই বিরাট-পাপের পণ প্রথা।
দশ বছরেই পড়্‌লে মেয়ে বাপের শিরে বজ্র হানে ;
নিঠুর পিতা এখনও দেয় দুধের মেয়ে গৌরী-দানে।
দুদিন পরেই স্বামী কেমন ভালো ক'রে চেনার আগে,
থান পরা আর শাঁখা ভাঙার, একাদশীর পর্‌ব লাগে।
বিদ্যাসাগর ছিলেন মূর্খ, তোরাই বড় বুদ্ধিমান ;
পাচ্ছ এখন বাল-বিধবার চক্ষুজলের প্রতিদান !
যেথায় সতীর পুণ্য তেজে কাঁপ্‌ত হৃদয় যমরাজারই,
প্রতি বারো নারীর মধ্যে একটি সেথায় বারনারী।
প্রতি ছ'টি স্ত্রীয়ের মাঝে একটি যেথায় বাল-বিধবা,
স্বামীর পূজায় দিচ্ছে যারা, টাট্‌কা প্রাণের রক্ত-জবা,
মচ্ছে যেথায় হাজার-করা দু'কুড়ি মা আঁতুড় ঘরে,
ইচ্ছা ক'রে বইছে যারা রোগের বোঝা পরের তরে,
প্রতি বছর হাজার হাজার অচিকিৎসায় যমের ঘরে—
নিচ্ছে যাদের জরায়ু রোগ, সূতিকা আর যক্ষ্মা, জ্বরে,
যেথায় বালা জর্জ্জরিতা পিশাচ পতির অত্যাচারে,
(যার অভাবে কেউ এ ভবে সৃষ্টি-রক্ষা কর্‌তে নারে—)
যাদের মরে বন্ধ করে হেঁসেলে আর শয়ন-ঘরে,
অন্ধ যেথায় পুরুষ-চক্ষু নারীর স্বাস্থ্য-সুখের পরে,
সেথায় তাদের দুঃখ দেখে পাষাণ-বক্ষ ফাটে হায় !
শক্তিময়ীর অংশ নারী, দৈন্য কি তার দেখা যায় ?
অথর্ব্ব এই সমাজটারে ভেঙে চুরে নূতন কর্‌ ;
নারীরে দে' শিক্ষা-ভক্তি, হবি যদি শক্তিধর।

জাতি বাঁচিলে তবে স্বরাজ

দেশরে বারেক মনে ভেবে—স্বাস্থ্য সকল সুখের সার ;

বালক-বৃদ্ধ-বণিতারও বাঁচার আছে অধিকার।
আমরা হোলুম গরীব ছোট, জগত মাঝে সবার চেয়ে;
মরছে ভুগে ভুগছে ম'রে দেশের কত ছেলে-মেয়ে।
বড় বড় যুদ্ধে যত লোক মরে তার চেয়েও বেশী,
মারছে মানুষ করাল খড়্গো ম্যালেরিয়া এলোকেশী।
মরছে যত দ্বিগুণ তত থাকছে হ'য়ে জীবন্মৃত;
মরেনি স্ত্রী সতীদাহে—প্রসব-কালে মরছে যত।
ওলাউঠা, ছাম, বসন্ত, প্লেগ, আমাশা, টিটেনাসে,
যায় যদি প্রাণ হাজার লোকের, পাঁচশ লোকে মরছে ত্রাসে!
নিবার্য্য এই ব্যাধির বিষে বঙ্গ-পল্লী উজাড় হ'ল;
ওগো ধনী সহরবাসী, বারেক তোমার মুখটি তোলো!
চাইনা স্বরাজ, স্বদেশী সাজ, দেশের যদি জীবন গেল;
চাই সুশিক্ষা, স্বাস্থ্য ভিক্ষা, সেই দিকেতেই দৃষ্টি ফেল।
চাই উদার মাঠ, গগন ললাট, পানীয় জল বাতাস আলো।
নয়ত খাঁটি দাওয়াই-এলাজ, চাই গ্রামে এক বদ্যি ভালো।
চাই চাষার গান, রমণীর মান, শান্তি-নিদান শিশুর হাসি;
চাই দু'মুঠো দু'বেলা চাল, চাইনা সোনা রূপার রাশি।
চাই নিরোগ সবল দেহ, চাই উঁচু মন, সরল প্রাণ;
তারপরে চাই চরকা নাটাই, তাঁতের মোটা বস্ত্র দান।
'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'—তাইতে আগে বাঁচতে চাই;
জীবন যুদ্ধে শক্তিহীনের হয়না ত জয় কোথাও ভাই।
নিজের গর্ত্ত বুজিয়ে নে'রে পরের ফুটো খুঁজবি শেষে;
রোগের খাজনা থামা দেখি—আস্‌বে স্বরাজ আপনি দেশে।

---

* "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে উদ্ধৃত।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়গোপাল সরকারবর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব পর্য্যায়]   Reg. No. C. 653

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ]   ষষ্ঠ সংখ্যা]

আশ্বিন—১৩২৯ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

ফরিদপুর।

বার্ষিক মূল্য—২৲।   এই সংখ্যা—৹

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৪শ খণ্ড। { আশ্বিন মাস। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারদীয়োৎসবে অশ্রু-বিমোচন।

(শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ)

(১)

যা দেবী ত্রিগুণাত্মিকা শমবিধৌ সংসার সৃষ্টেঃ পুরা
ভূতানাং পুনরুদ্ভবে জনিমতাং রক্তং রজো বিভ্রতী।
জাতানাং স্থিতয়ে পুনঃ করুণয়া সত্ত্বং গুণং সংশ্রিতা
স্থিতানাং প্রলয়ে তমোগুণময়ী সা নঃ সদা রক্ষতু॥

গুণময়ী যেই দেবী সৃষ্টির আদিতে
রজোগুণময়ী যিনি করিতে সৃজন
পালনেতে সত্ত্বগুণ, তম সংহারিতে
সেই দেবী আমাদের করুন রক্ষণ॥

(২)

সেয়ং শরৎ সরসিজানি কদম্বমালা
গুঞ্জদ্‌দ্রবৈঃ শ্রুতি সুখৈর্ম্মুখরায়মালা।
শেফালিকা কুসুমজৈ কলিতৈঃ সুগন্ধৈঃ
আভাতি মোহিত সমস্ত দিগন্তরালা॥

শরতের চারু শোভা যাই বলিহারি
বিকচ কমলে সুধা ভ্রমর-গুঞ্জন।
শেফালি চৌদিকে বাস করি বিতরণ
অমিয়া বরষে কিবা শ্রুতি মনোহারী॥

(৩)

নভসি জলদমালা নির্জ্জলা শুভ্র কান্তিঃ
শরদি জলবিবেলা তোয়রাশের্বিমুক্তা।
ধনিকুলগৃহসঙ্ঘা উৎসবানন্দপূর্ণাঃ
বিভবরহিত গেহাঃ কেবলং দুঃখপূর্ণাঃ॥

—

জলশূন্য মেঘ শোভা সুনীল গগনে
ক্ষীণতোয়া বেলাভূমি অতি মনোহর।
ধনীর আনন্দ, কিন্তু ধনহীন জনে
অভাব ভূজঙ্গ দংশি করয়ে কাতর॥

(৪)

বহতি মৃদুল বায়ুর্গন্ধমাদায় রম্যাম্
সরসিজ বনজাতং মন্দমন্দং প্রভাতে।
বহতি সলিলরাশিঃ স্রোতসেবোহ্যমানো
ন বহতি গৃহভারং কেবলঙ্কার্যহীনঃ॥

—

কুসুম সু[illegible]ভি সহ মৃদুল সমীর
প্র[illegible]তে [illegible]নব[illegible]ত্ত অমৃত ব[illegible]ষে,
একটান স্রোতে জল যায় তটিনীর,
[illegible] কীন চি[illegible]ভা [illegible]হ বি[illegible]বশে॥

(৫)

সলিলনিচয়নাশাৎ ক্ষীণকান্ত্যা যথৈব
পরিণত ফলপত্রৈর্বৃক্ষরাজির্বিনম্রা।
স্বতনয় পরিপোষে চিন্তয়া ক্ষীণদেহা
স্ববহিত গৃহলক্ষ্মীশ্ছিন্নবস্ত্রা বিনম্রা॥

প্লাবন মিলন সুখ বিরহে বিটপী
অবনত শিরে ধরে ফল পুষ্প ধন,
পতির বিরহে যথা সতী মৃতরূপী
অতি কষ্টে করে নিজ তনয় পোষণ॥

(৬)

কেচিৎ ক্রেতুমিতঃ স্বকীয় বিভবৈর্বস্ত্রাদিদ্রব্যং মুদা
দৃশ্যন্তে বিপনৌ গতাহি ধনিনঃ পুত্রাদিভিঃ কাঙ্খিতম্।
কেচিন্নাবিক সংগ্রহেচ শকটস্যাসাদনে তৎপরাঃ
মাসার্দ্ধেহপ্যগতে বিনষ্টভৃতয়ঃ কিং কুর্যুরধ্যাপকাঃ॥

কেহ কেহ রমণীয় পদার্থ-নিচয়
পুত্রের আকাঙ্ক্ষামত
কিনিবারে উন্মত,
নৌকা গাড়ী অন্বেষণে কেহ ছুটে যায়।
মাসার্দ্ধ না যেতে যেতে
শূন্য গর্ভ থলিয়ার
অধ্যাপক বেচারার কি হবে উপায়।

(৭)

দাতা দীনজনে সদাহি সদয়ঃ শাস্ত্রে পুরা বিশ্রুতম্
আঢ্যেসোহপ্যধুনা দয়া ধন পরঃ দীনে সদা নির্দ্দয়ঃ

কালে দৈববসাদসজ্জন রুচৌ সর্ব্বং বিপর্য্যাসিতম্
ত্বং মাতর্জগদম্বিকে ভবধবে দীনে কথং নির্দ্দয়া ॥

'দরিদ্রে করিও দান' শ্রুতির বচন
বিপরীত হেরি এবে,
মায়াতে মুগ্ধ ভবে,
তুমিও কি তাই মাতঃ করুণা কৃপণ ?

(৮)

দেশস্থাঢ্যজনা বিলাসশরণা হিত্বাতু পল্লীপুবম্
রাজ্যান্তে নগরীন্নিশ্রাং প্রিয়তরা মাসেব্য শান্তিপ্রিয়া।
গ্রাম্যানাং ধনরাশি লুণ্ঠন পরাস্তেষাধিপত্যেরতা
ত্বং মাতর্জ্জগদম্বিকে ভবধবে দীনে কথং নির্দ্দয়া ॥

বিলাস বাসনা ধনী করিতে পূরণ
পল্লী ছেড়ে নগরেতে করেন বসতি,
পল্লীর দরিদ্রজনে করিতে শোষণ
বরিষয়ে সদা খর আধিপত্য জ্যোতি।

(৯)

আসন্ যে সদয়াঃ পুরা নিগমপ'ঃ স্বার্থে সদা সংযতা
দীনানাম্ প্রতিপালকা দিবমিতাঃ কূপাদিসংস্কারকাঃ।
তদ্‌বংশ্যাঃ পুনরীদৃশাঃ স্বকরনেষাসক্তিমাত্রপ্রিয়া
ত্বংমাতর্জ্জগদম্বিকে ভবধবে দীনে কথং নির্দ্দয়া ॥

পর হিতৈষিতা ব্রতে হইয়া দীক্ষিত
ভূস্বামী করিত আগে প্রজার পালন,
কালবশে তাঁর বংশে হেরি বিপরীত
তুমি কেন বল মাতঃ নির্দ্দয় এখন।

আগমনী।

(শ্রীশ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী)

ধীরে ধীরে শারদীয়া পঞ্চমী রজনী অবসান হইতেছে। তমসাময়ী মহালয়া অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের সহিত প্রাবৃট কালের তমসাময় নীরদ জালের তিমিরাবরণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। সুনীল নভোমণ্ডলে অনন্ত নক্ষত্রকলিকা ফুল্ল বিক'সত হইয়া জগতের প্রাণে প্রাণে সুধাধারা ঢ'লিয়া দিতেছে, যেন প্রকৃতিরাণী আনন্দময়ী জননীর আগমন অভ্যর্থনার জন্য সুনীল বিরাট অম্বররূপী সাজিখানি অসংখ্য তারকা কুসুমে সজ্জিত করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিবার মানসে স্মিতমুখে অপেক্ষা করিতেছে। ধীরে ধীরে উষারাণী বালার্ক সিন্দুর বিন্দুতে সীমন্তের শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক রাশি রাশি সদ্য বিকসিত কুসুমাভরণে ভূষিত হইয়া পূর্ব্ব আকাশের সীমন্তভাগে আবির্ভূত হইতেছে। কুসুম গন্ধামোদিত মলয় সমীর মৃদুল হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া শনশন স্বনে জগত প্রসূতী আনন্দময়ীর আগমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী-গণের শ্রুতিগোচরে ঘোষণা করিয়া যাইতেছে। নদ নদী সকল বর্ষার উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিয়া কল স্বরে সেই মহাশক্তির গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে সংযত-ভাবে বহিয়া যাইতেছে। শ্রাবণের অবিরল বারিবর্ষণ ও ভাদ্রের প্রখর মার্ত্তণ্ড-কিরণ প্রসমিত হইয়াছে। কোকিলের কূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে আনন্দের অভিনব ধারা প্রাণীগণের ধমনীতে প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষার ক্লান্তি-জনিত অবসাদ দূর করিয়া সরস সতেজ একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস তাহাদের প্রাণে প্রাণে একই সুরে বহিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানব সুখ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া এই অভিনব ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া নিমীলিত নয়নে ভাবিতেছে—"আহা কি আনন্দ!" আজ তাহাদের প্রাণে প্রাণে আনন্দময়ীর আবির্ভাবের প্রাণ মাতোয়ারা লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা শয্যায় থাকিয়াই যুক্ত-করে বলিতেছে "এস মা আনন্দময়ী, সর্ব্বমঙ্গল বিধায়িনী, শিবে! তুমি সর্ব্বার্থ প্রদায়িনী, শরণাগত পালিকা, সর্ব্বভয় বিনাশিনী! আমি তোমার ঐ অভয় পদে প্রণাম করিতেছি। এক বৎসর পরে তোমার এই পুণ্যভূমি

তোমার লীলা নিকেতনে তোমার আগমন প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ যে নীল জ্যোতির্মণ্ডল সুখস্পর্শ সমীরণ পুষ্পাভরণ ভূষিতা বসুন্ধরা, তরুন তপন, নির্ম্মল শশধর, হাস্যময়ী দিগঙ্গনাগণ সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করিতেছে—ঐ দেখ শুভঙ্করী আনন্দময়ী মা আসিতেছেন। এই জন্যই পর্ব্বতে, কন্দরে, সহরে, বন্দরে, পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই একটা অনাবিল আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে। দুঃখী দুঃখের বেদনা সন্তাপী তাপের পীড়ন ভুলিয়া মায়ের আগমন অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছে। আজ সমস্ত ভারতবাসী ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে মঙ্গল শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সহকারে স্ত্রীলোকের হুলুধ্বনির সহিত মাকে বরণ করিয়া লইতেছেন। সহস্র রূপধারিণী ইচ্ছাময়ী দেবী সহস্র সহস্র গৃহে অধিষ্ঠিতা হইলেন। তিনি পাপাসুরগণকে সংহার করিয়া ভক্তগণের দশ দিকের ভয় নিবারণ মানসে দশ হস্তে অসুর ত্রাস অব্যর্থ প্রহরণ ধারণ করিয়াছেন। সিদ্ধি-সাধন কল্পে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও শক্তি সঞ্চালন মানসে শক্তিধর কার্ত্তিককে সহচররূপে সঙ্গে আনিয়াছেন। মোহান্ধকার নাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিস্তার-কল্পে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীকে ও দৈন্য দুঃখ নিবারণ করিয়া ধনৈশ্বর্য্য প্রদান করিবার মানসে ঐশ্বর্য্যরূপিনী লক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে আনিয়াছেন। মহাশক্তি-রূপিনী দেবী স্বয়ং মহাবল মৃগেন্দ্রপৃষ্ঠে দক্ষিণ চরণ স্থাপিত করিয়া বাম চরণে পাপরূপী মহাসুরকে মর্দ্দিত করিয়া পৃথিবী হইতে পাপভয় নিবারণের আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। আজ সম্বৎসর পরে এই পবিত্র পুণ্য ভূমিতে শারদার আগমনে স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যেই সজীবতা জাগিয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘ এক বৎসরের কত আশা-ভরসাপূর্ণ হৃদয়ে মানব এই মহোৎসবের মহাসুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। আজ সত্যই তাহাদের আশা ফলবতী হইল, প্রত্যেকের হৃদয়ে আজ দেবীর পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগদ্ধাত্রী জগতের প্রাণীগণকে নিরাপদাশ্রয় স্বকীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। বৎসরের অপূর্ণ আশা ফলবতী করিবার জন্য বরাভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন—'ভয় করিও না' আমি আসিয়াছি কিন্তু মা! তুমি এবার কি দেখিতে আসিলে? একবার আকুমারী হিমাগার এই সমস্ত ভারতবর্ষটার পানে তাকাইয়া দেখ দেখি এই কি সেই ভারত? যাহার সন্তানগণের রক্তদীপ্ত বদন-মণ্ডল মনীষামণ্ডিত নয়নযুগল, কবিবর সুবলিত যুগল বাহু বৃষস্কন্ধ ও স্ফীত বক্ষঃস্থল দেখিলে হৃদয়ে সুখধারা প্রবাহিত হইত, আজ তাহাদের বংশধরদিগকে সেইরূপ দেখিতেছ কি?

ঐ দেখ চিন্তা-রেখাঙ্কিত বদন বিষাদ-মলিন, কোঠরগত নয়নযুগল, দৈন্য দুঃখ পীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দেহ ভারতবাসিগণ কষ্টে সৃষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। তোমার আগমনের পূর্ব্বে এবারও স্বহস্তে প্রকৃতিকে অপূর্ব্ব শোভা সম্পদে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছ। ঐ দেখ শেফালিকা উৎপলাদি কুসুমনিচয় পূর্ণ বিকশিত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। নীলাম্বরে শশাঙ্কের প্রাণ মাতোয়ারা হাসির সহিত তারারূপসীগণ জগতে হাসির ফোয়ারা সৃজন করিয়া সমস্ত বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে হাসি সম্পদে মাতাইয়া তুলিতেছে। তবে আমাদের প্রাণে সেই হাসির সাড়া পাইতেছি না কেন? তোমার আগমন উপলব্ধি করিতেছি, বালক বালিকার প্রাণে তোমার আগমনের ধ্বনিও শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তো আমাদের হৃদয়ে সেই হাসিধারার কলধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না। জড় জগতে সজীবতার আবির্ভাব পূর্ণ বোধ করিতেছি, কিন্তু আমাদের প্রাণে সেই সজীবতা কোথায়, মা? আমরা কি চিরকাল এইরূপ শক্তিহীন অবসন্ন ছিলাম? তুমি কি তোমার এই পুণ্য ভূমির সন্তানদিগকে চিরকাল এইরূপ অবসাদগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ দেখিয়াছ? মনে পড়ে তোমার সেই সুরথ রাজার কথা, যিনি পুণ্য সলিলা নর্ম্মদার তীরে স্বহস্তে শরীরের উষ্ণ শোণিতে তোমার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। মনে পড়ে সেই কমল লোচন দাশরথি রামচন্দ্রের কথা, যিনি তোমার ছলনায় প্রতারিত হইয়ে স্বহস্তে সুতীক্ষ্ণ সায়কে স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া তোমার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন তুমি আসিতে মানব হৃদয়ে শান্তি ও শক্তি সম্প্রদান করিবার জন্য। এখন তুমি সেই শান্তি ও শক্তি প্রদানে কার্পণ্য করিতেছ কেন মা? তুমি না জগতের প্রাণে প্রাণে সর্ব্বভূতে শক্তি ও শান্তি-রূপে বিরাজ করিতেছ? অনেক দিনের কথা নয় মনে পড়ে সেই ব্রহ্মাণ্ড গিরির কথা, সেই রাম প্রসাদের কথা, যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সর্ব্বদা বিচরণ করিতে। তখন তুমি আসিতে মানব হৃদয়ে ভক্তির পবিত্র প্রস্রবণ সৃষ্টি করিবার জন্য, তখন আসিতে এই ভূলোক স্বর্গ নন্দন কাননে, যখন এই স্থানে শক্তি ছিল, সংযম ছিল সাধনা ছিল। এখন এসেছ মা শ্মশানে, এখানে শক্তি নাই, সংযম নাই, সাধনা নাই; এমন কেন হল মা? এই কি আমরা আমাদের আত্মকৃত দোষের ফলভোগ করিতেছি? ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও শেষ

হয় নাই? প্রকৃতিরূপিনী! তোমার কি একটুও ক্রটী নাই মা? আসিবার প্রাক্কালে তোমার প্রকৃতি রাণীকে কে এমন নন্দন শোভায় পরিণত করে? যাহার ইচ্ছায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ধূলিতে পরিণত হয়, ধূলিরাশি হইতে বিশাল পর্ব্বতের উদ্ভব হয়, সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় কি এই শ্মশান আবার নন্দন কাননে পরিণত হইতে পারে না? আমাদের হৃদয় কি একেবারে নিরস, অনুর্ব্বর মরুভূমি! ইহাতে কি সেই মহাশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় না? ইহাতে কি সেই মহাপ্রাণের উন্মেষ হয় না? একবার তোমার প্রজাপতি প্রদত্ত কমণ্ডলু হইতে পবিত্র সুধাধারা এই মোহান্ধ নিরস জাতির হৃদয়ে ঢালিয়া দাও। এ মরু হৃদয় উর্ব্বরতায় পরিণত কর। তেত্রিশ কোটী দেবতার বিন্দু বিন্দু শক্তির সমবায়ে মহাশক্তি তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা তোমার ভক্ত, কাতর স্বরে আহ্বান করিতেছি, আমাদের প্রাণে সেই শক্তি তিল তিল পরিমাণে সংক্রমিত করিয়া দাও, আমরা পাপ তাপ পীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া ক্রমশঃই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি। এই পতন পথে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে আমাদের হৃদয় সাহসে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদের পতন রোধ করিয়া দাও। একবার পাপাসুর নির্জ্জিত দেবগণকে নিঃশঙ্ক করিবার মানসে ভৈরব রবে যে অভয়বাণী শুনাইয়াছিলে, আজ এই সন্তাপিত ধ্বংস পথগামী জাতীকে নিঃশঙ্ক করিবার মানসে জলদ গম্ভীর রবে আবার সেই অভয়বাণী শুনাইয়া দাও—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদা বতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্
সর্ব্ব বাধা বিনির্ম্মুক্তো ধন ধান্য সুতান্বিত
মনুষ্য মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়।

তবে এস মা সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে!

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যা নিস্বনেন চ।
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে
ভ্রামনেন আত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥

অতৃপ্তি।

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

সন্ধ্যার আবেশময় কুহকস্পর্শে দিনের কল্লোল থামিয়া গেল। স্তব্ধ ধরণীর ম্লানদৃষ্টির সীমান্তরেখায় ধীরে ধীরে কুণ্ঠিত জড়িত চরণে সূর্য্য নামিয়া যাইতেছে, আসন্ন বিদায়ের করুণ চাহনিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, করুণতর শেষ নিবেদন,—"তবে যাই, তবে যাই। দেখিতে দেখিতে দিগন্তের পারে ঐ ডুবিয়া গেল।

ঐ খানেই শেষ হয় না কেন?—চক্রবাল প্রান্তে দৃষ্টি যেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, সেখানে আমার আশাতৃষারও বিলয় হয় না কেন? দিনের পশরা নামাইয়া শ্রান্ত দেহ যখন শান্তি খুঁজিতেছে, তখন মনটা কেন অজ্ঞাত ভুবনযাত্রী ঐ সূর্য্যের সহিত অনির্দ্দেশ আকাশসাগরে ভাসিয়া যাইতে চায়? কেন মনে হয়, এখানকার ঐ সন্ধ্যাসূর্য্য উষার সজীবতা ফুটাইয়া যে গগনে জাগিয়া উঠিতেছে, সে গগন বুঝি আরও ভাস্বর আরও গীতি মুখরিত। পিঞ্জরাবদ্ধ জীব আমি, পিঞ্জরের ক্ষুদ্র পরিসরে আমার আশা মিটেনা কেন? কেন আমি ঐ অসীম নীলিমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া বার বার ব্যর্থ প্রয়াসী হইয়াও পিঞ্জরগাত্রেই পক্ষপুট ক্ষত বিক্ষত করিতেছি?

মানবের জীবনে ইহা বুঝি একটা দারুণ অভিশাপ, সব পাইয়াও তাহার আশা মিটিল না। সুখ সমৃদ্ধি, যশঃ গৌরব, যৌবন স্বাস্থ্য, প্রেম স্নেহ, সবই সে পাইল, পাইল না শুধু পরিতৃপ্তি তাই এত পাইয়াও তাহার হাহাকার ঘুচিল না। নিম্নে সৌন্দর্য্যোচ্ছল বসুন্ধরা, উর্দ্ধে জ্যোতিঃ প্লাবিত অম্বর তল, কিন্তু মানুষের রূপতৃষা মিটিল কই? সকল সৌন্দর্য্যের আধার দয়িতের মধুর মুখখানি তাহারই পানে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া নির্নিমেষ নয়ন দুইটী চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কই? তবুত নয়ন ফিরিতে চাহে না—তবুত নয়ন তৃপ্ত হয় না। এইরূপ-সমৃদ্ধ বিশ্বের পরতে পরতে আবার কি মধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা! উষার আলোক স্পর্শে আকাশের প্রতি পরমাণুটী চঞ্চল করিয়া স্তরে স্তরে যে সুরের ঝঙ্কার নামিয়া আসিয়া

সুপ্ত স্নায়ু জালকে স্পন্দিত চঞ্চল করিয়া তুলে বিহগের সে কণ্ঠস্বর, জ্যোৎস্নাস্নেহ-পুলকিতা তটিনীর সে রহস্যালাপ, শিশুর সে অস্ফুট বাণী, প্রিয়ের সে "মধুর বোল" জীবন ভরিয়া ত শ্রুতি কুহরে অমৃত বর্ষণ করিল, তবু ত "শ্রুতি পথে পরশ না গেল।" বিশ্বের স্তরে স্তরে সৌরভ হিল্লোল; দেহমন বিহ্বল হইতেছে, তবু ঘ্রাণবৃত্তি চরিতার্থ হইল কই? দিকে দিকে রসের উৎস; মানুষ আকণ্ঠ পান করিতেছে; কত মধু যামিনী রভসে কাটিয়া গেল। কিন্তু রস লিপ্সার পরিতৃপ্তি কোথায়? লাখ লাখ যুগ প্রেমাস্পদকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকের উপর চাপিয়া বক্ষের প্রত্যেক কণাটী দিয়া উপভোগ করিলাম, তবু বক্ষঃ জুড়াইল কই? মানুষের ক্ষুদ্র বুকে একি দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা! রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে তাহার অঞ্জলি ভরিয়া গিয়াছে, তবুত এ সর্ব্বগ্রাসী শাহারার তৃষার উপশম হইল না।

কিন্তু কি যে মানুষের স্বভাব, এই অভিশাপকেই সে গৌরব মুকুট বলিয়া বরণ করিয়া লইল, এবং এই গৌরব মণ্ডিত শিরে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনকে আপনার বলিয়া দাবী করিল। অলস তৃপ্তির স্বর্গ সে চায় না, আর চায়না বলিয়াই মানুষ—মানুষ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব। আদিম মানব বনের পশুর মতই বনে বনে বিচরণ করিত। কিন্তু কবে,—সে এক শুভ মুহূর্ত্তে—কোন্ অজ্ঞাত আকাশের জ্যোৎস্না স্পর্শে তাহার হৃদয় সমুদ্র আলোড়িত করিয়া একটী তরঙ্গ উত্থিত হইল। নূতন মহত্তর এক জীবনের আভাস পাইয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেই হইতে তাহার জীবনের স্রোত ফিরিয়া গেল। অরণ্য বাসে তৃপ্ত না হইয়া সে পাতার কুটীর বাঁধিল, মাছ মাংস পরিহার করিয়া আগুনের ব্যবহার শিখিল, সে দিন পশু জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে 'মানবের' স্তরে উন্নীত হইল, বনের পশু বনেই রহিয়া গেল। ক্ষুন্নিবৃত্তির সহিত পশুর আশা আকাঙ্ক্ষাও পরিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার পরমার্থ। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই পশুর জীবন ধারণ; মানুষের কিন্তু জীবন ধারণের জন্যই ক্ষুন্নিবৃত্তি সে উদর সর্ব্বস্ব নয়, জীবন সর্ব্বস্ব। মানুষ জীবন চায়—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যুগব্যাপী জীবন "সুখের বেলা ফুরিয়ে গেছে আমি এখন চলে যাই" ইহা মানব হৃদয়ের চিরন্ত অভিলাষ নহে. ক্ষণিক অবসাদ মাত্র আঁধার ছাইয়া আসিতেছে; তবু তু... ...ধারা সিন্ধুনীরে আশা ভেলায় বুক বাঁধিয়া মানুষ উঠিতে চায়.

. . এই তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ কি শুধুই বাঁচিয়া থাকিবার ... । ...চে থাকাই" কি তাহার কাছে "পরম সুখ ?" শুধু বাঁচিয়া থাকা দিয়াই শুধু বৎসর দিয়াই জীবনের পরিমাণ, কে সে জীবন চায় ? মানুষের জীবন প্রাণ নয়। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য্য প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া উত্থান পতন, আশা নৈরাশ্য, ব্যর্থতা সার্থক্যের উপল বন্ধুর পথে কোটি কোটি যুগের জীবন অতিবাহিত করিয়া সে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধন করিতে চায়। এই প্রণময় তাই তাহার জীবনের সার্থকতা।

দুঃখবাদী দার্শনিক সোপেনহার এই জীবন স্পৃহাকে বিকৃত কল্পনার এক অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া উড়াইয়া দেন। দুঃখময় তিক্ত জীবনটাকে কে সাধিয়া লইতে চায় ? যাও ঐ সমাধি ভূমিতে, যাহারা ওখানে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন, তাহাদের ডাকিয়া সুধাও, তোমরা আবার জাগিতে চাও ? সকলেই মাথা নাড়িয়া বলিবে 'না, না, না।' আর একজন দার্শনিক রহস্য করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছিলেন,—হয়ত মাথা নাড়িবে তাহারা, যাহারা অতি ডিস্‌পেপটীক্ মৃত। নচেৎ কে না চায়, ওগো পারত দাও আমার জীবনটাকে ফিরাইয়া। আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, অতীতের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া আর একবার নূতন করিয়া জীবনের দোকান খুলিয়া বসি।

এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, এই বিপুল জীবন স্পৃহা, জীবনে জীবনে জীবিত থাকিয়া এই বৃহৎ কর্ম্ম চেষ্টা, ইহাই মানবের মহত্ত্ব। মানব মহান্ বলিয়াই তাহার আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধিকে ছাড়াইয়া যায়। পাওয়ার পরেই যদি সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যাইত, তবে তাহার সঙ্গে মনের গতিরও অবসান হইত। কিন্তু মানবের পক্ষে পাওয়াইত চরম নয়। পাওয়ার পরে নাপাওয়ার রাজ্য। অস্তই শেষ নয়, অস্তের ম্লানিমার পরেই ঐ যে অদৃশ্য আকাশে উদয়ের হাস্যচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল। পাওয়ার অপেক্ষা না পাওয়ার, জানার অপেক্ষা না জানার রাজ্য আরও বিপুল ও মধুর। যাহা পাই নাই, তাহার তুলনায় বিশ্বের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ, যাহাতে আমার জীবন পাত্র ভরিয়া উঠিতেছে, উহা ত কণিকা মাত্র। না পাওয়ার বিপুলতার সম্মুখে আমার তুচ্ছ পাওয়া তুচ্ছ সিদ্ধির পরিমাণ কতটুকু ?

আবার কোথায়ই বা সেই না পাওয়ার রাজ্যের সীমান্ত রেখা। কবে কোন

প্রভাতে যাত্রার আরম্ভ হইয়াছে, আজও ত কূলে তরী ভিড়িল না। মনে হয়—ঐ যেখানে নীলাকাশ নামিয়া আসিয়া নীলজলে মিশিয়াছে, ঐখানে বুঝি যাত্রার অবসান, ঐখানে বুঝি আশার স্বপন ফলিবে। কিন্তু যতই চলিতেছি, ততই দেখি আকাশ জলধির মিলন ক্ষেত্র যেমন সুদূরপরাহত ছিল, তেমনই রহিয়াছে। আমার অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত রেখাও সরিয়া যাইতেছে, সৌন্দর্য্যের চরম বলিয়া যাহাকে আকড়িয়া ধরিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া ছিলাম, বক্ষে পাইয়া দেখি, ইহাই চরম নয়। সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য, আরও সৌন্দর্য্য, তারপর আরও সৌন্দর্য্য; আলোর পর আলো, আরও আলো, তারপর আরও আলো; জ্ঞানের পর জ্ঞান, আরও জ্ঞান, তারপর আরও জ্ঞান; উন্নতির পর উন্নতি, আরও উন্নতি, তারপর আরও উন্নতি। দৃষ্টির পরিসর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, শেষে বিশ্বের সীমান্ত ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিশ্বের রূপ. বিশ্বের রস, বিশ্বের সঙ্গীত, বিশ্বের গন্ধ স্পর্শ সব ফুরাইয়া গেল। তবুত না পাওয়ার রাজ্যের সীমা পাইলাম না। ছুটিতে ছুটিতে জীবনের সায়াহ্নও কাটিয়া গেল, তবুত আশা মিটিল না, তবুত চরম সিদ্ধির পরিতৃপ্তি আসিল না। সুদীর্ঘ তীর্থের পথে বাহির হইয়া কত তীর্থ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিলাম, তবু পথের শেষ হইল কই? পথের শেষ কপর্দ্দকটী ব্যয় করিয়া, সামর্থ্যের শেষ কণিকাটী দিয়া বিশ্বের শেষ তীর্থে পৌছিয়াছি। সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে; ক্লান্ত ক্ষীণ নেত্রের উপর ক্লান্ত পল্লবদ্বয় ধীরে ধীরে মুদিত হইতেছে; তবু আবার এ কোন অজানা মন্দিরের শঙ্খ এমন আকুল করিয়া বাজিয়া উঠে? বিশ্বের প্রান্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়া পরিম্লায়মান সন্ধ্যার অবসাদে চির অতৃপ্ত মানব সম্মুখের ঐ নিরুদ্দেশ পথের পানে চাহিয়া আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চিরকাল গাহিয়া আসিয়াছে।

"সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা,'

মানুষ সহস্র বন্ধন সংস্কুচিত সীমাবদ্ধ জীব বটে; কিন্তু হৃদয় তার অনন্ত দেবতার প্রেমে পাগল। যখন সে জড়ত্ব ছাড়িয়া জীবত্বের স্তরে উঠিল, আপনাকে আপনি চিনিল, তখনই সে অসীমের আভাস পাইয়াছে। তাহার মধ্যে অসীমের চেতনা আছে বলিয়াই আপনাকে বিশ্বকে অসীম বলিয়া বুঝিল। সে দেখে জগৎ একটা মস্ত ছায়া বাজী, অনিত্য চঞ্চল, কাল যাহাকে দেখিলাম

আঁখি সে নাই; এই বুকে এখনই যে ছিল পলক ফেলিতে আর তাহাকে পাই না। জীবের এই শুভ মুহূর্তটাকে ধরিয়া রাখিতে চাই; কিন্তু বাহু মেলিতেই অতীতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই চঞ্চল অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বজ্ঞানের পশ্চাতে এক অচঞ্চল অবিনাশী চিরন্তন সত্তার চেতনা আছে বলিয়াই চঞ্চলত্ব, অনিত্যত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্বের জ্ঞান হয়। স্থিরত্বজ্ঞান না থাকিলে গতজ্ঞান সম্ভব হইত না, মুক্তির আস্বাদ না জানিলে 'বন্ধন' বন্ধন বলিয়া মনে হয় না। অসীমের জ্ঞান না থাকিলে বিশ্বকে সসীম বলিয়া জানিতাম না।

অসীম এবং সসীম, আলোক আঁধারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব নয়। সসীমকে বাদ দিলে অসীমের অসীমত্ব খর্ব্ব হয়। সসীমের যেখানে সীমা. অসীমের সেখানে আরম্ভ মনে করিলে, অসীম সসীম হইয়া যায়। সসীমকে লইয়াই অসীম; সসীমের মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া অসীমের সার্থকতা। অনন্তদেব অনন্ত সংচিত (Absolute Idea); বিশ্ব তাঁহারি প্রতিমা, জড় এবং জীব তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ, রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে, সুখে দুঃখে, প্রেমে স্নেহে তিনি আপনাকে লীলায়িত করিতেছেন, সান্ত বিশ্ববাঁশটাকে শত ছিদ্র করিয়া সাহানা বেহাগে, ভীষণ মধুরে আপনার অনন্ত সুর বাজাইয়া যাইতেছেন, বিশ্ব মিথ্যা মায়াময় কৈতব নয়; অসীম যেমন সত্য, আমি যেমন সত্য, বিশ্বও তেমনই সত্য। জড় জীবে একই অনন্ত সংচৎ এর লীলা; তাই জীব জড়কে চিনে, জড় জীবে বন্ধন সংঘটন হয়। তাই জীব জীবকে ভালবাসে। তোমার মধ্যে আমাকে পাই বলিয়াই না তোমায় আমি ভালবাসি। তোমার আমার মধ্যে একই অসীমের সুর হিল্লোলিয়া যাইতেছে, তাই না তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয় খুঁজিয়া পাই।

এই অসীমের উপলব্ধিই মানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। সসীমের বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়াই যেমন অসীমের সার্থকতা, সকল বন্ধন দ্বন্দ্ব বিরোধ ঘুচাইয়া অসীমের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়াই তেমনই সসীমের সার্থকতা। ক্ষুদ্রবদ্ধ মানব ঐ অসীমের আহ্বানে চঞ্চল, তাই সে আপনার পেলব পারাবত পক্ষপুট মেলিয়া অসীম মুক্ত আকাশে ভাসিয়া যাইতে চায়। স্বার্থের অচলায়তনে সে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে ত অসীমের রাজ্যে অসংবদ্ধ, স্বয়ং নিঃসঙ্গ জীব নহে, অসীমের সহিত তাহার সংযোগ, অনন্তের জীবনের সহিত

তাহার জীবন একসুরে বাঁধা, অসীমের সহিত তাহাকে আদান প্রদান করিতে হইবে, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রজীবনে মরিয়া বিশ্বের জীবনে, অনন্তের জীবনে অমর হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাই তাহার নিয়তি। দৈনন্দিন জীবনে দেখি, পদে পদে বিরোধ,—ব্যক্তির সহিত বিশ্বের, ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বৃহত্তর জীবনের, Individual এর সহিত Universal এর বিরোধ। বিশ্বের নিয়মের কাছে আমার মনগড়া ছোটখাট নিয়ম ছিঁড়িয়া টুটিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়। বিশ্বের উদ্দেশ্যের নিকট আমার ব্যক্তিগত সাধ অভিলাষ চিরদিন পরাভূত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছে আমি যাহাকে দূরে রাখিতে চাই,বিশ্বের নিয়মে সেই বক্ষের উপর আসিয়া পড়ে; যাহাকে বক্ষে ধরিতে চাই, বিশ্বের স্রোতে তাহাকেই কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। মানুষ যখন বিশ্বের চরণে আত্মনিবেদন করে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবন ডুবাইয়া দিয়া বিশ্ব জীবনের বিপুলতায় জাগিয়া উঠে,—তখনই এই বিরোধ দ্বন্দ্ব সংশয়ের শান্তি। ক্ষুদ্র জীবন নিবেদন করিলে তবে মহত্তর বিশ্ব জীবনের নির্ম্মাল্য মিলে, তাই মানুষ শুধু আপনাকে লইয়া থাকিতে পারে না। অন্তরে যে অসীমের আভাস পাইয়াছে, তাহারই দুর্ব্বার আকর্ষণে গৃহে সমাজে রাষ্ট্রে বিশ্বে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অসীমের উপলব্ধি করিতে চায়। দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত জীবনে শত শত বার মরিয়া একপদ অগ্রসর হইয়া দুইপদ পিছাইয়া সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্যের সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে মানব সেই অনন্তের জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

অনন্তের জীবনে এই বিরাট পরিণতিই যখন মানবের লক্ষ্য, তখন সসীমে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিবে কেমন করিয়া? অসীমের আহ্বান তাহার মর্ম্মে বাজিতেছে—

"নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেনুম্"

কোন্ যমুনার কূলে, কোন্ নীপতরুমূলে অনন্ত প্রেমিক ঐ মুরলী বাজায়। কেমন করিয়া ঘরের কোণে মন টিকিবে? কুলের গণ্ডীর মধ্যে ছোট-খাট সুখ দুঃখের পশরা বহিয়া অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবন কেমন করিয়া যাপন করিবে? ক্ষুদ্র বিশ্বের কোণে মানব কেমন করিয়া মনটাকে বাঁধিয়া রাখিবে? বিশ্বের রসে রূপে তাহার চিত্ত ভরিবে কেন? সে যে চির রসিক চির সুন্দরকে ধরিতে চায়। তাই ক্ষুদ্রজীবনের ছোট ছোট কামনার সিদ্ধিতে তাহার হৃদয়ের তৃষা

মিটিল না, দুরন্ত অনন্তের আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাহাকে আবার ছুটিতে হয়। ছুটিয়া ছুটিয়া সে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম বৃত্ত অতিক্রম করিয়া শেষে পরিধিহীন অসীমের মধ্যে চরম সিদ্ধি খুঁজিয়া পায়। ভূঃ,ভুবঃ,স্বঃ,জনঃ,মহঃ,তপঃ,সত্য—সর্ব্বলোকের বিপুলতায় তাহার চিত্ত ভরে না, সে যে অনন্তের পিয়াসী, দেশহীন কালহীন অনন্ত জীবনই তাহার পরিণতি। সেই খানেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা, সকল সঙ্গীতের সেই খানেই অবসান, সেই খানেই তাহার চরম শান্তি।

যোগের ফল

(শ্রীধীরেন্দ্রভূষণ রায়।)

১

বি. এ, পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া যতীন যে দিন কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের এক চাকুরীতে প্রবেশ করিল, সে দিন তাঁহাদের গ্রামের অনেকেই তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করে নাই। আবার সে দিন যখন সে হঠাৎ চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া বাড়ী আসিয়া আশ-পাশের জঙ্গল কাটিতে সুরু করিল ও গ্রাম্য স্কুলের মাষ্টারী পদ গ্রহণ করিল, তখন সকলেই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে একমত হইয়াছিল।

যতীনের পিতা রামপতি বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর জেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামে একজন ভয়ানক একরোখা লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা তাঁহার বেশ স্বচ্ছলই ছিল; তদুপরি কুল গৌরবে তিনি নিজেকে কাহারও অপেক্ষা হীন মনে করিতেন না।

যতীনের আর একমাত্র ভগিনী ছিল—চপলা। নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন

এগার বৎসরের ও চপ... বৎসরের রা...

পরলোক গমন করেন, তখন হইতে বিপত্নীক রাসপতি বাবু অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও পুত্র কন্যার দিকে চাহিয়াই আর এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। পুত্রের শিক্ষা বিষয়েও তাঁহার ঔদাসীন্য বা খামখেয়ালীর কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। গ্রাম্য দলাদলিতে তিনি বড় একটা যোগ দিতেন না; আবার যদি কখনও কোন বৈঠকে দৈবাৎ উপস্থিত থাকিতেন, তবে এমন দৃঢ়ভাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে কোন এক পক্ষের প্রতি তাহা অত্যন্ত রূঢ় ও রুচিবিরুদ্ধ বোধ হইত। কাজেই অনেকেই তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না, তবে প্রকাশ্যে কিছুই বলিত না।

সেবার চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী যোগে পুণ্যসঞ্চয় আশায় যখন দলে দলে লোক ব্রহ্মপুত্রাভিমুখে ছুটিল, তখন যতীনও কি খেয়ালে একখানা ধুবড়ীর টিকিট কিনিয়া রেলের সেই 'ন স্থানম্' যাত্রীগাড়ীর মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইল এবং প্রতি গাড়ী বদলের সময় "যায়গা নেই; ওদিকে দেখুন"—'হবেনা মশায়, ম'শায় হবেন।"—"জোর নাকি?" ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে ও অল্প বিস্তর ধাক্কাতেও পশ্চাৎপদ না হইয়া নবমপন্থী দলের একনিষ্ঠ সেবকরূপে কোনমতে টিঁকিয়া পরদিন অপরাহ্নে তীর্থরাজের চরণে উপনীত হইল।

পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত যোগলগ্নের সময় নির্দ্দেশ ছিল। আন্দাজ ৮টার সময় যখন যতীন অবগাহন জন্য প্রস্তুত হইয়া একগণ্ডুষ জল হস্তে—

"ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনো কুল নন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর।"

মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিল, তখন অদূরে জনতার ভিতর হইতে একটি যুবক অগ্রবর্ত্তী হইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "আরে যতীন নাকি? একেবারে যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা কচ্ছিস্ দেখি! এসব আবার কতদিন থেকে ধ'র্‌লি?"

যতীন জলগণ্ডুষ নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিল "নে নে, অত ঠাট্টা কেন, সব রকম ক'রে দেখতে হয় রে। ব'ল তুই ই বা এখানে কেন?—তোর ত এসব বালাই নেই।"

নগেন হাসিতে হাসিতে বলিল "ম'শাইয়েরই যেন পূর্ব্বে এ সব ছিল। আজ ত আমি দেখে অবাক, তাই হঠাৎ তোকে ডাকতে ইতস্ততঃ কচ্ছিলাম। আমার যা ব'লছিস্—ও সব ঝঞ্ঝাট কোন দিন ছিলও না, আজও নেই।

দেখনা কি মুস্কিল মেসোর বাড়ীর মেয়েরা আস্‌বেন পুণ্যসঙ্গম কর্‌তে, তা আর লোক পেলেন না বাবা গিয়ে বল্লেন যে আমাকে যদি সঙ্গে দেন। বাবা ত' জানই, স্বচ্ছন্দে বলে দিলেন 'তা বেশ। এখন তাঁরা ত পুণ্যসঙ্গম ক'রবেন, আমার দেখ্‌ছি ধাক্কা খেতে খেতে সঙ্গম যা' হবে তা বুঝতেই পাচ্ছি! আছে যে প্রাণটা তাও না বার হয়ে যায়।—তা' তুই এলি কবে?"

"কাল। বলি জুনে এম, এ, টা দিচ্ছিস্‌ ত?"—"দেখা যা'ক।"—এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে পুণ্যবারি শিরে স্পর্শ করিয়া স্নানার্থে অবতরণ করিল।

সহসা নিকটে একটা গোলমাল উঠিল—"ওগো কার মেয়ে ভেসে গেল গো!" ও সেই সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দৃষ্টি অকস্মাৎ নিমজ্জমান একটি বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মূঢ় দর্শক লোকগুলির মধ্য হইতে কেহই যখন চিৎকার ছাড়া মেয়েটীকে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই করিতেছে না তখন সন্তরণপটু যতীন কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিকে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। তারপর সে এক জীবন মরণের সংগ্রাম, শেষকালে বালিকার কেশগুচ্ছ ধরিয়া যখন যতীন তাহার চেতনাহীন দেহ কালের কবল হইতে একরূপ ছিনাইয়া লইয়াই কিনারায় তুলিল, তখন শ্রান্তিতে তাহার নিজের দেহ বালুকার উপর এলাইয়া পড়িল।

"এ যে আমাদের কমলি!" বলিয়া নগেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাসীমা তারাসুন্দরী শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তীর্থরাজের কৃপায় অল্পক্ষণের মধ্যেই বালিকা সংজ্ঞা লাভে চক্ষুরুন্মীলন করিল।

"যতীন ভাই! উঠতে পারবে কি?" বলিয়া নগেন যখন গভীর স্নেহে তাহার গাত্রস্পর্শ করিল, তখন যতীন কোন রকমে নিজেকে খাড়া করিয়া বলিল "পারবো" ও অদূরে সহস্র লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি বালিকার প্রতি নিবদ্ধ দেখিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—চল।'

তারাসুন্দরী যতীনকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহাশ্রু বিগলিত ধারায় বলিলেন 'বাবা, তুমি আজ নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার যে উপকার করলে তার বিনিময়ে এক আশীর্বাদ ছাড়া আমার দেবার কোন

সম্বলই নেই! তবে এই পুণ্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কচ্ছি যেন ভগবান তোমার পুরস্কার দেন।"

যতীন নীরবে নত হইয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিল।

২

বিদ্যাসাগরের শিক্ষামন্দিরে দশ বৎসরের নিয়ত সাহচর্য্যে যতীন ও নগেনের মধ্যে যে মধুর প্রীতির বন্ধন অপর বালকের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল, আজ তাহার বলেই যখন নগেন যতীনের জন্যও বনগাঁর পরিবর্ত্তে একখানা নাটোরের টিকিটই কিনিয়া বসিল, তখন যতীন কেবল একটু হাসিল মাত্র।

নাটোর ষ্টেসনে নামিয়া যখন নগেন তাহার মাসীমা প্রভৃতিকে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, তখন কমলা যেন কিসের আশায় মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; তারপর নগেন যখন আর একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"এস হে যতীন"—তখন কমলার দৃষ্টি হঠাৎ সোজা যতীনের দৃষ্টির সহিত মিলিত হওয়ায় নিমেষে তাহার মুখমণ্ডলে হর্ষলাজের এমনই একটা রং খেলিয়া গেল যাহার অবিকল নকল চিত্রে ফুটিলে কলা-জগতে যুগান্তর ঘটাইত সন্দেহ নাই।

বুঝিবা বালিকার মনের কোণেও একটু দাগ পড়িয়াছিল।

নগেনের পিতা রাখালরাজ সান্যাল রাজসাহীর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল। পূর্ব্বে যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন হইতেই তিনি যতীনকে চিনিতেন ও বিশেষ স্নেহ করিতেন। অনেকদিন পরে আজ যতীনকে দেখিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন।

নগেনের মেসো জয়গোপাল মৈত্রের বাড়ীখানা ছিল ঠিক তাদের বাড়ীর মুখোমুখী। তিনিও তথাকার একজন উকিল। সেই রবিবার মধ্যাহ্নে জয়গোপাল বাবুর বাটীতে এ বাটীর সকলেরই নিমন্ত্রণ ছিল,—অবশ্য যতীনকে উপলক্ষ করিয়া।

আহারাদির ব্যাপার অন্তে অপরাহ্নে যখন জয়গোপাল বাবু একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তারাসুন্দরী একথা সেকথার পর বললেন "যতীনের সঙ্গে যদি আমাদের কমলার বিয়ে হ'ত! আচ্ছা তা কি হয় না?"

"কই আর হয়, যদিও শাস্ত্রে এমন যে কোন নিষেধ আছে ব'লে আমার জানা নেই, আর ব্যক্তিগত ভাবে আমার তেমন কোন আপত্তিও নেই, তবু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে ক্রিয়া কর্ম্ম যে বড় একটা হ'চ্ছে না, এইটাই যে অন্তরায়। তার উপর, ওরাই বা রাজী হবে কেন?

তারাসুন্দরী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা জয়গোপাল বাবু রাখালরাজ বাবুর নিকট এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন,—স্পষ্টবাদী রাখালরাজ বাবু বলিলেন "সে আশা ছেড়ে দাও ভায়া, রামগতি বাঁড়ুয্যেকে ত চেন না। সে ক'রবে আমাদের সঙ্গে কাজ? তবেই হয়েছে আর কি। হ'লে বেশ ভালই হ'ত। এমন ছেলে কম দেখা যায়। আমার মেয়ে থাক্‌লে আমারও যে একে জামাই করবার লোভ না হত তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু কি ক'রবে ভায়া, অন্য যায়গা হ'লেও বা এক কথা, সে বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের কাছে কোন যুক্তি টিকবে না—অন্য পাত্র দেখ।"

বস্তুতঃ রাখালরাজ বাবু ব্যবসায় ক্ষেত্রে আইনের সূক্ষ্মতম ছিদ্রাবলম্বনে অপর পক্ষকে অপদস্থ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিলেও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার প্রকৃতি যথেষ্ট উদার ছিল।

আজ কা'ল করিয়া আরও পাঁচ ছয় দিন সেখানে অবস্থানের পর একদিন সকালে সকলকে প্রণামান্তে বাহির হইবার সময় দরজার পাশে কমলার সজল চক্ষু দুটীর নীরব বেদনাপূর্ণ ভাষা যতীনকে মুহূর্ত্তের জন্য যেন বিহ্বল করিয়াছিল। "তবে আসি"—বলিয়া বন্ধুকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া যখন সে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, তখন মাথার ভিতর তার মাতলামী চলিতেছিল—গাড়ীর সঙ্গে দেহটা তাহার যতই অগ্রবর্ত্তী হইতেছিল, মনটা যেন ততই পিছন দিকে ছুটিতেছিল।

৩

কিছুদিন পরে একদিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় উমাসুন্দরী ও তারাসুন্দরী দুই ভগিনীতে নগেন্দ্রের উপর তলায় বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, কমলাও অদূরে বসিয়াছিল। এমন সময় ধোপা বৌ—"কাপড় দেও মায়ি' বলিয়া হাজির হইল। উমাসুন্দরী ধোপা বৌকে একটু বসিতে বলিয়া ডাকিলেন "ওগো কমলা, যা ত মা নগেনের পড়বার ঘর থেকে একটা পেন্সিল নিয়ে আয়,

কাপড় গুলো লিখে দে" এবং নিজে উঠিয়া ময়লা বস্ত্রগুলি একত্রিত করিতে লাগিলেন।

সে দিন নগেন স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের বাৎসরিক পারিতোষ বিতরণের সভায় আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ফিরে নাই। পেন্সিল লইতে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠির উপর কমলার দৃ পড়িতে সে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িল, যতী লিখিয়াছে—

চ'ঘ'রে।

১১ই, সোমবার

ভাই নগেন!

অনেক দিন তোমাদের খবর জানিনে। বাড়ী এসে শুনলাম চপলার বিয়ে স্থির হ'য়েছে—দিন পর্য্যন্ত ঠিক, এই মাসের ২১শে। ছেলের আর বিশেষ কোন গুণের কথা শুনিনি, তবে না কি মস্ত কুলীন—বাপ নেই, মাতুলান্নেই পুষ্ট বাবা ত জানই, যা জেদ ধরবেন তা কর'বেনই, কাজেই কি ক'রব। তবে চপলার জন্যে বড় দুঃখু হয়। একমাত্র বোন্, একটা অপগণ্ডের হাতে প'ড়ে হয়ত সারা জীবনটা চোখের জলে কাটাবে। যাই হ'ক, বিয়ের অন্ততঃ এক সপ্তাহ আগে এস। জান ত আমাদের প্রকৃত আপনার লোক এখানে বেশী নেই। তোমার বাবা, মা ও মাসীমাকে আমার প্রণাম দিও, তুমি ভালবাসা নিও। ইতি।

যতীন।

পুঃ।—ভাল কথা, কমলা কেমন আছে লিখো। য—

শেষের লাইনটার উপর কমলা আর একবার চোখ বুলাইতে যাইবে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল—নগেন।

"কি হচ্ছে রে কম্‌লি?"

লজ্জায় কমলা মাথা উঠাইতে পারিল না। কোন মতে চিঠিখানা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল।

দু'দিন পরে নগেন উত্তর লিখিল—

বাগবাটী
শুক্রবার

ভাই যতীন।

তোমার পত্র পেলাম। বলি, ক'দিন হল বাড়ী গিয়েছ যে অনেক দিন আমাদের খবর জান না। গত ছ'মাসের মধ্যে কবার খবরাখবর নিয়েছ শুনি? এখনকার তোমার দিনের পরিমাণটা ক'দিনের বরাদ্দে তা' আমার মাথায় ঠিক এল না। সে দিন এক ব্যাপার হয়েছে ভারী মজার। আমার অনুপস্থিতিতে কমলী আমার ঘরে ঢুকে তোমার চিঠিখানা পড়ছিল (চিঠিখানা অবশ্য আমি দৈবাৎ খোলা অবস্থায় ফেলে গিয়াছিলাম)। আমি এসে ঘরে ঢুকতেই সে বড্ড কেমন হয়ে সেই যে পালিয়ে গেল, আর আজ দু'দিন তার দেখা'ই নেই। তুমিও দেখছি বেশ চালাকী ক'রে যে লাইনটা সকলের আগে লেখবার ছিল, সেটা পুনশ্চের মধ্যে সেরেছ—এ সব কি বল ত? যাই হ'ক, বিয়ের তিন দিন আগে ওখানে পৌঁছিব, তখন সব বোঝা পড়া হবে। ইতি—

নগেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নগেন যতীনের বাটী পৌঁছিয়া বিবাহের আয়োজনে যথাসাধ্য নিজকে নিয়োজিত করিল।

বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক, রাত্রি দেড় প্রহরের পর লগ্ন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বর পক্ষ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিছুক্ষণের আলাপ আপ্যায়নের পর বরকর্ত্তা, বরের মাতুল, দীননাথ চাটুয্যে হঠাৎ রামগতি বাবুর প্রতি অনুযোগ স্বরে বলিলেন—"মশাই আপনাদের নাকি বারেন্দ্রের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া চলছে? এটা ত আমাদের আগে জানা ছিল না। লোহাগাড়া-লক্ষ্মীপাশার নৈকষ্য আমরা—জানেন ত আমাদের বংশে এতটুকু খুঁত পাবেন না।" উত্তরে রামগতি বাবু বলিলেন—"বলেন কি! আমি জীবনে কখনও বারেন্দ্রের জল পর্য্যন্ত খাইনি, তা' আপনি ও সব কি বলছেন?"

কাহারও ইঙ্গিতে সচকিত হইয়া দীননাথ অদূরে দণ্ডায়মান নগেনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলিলেন 'ও ছেলেটা?"

"ওটী যতীনের সহপাঠী ছিল—রাজসাহীর রাখালরাজ সান্যাল উকিলের ছেলে।"

"তবেই আর বাকী রইল কি ম'শায়। এটা কিন্তু আপনার কাজটা ভাল হয় নি।"

রামগতি বাবু নির্ব্বাক হইয়া র'হলেন। এরূপ অভদ্রোচিত ব্যাপারে মনটা তাঁহার এক একবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিতে লাগিল, অনেক কষ্টে তিনি নিজকে সংযত করিলেন।

ইহার পর এক অভাবনীয় ব্যাপারে যেন ঘুর্ণী হাওয়ায় সমস্ত উলট পালট হইয়া গেল।

বরপক্ষের চুক্তিমত কন্যার সমস্ত অলঙ্কারই রামগতি বাবু নূতন গড়াইয়া দিয়াছিলেন, কেবল হারের বেলায় একমাত্র আদরের কন্যাকে তাহার স্বর্গীয় স্নেহময়ী জননীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, এতদিন বহুযত্নে রক্ষিত, তাঁরই গলার হার-ছড়াটী দিয়াছিলেন।

বরের মাতুল পুত্র বলিয়া উঠিল "এই নাকি হার! এটা দেখি সেকেলে একটা পুরাণো যাচ্ছে তাই জিনিষ—বেরং, গিল্টী করা নয় ত!"

দীননাথ যেন পুত্রের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "আশ্চর্য্য নয়, পাথর খানা বার ক'রে ক'ষে দেখত হে মধু, অনেক রকমেইত ঠক্ মী দেখ্‌ছি।"

এবার বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, তিনি আগুণ হইয়া বলিলেন—"কি রামগতি বাঁড়ুয্যে জোচ্চোর!—খবরদার, হার স্পর্শ ক'রোনা।"

'অত চটেন কেন মশায়! যে কথা ছিল, করেন নি,—আবার উল্টো চোক রাঙ্গাচ্ছেন! জানেন আমাদের বংশে মেয়ে দিতে পারা, আপনার যথেষ্ট সৌভাগ্য।'

দীননাথের এই ইন্ধনে অগ্নি যেন শিখা বিস্তার করিল।

কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁড়ুয্যে মহাশয় চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"সৌভাগ্য"! আমার বিষম দুর্ভাগ্য যে তোমাদের কুটম্ব ক'র্‌তে চেয়েছিলাম। চর্ম্ম পিশাচ—এই তোমাদের কৌলীন্যের গৌরব?—একটা চক্ষুলজ্জা ব'লে জিনিষও তোমাদের মধ্যে নেই!"

ইত্যবসরে গ্রাম্য প্রাচীন কেহ রামগতিবাবুর গা টিপিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "আহা! কর কি ভায়া, শেষে বিয়েটা পণ্ড ক'রবে নাকি?"

"এর পরেও কি রামগতি বাড়ুয্যে বিয়ে দেবে ব'লে মনে করেন! মেয়ের

হাত পা বেঁধে যদি জলেও ফেলে দিতে হয়, তবুও চামারদের হাতে দেবো না, এ নিশ্চিত জানবেন। আর শুধু তাই নয়—আজ থেকে যে কোন কাজ আমাকে ক'র্‌তে হবে, মানুষ দেখে ক'রব, কুলীন দেখে ক'রব না,—এ আমি পৈতে হাতে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি।"

ক্ষণকালের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু ঘাঘী দীননাথ বিবাহ অসম্ভব ও ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া নিজেদের মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে সলম্ফে উঠিয়া বলিলেন "ওঠ হে সব, আর না। আমাদের ঘরের ছেলের জন্য অমন লক্ষ গণ্ডা মেয়ের বাপ পথ চেয়ে আছে। এমন সমাজ-বিরোধীর মেয়ের সঙ্গে যে ছেলের বিয়ে দিতে হ'ল না, এ ভগবানেরই কৃপা। এখনও দিন রাত হ'চ্ছে। নেহাৎ হাতে পায়ে ধরেছিল তাই,—নয়ত কি আমাদের কেউ এ বাড়ী মাড়ায়!'

বরপক্ষ যখন উঠিয়া গিয়া কিয়দ্দূরে তারণ রায়ের বাটী আশ্রয় লইল, তখন বাঁড়ুয্যে মহাশয় গুম্ হইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন।

বাটীর ভিতর দুর ও নিষ্কম্পকায়। কুটুম্বিনীগণ যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁহারা ত গালে হাত দিয়া রহিলেন। ওদিকে বধূবেশে লজ্জিতা চপলা যেন লজ্জায় ও ক্ষোভে মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিতেছিল।

যতীন নিজের পিতার মেজাজ ভালরূপ অবগত থাকিলেও, তিনি যে এ রকম কাণ্ড করিয়া বসিতে পারেন, ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে কিয়ৎকালের জন্য একেবারে কাঠ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার মস্তিষ্কে এক বুদ্ধি যোগাইল। সে ত্বরিতে পিতার নিকট গিয়া বলিল—"বাবা, নগেনের সঙ্গে কি হয় না?—শাস্ত্রে কি এমন কোন নিষেধ আছে?"

"শাস্ত্র টাস্ত্র জানিনে। তবে আমার আর কোন আপত্তি নেই। খুব হ'তে পারে, কিন্তু নগেন কি রাজী হবে?—তার বাপ মা?"

"দেখি ত"—বলিয়া যতীন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল ও নগেনকে একান্তে টানিয়া তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিল "নগেন, ভাই! সবই ত দেখলে, এখন বোনটীকে নেবে কি?—এ আমার বন্ধুত্বের দাবী নয়, বিপন্নের করুণা ভিক্ষা। তোমার বাপ মা?—সে দায়িত্ব আমার।'

উত্তরে নগেন শুধু বলিল—'যতীন, এর পরেও কি আর ব'লবার কিছু থাকতে পারে?"

বামহস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে ছুটিয়া যতীন পিতার নিকট গিয়া বলিল—"বাবা! উঠুন, নগেন রাজী।"

স্বপ্নেও যাহা কেহ কল্পনা করে নাই, সেই রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিবাহ নির্দিষ্ট লগ্নে ঘোর পরিবর্ত্তন বিরোধী মহাকুলীন রামগতি বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে তাঁহার নিজ হাতে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের ভোজে গ্রামের মাত্র কয়েকজন উপস্থিত হইয়াছিলেন, বাকী সকলেই এক জোট হইয়া বাড়ুয্যে মহাশয়কে এক ঘরে করার মন্ত্রণায় লাগিয়া পড়িলেন। তবে সন্ধ্যার পর গোপনে দু'এক জন করিয়া অনেকেই নাকি পাতা পাড়িয়াছিলেন। যা'ক,—সে খবরে আমাদের প্রয়োজন নাই।

বাসি বিবাহের পর দিন বাড়ুয্যে মহাশয় নিজেই কথা প্রসঙ্গে নগেনের সহিত তাহাদের বাটী উপস্থিত হইলেন ও রাখালরাজ বাবুর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া স্বীয় ত্রুটীর জন্য তাঁহার হস্ত দুটী ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন।

"আরে বল কি বেয়াই! অপরাধটা কি করেছে যে ক্ষমা। যতীনে নগেনে অনেক দিন থেকে সম্বন্ধ ত হইয়াই আছে আজ তুমি সমাজের চোখে সেইটাকে আর একটু দৃঢ় ক'রে দিলে। নাও চল, ভেতরে যাওয়া যা'ক" বলিয়া রাখালরাজ বাবু বৈবাহিক সহ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ততক্ষণে উমাসুন্দরী মঙ্গল আচার অন্তে পুত্র পুত্রবধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

সমবয়স্কা নববধূকে ক্ষণেকের জন্য নিভৃতে পাইয়া দুষ্ট কমলা তাহার ঘোমটা উন্মোচন করত মুখখান ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া বলিল "আমায় আবার লজ্জা ক'রতে হয় নাকি বৌদি? আমি কমলা—ভাশুর নয়!'

ইহার এই প্রগল্ভতায় চপলা ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

পরদিন সহরের গণ্যমান্য অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া এই বিচিত্র বিবাহের বৌভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাখালরাজ বাবুও আদর অভ্যর্থনা ও আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

দু'দিনের মধ্যেই চপলা কমলাকে চিনিয়া লইয়াছিল তাই সেদিন সন্ধ্যার পর

পিতাকে ডাকাইয়া ধরিয়া বসিল "বাবা' কমলাকে দাদার সঙ্গে বেশ মানবে। তুমি মত দাও, ওঁরাও বড্ড ধরেছেন। দাদা একেই জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়েছিল।"

"তা বেশ ত, তোমাদের যদি মত হয় ত আমার আর অমত কি ?" বলিয়া তিনি বহির্ব্বাটী গমন করিলেন এবং রাখালরাজ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই বলিলেন "বেয়াই, মেয়েটী ত দয়া করে নিলে, এখন কমলা মাকে দয়া করে দেবে কি ?"

এই সময় জয়গোপাল বাবুকে অদূরে আসিতে দেখিয়া রাখালরাজ বাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "ভায়া হে ! তোমার ত বড় জোর কপাল ! এই যে মেঘ না চাইতেই জল। আরে বস না বেয়াই ! বলি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভায়া ? যাও গিন্নীকে মিষ্টি সামিগ্রীর আয়োজন ক'র্‌তে বলে দাওগে, বেয়াই আজ কল্পতরু।"

এতক্ষণে যেন জয়গোপাল বাবুর মাথায় কথাটা কতকটা বোধগম্য হইল। তিনি সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া গদগদস্বরে বলিলেন "কি বেয়াই ! দেবে ?"

"যতীন ত তোমাদের আছেই, এখন তোমরা মা লক্ষ্মীকে দিলেই হয়।"

বাটীর ভিতর ততক্ষণে আনন্দ কোলাহল লাগিয়া গিয়াছিল, পরন্তু তারাসুন্দরী আড়াল হইতে সমস্তই শুনিয়াছিলেন, জয়গোপাল বাবুর নিকট সংবাদের অপেক্ষা রাখেন নাই।

* * * * * *

বছর খানেক পরে এক শীতের মধ্যাহ্নে নগেনদের ভিতর বাটীর একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া চপলা ও কমলা গল্প করিতেছিল।

চপলা বলিল "ও ভাই বৌদি, তোর সেই ব্রহ্মপুত্তুর চানের গল্পটা আজ একবার করনা।"

"আচ্ছা হয়েছিস যা' হ'ক। তুই তোর সেই—'হঠাৎ নগেনকে অদূরে দেখিয়া চপলা কমলার মুখ চাপিয়া ধরিল।

'কি হচ্ছে রে কমলি ?' বলিয়া নগেন দরজার একেবারে গোড়ায় আসিয়া হাজির।

কমলা কোন মতে মুখ হইতে হাত ছাড়াইয়া কৃত্রিম অনুযোগের স্বরে বলিল

'কেন, এখন কেন!—এই দেখ না দাদা—'এমন সময় যতীনকে নগেনের পশ্চাতে দেখিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে আঁচলটা মাথায় তুলিয়া চপলাকে একরকম ঠেলিয়া লইয়াই পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ।*

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)

গত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় বাঙ্গলায় এক মহাপ্রাণের তিরোধান ঘটিয়াছে। লোকনায়ক দেশভক্ত স্বজাতিপ্রিয় পরমবৈষ্ণব মহামান্য মতিলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২৫৪ সালে ১২ই কার্ত্তিক যশোহর জেলাস্থ অমৃতবাজার নামক গ্রামে মহাপ্রাণ মতিলালের জন্ম। তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী অমৃতময়ীর নামানুসারে উক্ত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এই অমৃতবাজার হইতেই ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হেমন্ত-কুমার ও শিশির কুমারের একান্ত উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রথমে সামান্য কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ও কতকগুলি পুরাতন অক্ষর লইয়া বঙ্গভাষায় "অমৃতবাজার-পত্রিকা" সপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। মতিলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পার্শ্বে থাকিয়া একযোগে সংবাদ পত্র-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কম্পোজ করিতেন, কেহ কালী দিতেন, কেহ ছাপিতেন, কেহ সংবাদ লিখিতেন, কেহ সম্পাদকতা করিতেন। প্রথমে ৫০০ শত মাত্র ছাপা হইত। অমৃতবাজারে প্রথম হইতেই নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে * * রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যাবলির সমালোচনা প্রকাশিত হইত। সমালোচনার তীব্র দংশনে সংক্ষুব্ধ হইয়া ৪ মাস মধ্যেই এক ইংরাজ ডেপুটী, সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিলেন। এই মোকদ্দমা ৮ মাস কাল চলিয়াছিল। সেই মোকদ্দমায় ঘোষ-ভ্রাতৃগণ

---

* ভাদ্র সংখ্যা, কায়স্থ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

জয়লাভ করিলেও তাঁহারা একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির করিলেন।' দেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল প্রতিভারূপে অমৃতবাজারের আবির্ভাবে দেশে একটা মহাসাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে ভাষার লালিত্য, অপর দিকে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, নানাবিষয়ে স্বাধীন গবেষণা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের উপযুক্ত সমালোচনায় অল্পদিন মধ্যেই 'অমৃতবাজার' সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; এমন কি ভারতবর্ষের মধ্যে একখানি সর্ব্বপ্রধান সংবাদ পত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ঘোষভ্রাতৃগণের নামও ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। দেশের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাঁহারা যেরূপ গভর্ণমেণ্টের * * কার্য্যসমূহের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিজপক্ষে আনিতে পারেন, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টাও চলিয়াছিল। এমন কি ১৮৭৭ খৃঃ ছোটলাট সার্ আস্লি ইডেন অমৃতবাজারকে সরকারী সংবাদপত্র-রূপে পরিণত করার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমারকে ডাকিয়া অনেক আশা ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাপুরুষ শিশিরকুমার অচল অটল রহিলেন, কিছুতেই কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

'দেশীয় সংবাদপত্র বিশেষতঃ অমৃতবাজার পত্রিকাকে শাসন করিবার জন্য ছোটলাট নূতন আইন চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।'—১৮৭৮ খৃঃ ১৩ই মার্চ তারিখে 'পত্রিকায়' এই সংবাদ বাহির হয়। মহাত্মা মতিলাল স্বয়ং সেই কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হন। তিনি গিয়া দেখিলেন, ছোটলাট তাঁহাদের সাধের অমৃতবাজারের সহিত তাঁহাদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইবার জন্য নূতন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের আইন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ভীত হইবার লোক নহেন। এ সময়ে নানা বিষয় তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধা থাকিলেও তাঁহাদের অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তৎপর দিনই ইংরাজীভাষায় "অমৃতবাজার" বাহির হইল। বলিতে কি ভারতের সংবাদপত্র জগতে কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে শিশিরকুমার ও মতিলাল যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় ও অভাবনীয়।

মহাত্মা মতিলাল, মহাপুরুষ শিশিরকুমারের পদতলে বসিয়া 'পত্রিকা' পরি-

চালনের সহিত যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে the Public Service Commissionএ তিনি যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, সার্ লেপেল গ্রেফিনের কঠোর নীতি হইতে ভূপালের বেগমকে তিনি যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, কাশ্মীর, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, রেবা প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক আলোড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার অকপট ও সাধারণ-হিতকর লেখনী পরিচালনার প্রভাবে সিবিলিয়ানগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অমৃতবাজারের উপর অসন্তুষ্ট থাকিলেও, সার এডোয়ার্ড বেকার হইতে পরিবর্ত্তী বঙ্গের লাটগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে দেখিতেন।

মতিলালের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রিয়তা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অচলা ভক্তি ও অসাধারণ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের কায়স্থ-সমাজের জন্য কি করিয়াছেন, কায়স্থ-সমাজকে তিনি কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজন ভিন্ন বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। ১৯০১ খ্রীঃ ৫ই জুলাই (২০শে আষাঢ় ১৩০৮ সাল) রিজ্‌লী সাহেবের জাতিবিচার-তালিকা আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল আফিসে মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভা আহূত হয়, সেই সভায় মতিলাল, ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরে কায়স্থ-জাতির সামাজিক আসন রক্ষা করিবার জন্য, যেরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহে স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সভায় যদিও মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার ন্যায় কায়স্থ-পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য মতিলালের তীব্র সমালোচনার ফলেই সেই সভায় কায়স্থজাতিকে নিম্ন আসন দান করিবার মন্তব্য গৃহীত হইতে পারে নাই। সে সময়ের বিচার সভার কার্য্য-বিবরণী যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অনায়াসে ইহা স্বীকার করিবেন। তাঁহার সেই জাতীয় সম্মানপ্রতিষ্ঠার কথা বঙ্গের কায়স্থ জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ রাখিবে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাকালে

মতিলালও অন্যতম অগ্রণী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় নন্দলাল বসু, স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় ও আমি, তাঁহার পরামর্শ লইয়া কায়স্থ সভার গঠন-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। গত ১৩২৬ সনের কায়স্থ পত্রিকায় 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্ম কথা' প্রসঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ-সভার প্রথম অবস্থায় স্বর্গীয় মতিলাল, সভার নানা অধিবেশনে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া স্বজাতির মঙ্গলকর স্বাধীন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন তাঁহার গুরুপ্রতিম জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় শিশিরকুমার যদিও প্রকাশ্যভাবে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই, কিন্তু অনেক সময় নানা বিষয়ে আমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়া স্বজাতি-হিতৈষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি যথাসম্ভব কার্য্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বর্গীয় মতিলালের একান্ত উৎসাহে ও আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ক্ষত্রোচিত যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়া ছিলেন। উভয় ভ্রাতার অভিপ্রায় অনুসারে শিশিরকুমারের স্বর্গগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বর্গীয় শিশিরকুমার এবং সম্প্রতি মহাত্মা মতিলালের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কেবল বক্তৃতা দ্বারা নয়, কেবল কাগজে লিখিয়া নহে, বৈকুণ্ঠবাসী শিশিরকুমার ও মতিলাল, কার্য্যের দ্বারা কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিয়া কায়স্থ জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আজ কায়স্থ-সমাজ উভয় ভ্রাতার কার্য্যকলাপে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

কর্ম্মবীর মতিলাল আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, তজ্জন্য আমাদিগের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি সমস্ত ভারতবাসীর নিকট উজ্জ্বল যশোমণ্ডিত হইয়া বৈষ্ণবের চির অভীপ্সিত গোলকধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের ও দশের সর্ব্বসাধারণে চির অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। সেই পুণ্যাত্মা গৌরাঙ্গ ভক্তের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

সাহিত্যের গতি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

ঊর্দ্ধে দেবীতমা ভারতী সমাসীনা, পদতলে ঋত্বিক কোবিদবৃন্দ ধ্যানস্থ। দেবী প্রসন্না হইলেন, সাহিত্যের জন্ম হইল। যুগ যুগ তাই, অনন্ত ভাব প্রবাহের মুক্ত হংসাসনে বসাইয়া ভাবময়ী ভারতীর উপাসনা। ভাবেই মিলনের স্ফূর্ত্তি, মিলনই সাহিত্যের অর্থ, মিলনই বিশ্বের লক্ষ্য ; শ্রুতি এই মিলন আলোকেই আলোকিত।

দূরাতীত যুগে আলোক বিকাশিতাঙ্গী দ্যুতিমতী উষায় সাহিত্যিকের কণ্ঠেই এই মিলন মন্ত্র উত্থিত হইল।

সমানীব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো, যথা বঃ সুসহাসতি॥

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয় মন এক হউক, তোমরা বিভিন্নতা ভুলিয়া যাও, এই আপাততঃ বহুত্বের মধ্যে একত্বের যে পূর্ণাভিব্যক্তি দেদীপ্যমান, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণা কর।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ
একত্ব মনু পশ্যতঃ॥

শুনিতে শুনিতে ধরিত্রী পরিতৃপ্তা হইলেন, সমাজ-হৃদয়ে একত্বের মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সাহিত্যের সার্থকতা লাভ হইল।

পরবর্ত্তী যুগেও মিল সূত্র ধারণ করিয়া সাহিত্যিক বৃন্দ দণ্ডায়মান, উপনিষদের অমৃত নিঃসন্দিনী দুগ্ধ ধারায় তাহাদের কণ্ঠ আরও সুললিত, সাহিত্যের ভূমি আরও পীযুষসিক্ত।

যুগান্তে মিলনময়ীভারতী পৌরাণিক কোবিদ বৃন্দের হৃৎপদ্মে মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপে আবির্ভূতা হইলেন,—অমনি ভাব-সাগরে লীলালহরী নাচিয়া উঠিল। সাম্যে মৈত্রী আসিয়া উপনীতা হইলেন, মিলনে প্রীতি আসিয়া দেখা দিলেন, সন্তান হৃদয়ে বিশ্বপ্রসূতির অভয় পদ-পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইল,—

ভক্তকবি মুক্ত কণ্ঠে গাহিলেন—

ত্বমেব মাতা বিদিতা প্রপঞ্চে
ত্বমেব ধাত্রী পরিদৃশ্যমানে।

ভারতীয় সাহিত্য এই পর্য্যন্ত পূর্ণ প্রাণবন্ত, দেবতার মত পূজ্য পরম আরাধ্য, পরম পরমার্থ। জানি না কোন্ সনির্ব্বন্ধ নিয়তি চক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে সে গৌরবময় যুগের অবসান হইল;—জ্যোতির্ম্ময়ী ভারতী অন্তর্হিত হইলেন, মুক্ত গগণতল বিহারী নির্ভীক সাধক গণও লুকায়িত হইলেন।

"যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা।"

বলিয়া আবার অঞ্জলি প্রদত্ত হইল,—জানি না কেন সে অঞ্জলি চিন্ময়ী ভারতী মৃন্ময়ীরূপে আসিয়া গ্রহণ করিলেন মায়ের অপরামূর্ত্তি অলঙ্কারে নত হইয়া পড়িল, কত ছন্দ কত কাব্য, সাহিত্য রাগ রাগিণী উত্থিত হইল; কিন্তু যে মন্ত্রে দেবী আসিয়া সাধকের হৃৎপদ্ম আলোকিত করেন সে মন্ত্র আর ধ্বনিত হইল না,—বিজ্ঞানময়ী ভারতী বিমোহিনী হইয়া দাঁড়াইলেন, বিলাস বিহ্বল কবিতাসুন্দরী বিদ্যুজ্জ্বালা বর্ষণ করিয়া যোগিনীর আসন কাড়িয়া লইল. সে দেবীতমা ভারতীকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। দিন দিন ভারতীয় সাহিত্যের বিশিষ্টতা বিনষ্ট হইতে চলিল।

তাহার পর ক্রমে ঔপন্যাসিক সুরাপানে বালক, বৃদ্ধ, যুবকের মস্তিষ্কে অবসাদ আরম্ভ হইল,—হৃদয় রমণী-সুলভ দুর্ব্বলতায় ডুবিয়া গেল। এই এক মার্গানুসারিণী মদিরা ধারা সাহিত্যিক ও রঙ্গালয়ের অভিনেতৃবর্গ অবিরাম মুক্ত হস্তে ঢালিতে ঢালিতে বঙ্গের সমাজভূমি অত্যধিক সিক্ত করিয়া ফেলিলেন।

কত বালকের মস্তিষ্ক অসার হইল, কত যুবক যুবতী ব্যর্থ প্রণয়ের রুদ্ধ নিশ্বাসে অধীর হইয়া অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; কত সতী লক্ষ্মীর নয়নাশ্রু পাষণ্ডের পদতলে মুছিয়া গেল, তবু এ কুরুচিরদ্বার আজও উন্মুক্ত, সাহিত্যের শক্তিই জাতীয় শিরায় বিচরণ করিয়া জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্তবৃত্তিকে পরিণতির পথে লইয়া যায়। কিন্তু যে জাতি যখন একমাত্র প্রবৃত্তি মূলক সাহিত্যালোচনায় উচ্চ উদ্ভাবনী শক্তির অবমাননা করিয়াছে সে জাতি

তখনই অবনতির সোপান তলে পতিত হইয়াছে, ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য লইয়া বিদ্যমান।

ওগো! কবি!

বাসন্তী-রজনীর প্রণয়-গীতি গাহিবার সময় আর নাই, প্রবাসক্লিষ্ট বিরহীর অসম্ভব বিরহোক্তি শুনিতে জাতির শ্রবণ বধির হইয়াগেল, সত আজ নিরাভরণা প্রাচীনা ভারতী—

বসুধা বিলুন্ঠিতা, ধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা—

আর ললিত রাগিণী শুনিবার সাধ নাই, কে আছ একবার দীপক তানে জাগ জাগ বলিয় ডাক।

দেশ আজ মৃত প্রায় কর্ম্মহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণায় জর্জ্জরিত, নির্য্যাতনে বিচূর্ণিত। কবি! তুমি তোমার নটবররূপ লইয়া সরিয়া দাঁড়াও। আজ আমরা সেই নির্ভিক সাহিত্যিক গুরুকে পূজা করিব, যিনি অলস নিদ্রাতুর জাতির নিমিলিত নেত্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বজ্রকণ্ঠে শুনাইতে পারেন—

"ওরে মূর্খ নহে প্রেম
মৃত তোরে মাগে –
বংশী সম মধুস্বরে'
মধু অনুরাগে—"

কত দূরে কোথায় তিনি যাহার লেখনী নিঃসৃত' শব্দ শক্তিতে জাতির শ্লথ ধমনী মুক্তির আনন্দে নাচিয়া উঠিবে। তাহার উত্থান মন্ত্রেই জননী জাগরিতা হইবেন যাহারা অনন্ত ভাষায় বিলাস বিহ্বলা কবিতা সুন্দরী লজ্জায় বদন অবনত করে। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভারতীয় উপসনায় যুগ যুগ পরে আবার আমরা কৃতার্থ হইব, যাহার প্রভাবে কোটী কোটী মানবের অবশ ধমনীতে বিদ্যুৎ বার্ত্তা বহিয়া যায়, জাতি আবার জাতিত্বের গৌরবে স্ফীত বক্ষে বলিতে পারে—

অপাম সোমমমৃতা
ভবাম অগন্ম জ্যোতিঃ।

জানিনা ভারতী! আবার তুমি রাজরাজেশ্বরী রূপে কবে আসিবে মা! ভারতের এই মৃতভস্ম স্তুপীকৃত সাহিত্য শ্মশানে কে তোমাকে ডাকিয়া আনিবে?

অহেতুকী।*

(৺ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত)।

১

প্রতিদিন আপনা আশ্বাসি'
ভাবি মনে মনে
পাব আজি তার চিঠিখানি!
আসে নিতি পত্র রাশি রাশি
লিখে কত জনে—
পাসে শুধু ভুলিয়াছে রাণী!

২

মধ্যাহ্নেতে একলা বসিয়া
রহি আশা করে
যদি কভু দেখা তার পাই।
স্মৃতি 'পরে বিষাদে কাঁদিয়া
কত কথা স্মরে'
আমার সে—আমার সে নাই!

৩

সায়াহ্নেতে পথ পানে হায়,
চাহি বার বার
আসে যদি বারেক সে জন!

---

* "প্রতিভা" হইতে উদ্ধৃত।

কত কেহ আসে আর যায়
কোথা সে আমার—
কে জানিত ভুলিবে এমন!

৪

বুক ভরা আশা-সাধ মোর
কত ভালবাসা
সাজাইয়ে পূজার থালায়,
বৃথা নিতি গাঁথি আঁখি-লোর
মিলন-পিপাসা
মিটাবে কে—নাহি সে ধরায়!!

নানা কথা।

সভা সমিতি।

বিগত ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় লক্ষ্মীকোল রাজ-বাড়ীতে কায়স্থ-সভার এক মহতী অধিবেশন হয়। স্থানীয় এবং রাজবাড়ী ও ফরিদপুর হইতে গণ্যমাণ্য প্রায় শতাধিক কায়স্থ প্রতিনিধি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায় মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা মহাশয়ের অনুমোদনে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এল মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বজাতি হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করতঃ ওজস্বিনী ভাষায় সময়োচিত একটী বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। অতঃপর "ফরি

"আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুহ রায় বর্ম্মা বি এল মহাশয় সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে সকলকে উদ্বোধিত করেন। সভাপতি মহাশয় এবং অঘোর বাবু, এই বিষয় বিশদ ভাবে বলিবার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়কে অনুরোধ করেন। প্রচারক মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রস্তাবিত প্রত্যেক বিষয়ের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তৃতা অতি প্রাঞ্জল এবং সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তি বৃন্দ প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্য বিষয়ের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়াভীতরূপ প্রতিবোধিত হইয়া উপনয়ন গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। অনেকই কুমার বাহাদুরের মুখাপেক্ষী হইয়া ইতঃস্তত করায়, তিনি সভাস্থলে অতি সত্বরই উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং উপনয়ন গ্রহণ জন্য দিন স্থির করিতেও বলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ২২শে ও ২৪শে বৈশাখ উভয় দিনের মধ্যে যে কোন দিন লক্ষ্মীকোল রাজভবনে কুমার বাহাদুরের এবং অন্যান্য উপনয়ন গ্রহণেচ্ছু কায়স্থদিগের সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন করা স্থির হয়।

অতঃপর প্রচারক মাখনবাবু লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একটী শাখা-সভা স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দিলে, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহা সমর্থিত হয়; এবং ঐ দিন হইতে "লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ী অর্য্য-কায়স্থ-সমিতি" নামক শাখাসভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। কুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায় বর্ম্মা বাহাদুর উক্ত সভার স্থায়ী সভাপতি হইলেন এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা মহাশয় সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুবর্ম্মা বি, এল মহাশয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর বর্ম্মা মজুমদার বি, এ মহাশয় সহকারী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর মজুমদার বি, এ মহাশয় জাতীয়তা এবং সমাজিকতা ও মানুষের কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে সুন্দর একটী বক্তৃতা করেন।

অতঃপর কুমার বাহাদুর উপস্থিত ব্যক্তি বর্গকে এবং সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপরে সমাগত সকলে রাজ ভবনস্থ ঠাকুর বাটীতে শ্রীশ্রী৺রাধা-বল্লভ জিউর প্রসাদ সহ নানা রকম ফল, মূল এবং মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাণী মহোদয়াদ্বয় জলযোগের প্রচুর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কায়স্থোপনয়ন।

বিগত ২৪শে বৈশাখ রবিবার ফরিদপুর জেলায় লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ীতে অত্রত্য রাজকুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায় বাহাদুরের এবং অপর উনবিংশতি জন কায়স্থ সন্তানের যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপক্ষে লক্ষ্মীকোল রাজপ্রাসাদ ধ্বজ পতাকাদি দ্বা র পরিশোভিত এবং বাদ্যাদি ও জনকোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিবস হইতেই নানাস্থান হইতে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের শুভাগমনে রাজভবন প্রকৃতই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল। ফরিদপুর, খানখানাপুর, চর নারাণপুর, লক্ষ্মীপুর, ভবানীপুর, সূর্য্যনগর, দয়ালনগর, গঙ্গাপ্রসাদপুর, মহাদেবপুর, বেরীনগর, সজ্জনকান্দা, জয়পুর, ভবদীয়া প্রভৃতি নানাস্থানের এবং রাজবাড়ীর গণ্যমান্য বহুসংখ্যক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কেন্দ্রের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকার সময় রাজবাটীস্থ বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত বৃহৎ চণ্ডীদালানে কেন্দ্রের কার্য্য আরম্ভ হয়। যখন প্রিয়দর্শন কুমার সৌরীন্দ্রমোহন ও অপর উনবিংশতি জন মানবক মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবস্ত্রে এবং দণ্ড কমণ্ডলু ইত্যাদিতে পরিশোভিত হইয়া ব্রহ্মচারীবেশে কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখনকার সে দৃশ্য দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মনে এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল।

রাজপুরোহিত শিবরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (বৈদিক) এবং তাঁহার পিতৃদেব বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; ভবদীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শান্তি-পুরের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি আরও কতিপয় ব্রাহ্মণ

উক্ত কার্য্যে যোগদান করেন। ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত এবং আভ্যুদয়িক (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) সম্পাদিত হইলে মানবকদিগের চূড়াকরণান্তে কুমার বাহাদুর বরণকার্য্যে ব্রতী হন; পরিধেয় বস্ত্রাদি ও যজ্ঞোপবীত দ্বারা যথাক্রমে সপ্তজন ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য কার্য্যে বরণ করেন, উপনয়ন যজ্ঞরক্ষা ও কেন্দ্রের আনুষঙ্গিক কার্য্য তত্ত্বাবধারণ জন্য কায়স্থ ধর্ম্মযাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক মহাশয়দ্বয়কে পরিধেয়বস্ত্র, উষ্ণিষ, যজ্ঞোপবীত ও সুতীক্ষ্ণ তরবারীদ্বারা ক্ষত্রিয় বরণ করেন। বরণ কার্য্য শেষে উপনয়ন যজ্ঞ আরম্ভ হয়; কার্য্যের সুশৃঙ্খলা জন্য দুইটী স্থাণ্ডিল (হোমকুণ্ড) করা হইয়াছিল। প্রজ্জ্বলিত চন্দনাদি কাষ্ঠের ও ধূপ ধূনাদি মিশ্রিত যজ্ঞায় হবির সৌরভে এবং বেদমন্ত্রধ্বনিতে যজ্ঞীয় স্থান যেন প্রকৃতই এক মহাতীর্থ ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

এই দিনের আর একটী মঙ্গল জনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত সকলে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; তাহা এখানে প্রকাশ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহু দিবস ব্যাপী অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রের ভয়ানক প্রখরতায় জলাশয়াদি শুষ্ক এবং পঙ্কিলাবশেষ অবস্থায় পরিণত হওয়ায় দেশের চতুর্দ্দিক হইতে জল, জল বলিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ ও হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল, (এমন কি কোন কোনও স্থানে দুগ্ধের ন্যায় মূল্যে, সের হিসাবে পর্য্যন্ত পানীয় জল বিক্রিত হইয়াছিল)। প্রেমময় শ্রীভগবানের অপার করুণায় এইদিন যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত হইবার কিছুকাল পরে গগন মণ্ডলে একখানি ক্ষুদ্র মেঘের সঞ্চার হয়, দেখিতে দেখিতে ঐ মেঘখণ্ড বৃহদাকার ধারণা করে এবং যজ্ঞাহুতি দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মূষল ধারে বৃষ্টি হইতে থাকে,—তাহাতে এতদ্দেশের দুর্ব্বিসহ জলকষ্ট অনেকটা নিবারিত হয় এবং কৃষকদিগের চাষ আবাদের ও বীজ বপনাদি কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

উপনয়ন যজ্ঞ এবং সংস্কার কার্য্য শেষ হইতে বেলা প্রায় শেষ হয়; নিমন্ত্রিত সমাগত সকলকেই অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে রাজবাড়ীর ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত লালবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত দিবসের উপনীত ব্রহ্মচারীগণ সহ প্রচারক মহাশয়দ্বয়ের ও রাজ এষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারিগণের একখানি আলোক চিত্র গ্রহণ করেন

শ্রীযুক্তা রাণীমাতাঠাকুরা এই বিরাট অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সুনির্ব্বাহ করণার্থে কোন বিষয়েই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের কর্ত্তব্য পরায়ণতা এবং স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের এই শুভ শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ জন্য এতাদৃশ ঐকান্তিকতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। করুণাময় জগদীশ্বর শ্রীমান গৌরীন্দ্রমোহনকে দীর্ঘ জীবন এবং শ্রীবৃদ্ধি প্রদান করত লক্ষ্মীকোল রাজবংশের গৌরব বর্দ্ধন করুন।

বিগত ২৯শে বৈশাখ যশোহর জিলান্তর্গত ইতিনা গ্রামে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র করিয়া কোটালীপাড়ার মদন-পাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ইতিনাবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ দেব, যাদবচন্দ্র দেব, ষষ্টীচরণ দাস, অনঙ্গকুমার দাস ও শ্রীপদ দাসের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জিলান্তর্গত, বান্ধব দৌলাতপুর গ্রামের দেব-ভবনে অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দেব মহাশয় এবং দীঘলপাড় নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। শিরখাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য কার্য্যের বৃতি ছিলেন।

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইতিনা (যশোহর) মিত্র বাটীতে একটী কেন্দ্র হয়; উক্ত কেন্দ্রে তত্রত্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, অকিনাশচন্দ্র সরকার, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ গুহ বি এ প্রমুখ সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশ জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ যশোহর জিলান্তর্গত পাইকপাড়া নিবাসী স্বজাতির উন্নতীক কামী শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্তবর্ম্মা মজুমদার (পুলীশ ইনসপেক্টর) মহাশয়ের আলয়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ গণের উপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিনয়ভূষণ দত্ত, অম্বিকাচরণ দেব ও বিজয়চন্দ্র দেব। এই কেন্দ্রে মুক্তেশ্বরী নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহশয় আচার্য্য এবং স্বধর্ম্ম-পরায়ণ শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধারক কার্য্যে বৃতি ছিলেন।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সৃষ্টিকালাবধি এ যাবত বঙ্গের নানা স্থানে চতুশ্রেণীস্থ বহু কায়স্থের ক্ষত্রোচিত সংস্কার (উপনয়ন) হইয়াছে। প্রেমময় শ্রীভগবানের কৃপায় দিন দিনই কায়স্থ সমাজের গাঢ়নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে এবং অনেকেরই জাতীয় স্বধর্ম্ম গ্রহণে আন্তরিকতা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ জাতির সংস্কার কার্য্য যে প্রকার চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় অতি সত্বরেই আমরা সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিতে পারিব।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি, বিগত ২১শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা দিবসে নবদ্বীপ ধামে ইদিলপুরের (টেংরার) স্বনামধন্য জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ রায় চৌধুরী মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি যোগেশ বাবুর প্রযত্নে ইদিলপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজে অচির কাল মধ্যেই ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত হইবে।

—•—

বিগত ১১ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মদনদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া জ্ঞানদিয়া, মদনদিয়া, চাঁদপুর, চকভবানী পুর, শিবরামপুর প্রভৃতি গ্রামের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নাগ উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত চন্দ, বিনোদবিহারী ভৌমিক, রামলাল সরকার, যোগেন্দ্রনাথ গুহরায়, যাদবচন্দ্র গুহ, বসন্তকুমার ভৌমিক, হরেন্দ্রকুমার ভৌমিক, নৃত্যগোপাল ঘোষ, গঙ্গাচরণ দাস, মহিমচন্দ্র বর্দ্ধন, রাসবিহারী দাস, অবিনাশচন্দ্র দাস, উমাচরণ পাল, বনমালী সরকার, বিনোদবিহারী ভৌমিক, কৈলাসচন্দ্র কর প্রমুখ ৩৫ জন কায়স্থের যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র সংস্থাপন কল্পে খানখানাপুর নিবাসী স্বজাতি হিত-পরায়ণ সহৃদয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয়ে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন, এজন্য তিনি চির ধন্যবাদার্হ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন করণার্থে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য এবং প্রশংসনীয়। এই কেন্দ্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে,—এতদঞ্চলের যে সমস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ ইতিপূর্ব্বে কখনও কায়স্থোপনয়ন সংস্রবে আসিতে

কিছুতে সম্মত হন নাই, বহু আলোচনার পরে উহার সত্যজ্যেষ্ঠ এবং সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা সকলেই এই কেন্দ্রে উৎসাহের সহিতই যোগদান করত যথ নির্দিষ্ট কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করাইয়াছেন। একতুপলক্ষে চতুর্দ্দশ জন শাস্ত্রজ্ঞ বৈদিক এবং বহুসংখ্যক রাঢ়ীয় বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাদারীপুরে তত্রস্থ সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার কেন্দুয়া নিবাসী ৺হরিনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু বর্ম্মা (মুনসেফ) মহাশয় ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন। তোরণ, বৃষোৎসর্গ এবং ষোড়শ দানাদি কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। প্রায় ২০।২৫ খানি গ্রামের স্বজাতি এবং বহু ব্রাহ্মণ এই শ্রাদ্ধে যোগদান করত কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় বসুবর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুবর্ম্মা অবসর প্রাপ্ত সবজজ মহাশয়ের ও প্রিয়নাথ বাবুপ্রভৃতির সৌজন্যতায় এবং সুবন্দোবস্তে উপস্থিত সকলেই বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছেন; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ আহার্য্য দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ভোজন ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বাদ্যাদি অতি, সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ৺হরিনাথ বসু মহাশয় অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ এবং স্বজাতি হিতৈষী মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন; তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে গত ১৩২২ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ অনুজ এবং পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদিসহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বজাতি মাত্রেকেই অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সকলকে সংস্কারকার্য্যে মনোযোগী হইবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনকে তাঁহার আদ্য-কৃত্য ক্ষত্রিয়াচারে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া যান। এতদঞ্চলে এই আদ্যকৃত্যই সর্ব্বপ্রথমে ত্রয়োদশাহে সম্পাদিত হইল; আমরা এইজন্য প্রিয়নাথ বাবুকে এবং এই কার্য্যের অন্যান্য উদ্যোক্তাগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—o—

বিগত ৫ই ভাদ্র ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তুগলদিয়া গ্রামে অশীতিপর বৃদ্ধ ৺হরিচরণ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়গোপাল সরকারবর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব পর্য্যায়। Reg. No. C. 653

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ] ৭ম ও ৮ম সংখ্যা]

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—১৩২৯ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

ফরিদপুর।

বার্ষিক মূল্য—২৲। এই সংখ্যা—।৶০

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৪।১৪শ খণ্ড। { কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস। } ৭ম, ৮ম সংখ্যা।

বিজয়া।

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)।

আজ বিজয়া-দশমী; সারাবৎসরের পথ চাওয়া তিনটী দিনের উৎসবের আজ অবসান; কত সাধ, আহ্লাদ, আশা, কল্পনার পুটুলী বাঁধিয়া এই দাস-জাতি মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিনের পর দিন সমান ভাবে উদয়াস্ত ঘানী ঘুরাইয়া আসিয়াছে। সে একঘেয়ে ঘানীটানার মধ্যে তাহার হৃদয়ের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবসর ছিলনা, তাই অবাধ্য হৃদয়টাকে কোনমতে পূজা পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। গৃহে গৃহে কত ব্যাকুল প্রতীক্ষা, অন্তরে অন্তরে কত আশার স্পন্দন; প্রবাসী ঘরে ফিরিবে, শূন্য আসন পূর্ণ হইবে; সেই পূজা আসিল, চলিয়া গেল, কাহারও সাধ মিটিল কাহারও মিটিল না, কাহারও আশা পুরিল, কাহারও পুরিল না; কাহারও প্রাণের আকুল আগ্রহ হাসি হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কাহারও বা অশ্রুরূপে ঝরিয়া পড়িল। এবার আবার চলা পথে ফিরে চলা, গাওয়া গান ফিরে গাওয়া। আজ বিজয়া দশমী। এমনই একদিন নবমীর নিশিশেষে হিমাদ্রি-ভবনে দিবসে অন্ধকার করিয়া কালবিজয়া আসিয়াছিল। উমার মুখশতদল মলিন দেখিয়া মেনকার উৎকণ্ঠিত মাতৃহৃদয়ে হাহাকার উঠিয়াছিল; সে শোকের ছবি আমাদের ঘরের চিরপরিচিত করুণ দৃশ্য—

"যাবার কথা কর্ণে শুনি, মা যেন গো পাগলিনী,
আমার উমা বিনোদিনী বিনোদ বেণী এলাইল।
আমি কত পাতকী, দেখয়ে কেমনে থাকি,
উমাচাঁদে গ্রাসিতে কি রাহু আজি বিজয়া হল॥"

বিশ্ববিধাত্রি মহাশক্তিকে আত্মজারূপে আপনার সুখদুঃখময় ক্ষুদ্র গৃহকোণে টানিয়া আনিয়া আপনাদেরই সুখদুঃখের মধ্যে আপনাদেরই একজন করিয়া দেখিবার স্পর্দ্ধা আর কোথাও কেহ করিতে পারিয়াছে কি? আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে সে শোকের পুনরভিনয়, দীনাতিদীন হিন্দুও বিল্বদলে দুর্গানাম লিখিয়া বিসর্জ্জন দিতেছে, আজ এতদিনকার এত আয়োজনের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল; এতদিনকার গড়িয়া তোলার আনন্দ উৎসাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার মর্ম্মবেদনায় পর্য্যবসিত হইল। এতদিনকার সাজান প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিল। পূজার অঙ্গনে আর সে সমারোহ, সে জনতা নাই। শিশুদের ছুটাছুটি বন্ধুজনের কলরব, কর্ম্মিগণের ব্যস্ততা, সব থামিয়া যাইতেছে, মুহু র্মুহু মুখর বাদ্যের সমুচ্চ ধ্বনি ক্লান্ত হইয়া নামিয়া আসিতেছে, পুরস্ত্রীগণের কঙ্কণ নূপুর নিক্কণ অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে গুমরিয়া মরিতেছে। ঘরে ঘরে মিলনের সজীবতা আসন্ন বিদায়ের আশঙ্কায় ম্রিয়মান হইয়া আসিতেছে।

আনন্দময়ি! তোমার চরণ স্পর্শে এ উষর ক্ষেত্রে আনন্দের ফুল ফুটিল কই? বরদে! তোমার আগমন প্রতীক্ষায় যাহারা ভীত হতাশনয়নে সারাটী বৎসর কৈলাসের পানে চাহিয়া ছিল, তাহাদের জন্য কি বর আনিয়াছ মা? তুমি নাকি মা অন্নপূর্ণা, তবে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুর অন্ন জুটিল না কেন? দানবদলনি! পারিলে কি অন্তরের ঐ দানবটাকে দলন করিতে? আজও সহস্র আনন্দময়ীর নির্য্যাতনের ক্ষুদ্র আর্ত্তনাদ কক্ষের প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিতেছে। শত আঘাতে জর্জ্জরিত, শত বেদনায় ব্যথিত তোমার সন্তানগণ কত আশা করিয়া তোমায় ডাকিল "সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।" কাহার কয়টা মনোরথ পূরাইলি মা! এই বিরাট রিক্ততার লেশমাত্রও তোমার কৃপাকণায় ভরিয়া উঠিয়াছে কি? দিগন্ত প্রসারি অমঙ্গলের ঘন কৃষ্ণমেঘ; তাহার কোথাও এতটুকু স্বর্ণাভা স্ফুরিত হইয়া আগমনী মঙ্গলের রথচূড়া সূচিত করিয়াছে কি? এই দুর্ব্বহভার পীড়িত,

দুর্ভাগা দেশ বৎসরের পর বৎসর মায়ের পূজা করিয়া আসিয়াছে, মায়ের প্রাণে তাহার বেদনা বাজিয়াছে কি? আজওত এখানে ঝঞ্ঝাপ্লাবনের তাণ্ডব নৃত্যে, কত শত সাজান সংসার মুছিয়া যাইতেছে। ব্যাধি এখানে প্রেতের মত জীর্ণ দেহের শেষ রক্তবিন্দুটী শুষিয়া লইতেছে, কত সোণার কমল শুকাইয়া যাইতেছে, কত দীপ্ত প্রতিভা ম্লান হইয়া পড়িতেছে। অকাল মৃত্যুর করাল পুচ্ছ গৃহে গৃহে কত সীমন্তের নবীন সিন্দুর মুছিয়া লইতেছে, কত মায়ের বুকের ধন ছিনাইয়া লইয়া মর্ম্মন্তুদ শূন্যতায় ভরিয়া দিতেছে। এখানে প্রাণভরা জীবন নাই, লক্ষ লক্ষ মানব নামধারী প্রাণী কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত এক সূর্য্যোদয় হইতে আর এক সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পরের তাড়নায় পরের গাছে পাক দিতেছে। একতিল বিরামনাই, এতটুকু স্বাধীনতা নাই; শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীণদৃষ্টি লোলচর্ম্ম বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত একই পথে একই ভাবে ঘুরিয়া চলে। আশা এখানে দীর্ঘশ্বাসে মিলাইয়া যায়, স্নেহ এখানে শঙ্কায় শিহরিয়া উঠে, সত্য এখানে নিত্য বিড়ম্বিত, মনুষ্যত্ব নিত্য লাঞ্ছিত। এই অভিশপ্ত দেশের মঙ্গলময়ী মা তুমি? ঘৃণিত প্রত্যাখ্যাত কঙ্কালসার, কোটর গত চক্ষু শুষ্ক নগ্ন চিরদুর্ভিক্ষে অন্তিম নিঃশ্বাসটুকু লইয়া পথের ধুলায় ধুঁকিতেছে; পরের চরণ তলে দলিত মথিত হইয়াও কথাটী কহিবার সাহস সামর্থ্য নাই; নিঃসহায় ভীরু মেষ পালের মত স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত হইয়া রৌদ্রে জলে কঙ্কালটাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে, পড়িতেছে, মরিতেছে, শ্বসিতেছে। কখনও দারুণ যন্ত্রণায় কোলের শিশুর মুখের গ্রাস কাড়িয়া আপনার জঠর জ্বালা জুড়াইতেছে, বুকের সন্তানকে একমুষ্টি অন্নের জন্য বিকাইয়া দিতেছে, অবশেষে নিজের টুটি টিপিয়া ধরিয়া ক্ষীণ নিঃশ্বাসটুকু স্তম্ভিত করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিতেছে, একি মায়ের দেশ? সত্যই সন্দেহ হয়-বড়ই মর্ম্মভেদী সন্দেহ, বুঝি এদেশের মা নাই। কোটী কোটী জীব যাহার চরণে মাথা কুটিয়া আসিতেছে, তাহা শুধুই মৃন্ময়ী প্রতিমা, মনে হয় আগমনীর সাহানার বিভাস মহাশূন্যেই মিলাইয়া গেল;—কে আছে? কে আসিবে? সন্দেহ হয়, বুঝি আজ বৈষ্ণবী শক্তি পরাভূতা, রুদ্রাণীর ধ্বংসলীলারই জয়। বুঝি বিশ্বের মূলে মাতৃত্বের স্নেহ বিহ্বল করুণার লেশ মাত্র নাই; শুধু নিয়তি-অটল কঠোর পাষাণী নিয়তি; আমার দেয় আমাকেই কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতে হইবে, এক কপর্দ্দকও

কেহ ছাড়িবে না। আমার বোঝা আমাকেই বহিতে হইবে, রেণু পরিমাণও কেহ কমাইবে না। মনে হয় বিপদবারিণী বরাভয়করা দুর্গা শুধু মানবের মানসী সৃষ্টি। বুঝি নিয়তি নিপীড়িত দুঃখদীর্ণ মানব আপন মনের সান্ত্বনাচ্ছলে কল্পনা করিয়া দুঃখহরা দুর্গতিনাশিনীর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। দোষ হয়ত আমাদেরই, আমরাই হয়ত স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমাদরই না হয় সাধনা নাই, কিন্তু মায়ের স্নেহ কবে সন্তানের যোগ্যতার অপেক্ষা করে?

আজিকার সন্ধ্যা বড় করুণ, বড় মধুর; সাহানার উন্মাদনা বেহাগের করুণতায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহারই অনুকরণে এই সান্ধ্য ধরণী, এই সান্ধ্য আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিও বিষাদের সুরে বাজিতেছে। মনটা আজ বর্ত্তমানে বাঁধা থাকিতে চাহে না, অতীতের কত কথা, কত বিস্মৃত কাহিনী মনে পড়ে। এই বিসর্জ্জনের বাজনার ভিতর কত দিনের কত বিদায়, কত বিসর্জ্জনের করুণ সুর বাজিয়া যাইতেছে! এই দশমীর জ্যোৎস্নার সহিত অতীতের কত দশমীর স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে। জীবনের পথে একদিন যাহারা সাথী ছিল, তার পর চোখের জলে যাহাদিগকে বিদায় দিতে হইয়াছে, এমনই কত ভোলামুখ, ঝিল্লীর উদাস সুরে আকাশে অদৃশ্য তারকা যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তেমনই আজ ফুটিয়া উঠিতেছে।

কতজন আসিয়াছে, কতজন গিয়াছে। কেহ চকিতের মত আসিয়া জীবন তটিনীর বুকের উপর লঘু মেঘখণ্ডের মত নীরবে ভাসিয়া গিয়াছে। আবার কেহ বা আসিয়াছে, কাল বৈশাখীর রুদ্রমূর্ত্তিতে,—ফেনিল আলোড়ন তুলিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা যায় তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় না। উদ্দাম গতিতে যাহারা আসে, তাহারা জীবনে উদ্দাম হইয়াই জাগিয়া থাকে। পতঙ্গের পেলবস্পর্শনে যাহারা জীবনটাকে শুধু ছুঁইয়াই উড়িয়া যায়, সাধারণতঃ তাহাদের আর কোন উদ্দেশই পাওয়া যায়না বটে কিন্তু তাহারাও একেবারে বিলুপ্ত হয় না; বিস্মৃতি ত বিনাশ নহে। চেতনার তলদেশে বিস্মৃতির ফল্গুধারা অলক্ষিতে বহিয়া যাইতেছে। সময়ে সময়ে বাহিরের আলোকস্পর্শে তাহারই ঊর্ম্মি স্মৃতিরূপে ভাসিয়া উঠে, স্মৃতির বাহিরে সেই নিভৃত গোপন মণিকোঠায় কত মুখ, কত কথা, কত মান, অভিমান

কত হাসিঅশ্রু, যুগযুগান্তের কত নিধি লুকান আছে। কখনও উষার রক্ত-চ্ছটায়, কখনও সন্ধ্যার ম্লান হাসিতে, কখনও দ্বিপ্রহরের রৌদ্রকরে, কখনও নিশীথের জ্যোৎস্নাঘাতে, কখনও ফুলের গন্ধে পাখীর গানে, কখনও সুখে কখনও দুঃখে সে মণিকোঠার দ্বার খুলিয়া যায়; আজ অন্তর বাহিরের এই বিপুল বেহাগ স্পন্দনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে ঘুমন্ত পুরীর যত সুপ্ত প্রাণ কল্লোলিয়া, উঠিয়াছে আজ অতীতের কত মৌন আলাপন। মর্ম্মজগতের ব্যবসায়ে এই শুভ পুণ্যাহে, এই হিসাব নিকাশের দিনে মনে পড়ে কতজনকে তাহাদের প্রাপ্য দিই নাই, প্রাণভরা স্নেহের বিনিময়ে কতজন অনাদরে অবজ্ঞায় মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। "কৃতের প্রতি কৃতঘ্নতা, দয়ার শিরে পদাঘাত করিয়া কতজনের অন্তরে শেল বিঁধিয়াছি। আশা করিয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহা-দিগকে নিরাশ করিয়াছি, শুধু দুইটী মিষ্ট কথার যাহারা পিয়াসী, রূঢ়তায় তাহাদের বুকে বজ্র হানিয়াছি। হাসি লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহাদিগকে কাঁদাইয়াছি, চখের জলে যাহারা মুখের পানে চাহিয়াছে তাহাদের চখের জলের মর্য্যাদা রাখি নাই। সেই সব অনাদৃত ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা পাষাণের গুরুভার লইয়া আজ বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। উৎসবের বাঁশরী-বিলাসে নিমগ্ন বর্ত্তমান মন যাহাদের পানে ফিরিয়া চাহে নাই, বিদায়ের এই ম্লান সন্ধ্যায় তাহারা ভিড় করিয়া আসে। ম্রিয়মান হাসিটী, বিলীয়মান তপ্তনিঃশ্বাসটী, উচ্ছ্বসিত অশ্রুবিন্দুটী লইয়া তাহারা আসে,—এস তোমরা আমার হৃদয় দুয়ার হইতে বিমুখ হইয়া যাহারা ফিরিয়া গিয়াছ। ভুলিয়া যাও আমার সারা বৎসরের ত্রুটিবিচ্যুতি, লও আমার একান্ত সম্বল অনুশোচনার অশ্রুবারি।

"কালোহ্যয়ং নিরবধি।" কালের গতি অনন্ত। সেই অনন্ত গতির মধ্যে এক একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আমরা এক একটা ছেদ, এক একটা অঙ্ক, এবং এক একটা যতির পরিকল্পনা করিয়া থাকি। অনন্ত চলার পথে একটু জিড়াইয়া লই। একটানা স্রোতে নিত্য উপচীয়মান পশরা সম্ভার লইয়া জীবনতরণী ভাসিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে এঘাটে ওঘাটে তরী ভিড়াইয়া বোঝা নামাইয়া দিয়া ভার কমাইয়া লই, অনন্ত কালের পান্থ! ওগো সুদূর দেশের যাত্রি! বিজয়া দশমীর এই সন্ধ্যায়, এই বিসর্জ্জনের ঘাটে তোমার তরীটী ভিড়াও। ফেলিয়া যাও এই ঘাটে পুঞ্জীভূত যত আবর্জ্জনা রাশি; সারা

বৎসরের হিংসা দ্বেষ আক্রোশের পাষাণভারে তরী যে ভরপূর, এইখানে সব খালি করিয়া দিয়া লঘুস্বচ্ছন্দ গতিতে ভাসিয়া যাও। সংসারের চারিদিকে কেবল স্বার্থ, কেবল ছলনা।. কি পবিত্র মানুষের হৃদয়! এখানে যে দেবতা আসিয়া আসন পাতেন; স্বর্গভ্রষ্ট মানব দেবতাকে ফাকিদিয়া বুঝি ত্রিদিবের অমৃত বিন্দু ঐখানে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বিশ্বের অমঙ্গল নিধনের জন্ত ঐখানে বসিয়াই যে দধিচী অস্থি দান করেন, ঐখানে বসিয়াই শিবি আশ্রিত রক্ষার জন্য আপন দেহের মাংস কাটিয়া দেন, ঐখানে বসিয়াই সিদ্ধার্থ আহত বিহঙ্গমের রক্তাক্ত পক্ষপুট অশ্রুজলে ধোয়াইয়া দেন, ঐ বোধিদ্রুমতলেই ধ্যানী বুদ্ধ সংসার যন্ত্রণা নিবারণের উপায় চিন্তা করেন, ঐখানেই বিশ্বপ্রেমিক, হাওয়ার্ড দুঃখীর জন্য অশ্রুমোচন করেন, ঐখানেই করুণার প্রতিমা নাইটিংগেল আর্ত্তের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের পানে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকেন। মর্ত্তে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি, মানবে দেবত্বের অধিষ্ঠান, তোমার সেই হৃদয়টাকে কি কুৎসিত কি পঙ্কিল করিয়াছ, মানব! অমন পুণ্যভূমি গৃধ্র কুক্কুর ফেরুপালের কলহ কোলাহলে পরিপূর্ণ, জগৎটাকে লইয়া ইহারা টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতেছে। মানুষের সুখ মানুষে দেখিতে পারে না, মানুষের উন্নতিতে মানুষ অন্তরে পুড়িয়া মরে। সাজান বাগান রাতা-রাতি চষিয়া দেয়, সুখের সংসারে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালাইতে গোপনে চক্রান্ত করে; নিজের এতটুকু আরামের জন্য আর একজনকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পথে বসাইতে কুণ্ঠিত হয়না, শক্তিমান দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া আনন্দ পায়, অধস্তনকে লাঞ্ছিত অবমানিত করিয়া পদস্থব্যক্তি গৌরব মনে করে। যে বুকে শুইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, সেই বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যায়, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া যে গড়িয়া তুলিল, সেই নীরব বাৎসল্যকে কাঁদায়। দেবতা সাক্ষী করিয়া যাহার ভার আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইল, তাহাকেই নির্য্যাতিত করিয়া বিবসন বেশে পথের মাঝে পরিত্যাগ করে। মানুষ মানুষকে ঘেরিয়া তাহার বুকে কামানের আগুন ছাড়িয়া দেয়, কোলের শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া প্রাচীর গাত্রে ছুড়িয়া মারে, লুণ্ঠিত ভস্মীভূত নগরীর স্তূপীকৃত মৃত্যুরুদ্ধ পথের উপর দিয়া বিজয় শকট জয়োল্লাসে ছুটাইয়া যায়। মানুষের এই পৈশাচিক রঙ্গভূমির পানে তাকাইয়া কবি বড় দুঃখে বড় যন্ত্রণায় কাঁদিয়া বলিয়াছেন, "what man has made of

man ?"

সেই বিশ্বে বিজয়া দশমী সার্থক হোক। মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে শিখুক, মানুষের দুঃখ মানুষে বুঝুক, মানুষের অশ্রুজলে অশ্রুজল মিশাক; বিশ্ববাসী পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করুক, উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র ভেদ ঘুচিয়া যাক, মানুষের অন্তরে দেবতার প্রতিষ্ঠা হোক। আজিকার মিলন চখের জলের মিলন, প্রাণের মিলন। এ পবিত্র মিলনের সুরে তোমার হৃদয় ভরিয়া লও। প্রাণে প্রাণে যে মিলন তাহাই প্রকৃত মিলন, আজিকার এই বাণী তোমার ইষ্টমন্ত্র হোক্। স্বার্থের অভিঘাতে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া (league) সংঘ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মিলনের গৌরব করা চলে না। যে স্বার্থে তাহারা একত্রিত হইয়াছিল সেই স্বার্থই তাহাদের মধ্যে সহস্র যোজন ব্যবধান আনিয়া দিবে।

ভারত! তোমার প্রাঙ্গনে আজিকার এই গভীর হৃদয়োচ্ছাস, মধুর প্রেম বিনিময় সত্য হোক্, চিরন্তন হোক্। তোমার কুটীর হইতে এক সন্ধ্যায় যে মিলন শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তাহার মঙ্গল রবে সব বিরোধ, সব ক্ষুদ্রতা, নীচতা চিরতরে দূর হোক্। আজিকার মন্ত্রকে তোমরা জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ কর। যে দেশের শান্ত রসাস্পদ তপোবনে ব্যাঘ্র মৃগের সখ্যতা সম্ভব হয়, যে দেশের নিমাই আচণ্ডাল বিশ্ববাসীকে প্রেম বিলাইয়া দেয়, যে দেশে কৌপীন পরিহিত মহত্ত্বের চরণে মুকুট মণ্ডিত শির অবলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে, কুবের ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও যে দেশের মহাদেব শ্মশানচারী ভিখারী, চিতাভস্ম যে দেশে দেবতার বিভূতি, যে দেশের পরম মন্ত্র ত্যাগ, বৈরাগ্য, সে দেশে তুচ্ছ স্বার্থ লইয়া এত হানাহানি, রক্তারক্তি, এত ঈর্ষা, এত ঘৃণা। আদর্শ ও জীবনের মধ্যে এত ব্যবধান। ক্ষোভে দুঃখে পঞ্জর ধ্বসিয়া যায়, লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারি না। এ গভীর দুঃখ এ ঘোর লজ্জা কবে দূর হইবে? কবে ভারত তোমার গৌরবময় মহা আদর্শের ধ্রুবলোকে লক্ষ্য-নিবদ্ধ করিয়া চলিতে পারিবে? আজ তোমার বিজয়ার প্রেমালিঙ্গনকে যাহারা শুধু একটা অভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দেয়, সেই বিদ্রূপ পরায়ণ স্মেরমুখ বিশ্বকে কবে আবার দেখাইতে পারিবে, কেমন করিয়া মিলিতে হয়, কেমন করিয়া শত্রুকে প্রেম দিতে হয়? কবে আসিবে সেদিন, যে দিন তোমার ও

মহামিলনের প্রভাসতীর্থে, সাম্য মৈত্রীর ত্রিবেণী সঙ্গমে আসিয়া জগৎ ধন্য হইবে। একদিন তোমারই তপোবন ধ্বনিত করিয়া ঋষিকণ্ঠে যে মিলনগীত উদ্গীথ হইয়াছিল,

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জায়তাম্—

বর্ষ গেল, যুগ গেল, কত শতাব্দী গেল, সে গীতা জীবনে সত্য হইয়া অভিব্যক্ত হইল কই? আজ বিজয়া দশমী, মায়ের নামে এই ব্রত গ্রহণ কর, ভারত! যেন আজিকার দিন বিফলে না যায়—যেন তোমার ঋষিকণ্ঠের বাণী সত্য হয়। আজ যে শান্তিজল তোমার শীর্ষে সিঞ্চিত হইল, তাহাতে সকল মলিনতা সকল কালিমা যেন ধুইয়া যায়, সকল বিরোধের যেন শান্তি হয়। মায়ের নামে সিদ্ধি সেবন করিয়া তোমার আদর্শে, তোমাব সাধনায় যেন সিদ্ধিলাভ হয়।

চোর।

(শ্রীমধুসূদন আচার্য্য)

১

গণেশচন্দ্র জাতি গোয়ালা। এই গতকল্য সে জেল হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। গণেশের পিতামহী সখ করিয়া একটী সুন্দর বালিকার সহিত কিশোর বয়সে তাহার বিবাহ দেয়; কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যে বিবাহের অষ্টাহ মধ্যেই গণেশের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। দ্বিতীয়বার আর সে দার পরিগ্রহ করে নাই। প্রতিবেশীরা তাহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যাইত—"আচ্ছা, আমার স্ত্রী না ম'রে যদি আমি নিজে মরতুম্, তবে তোমরা 'তাকে' আবার বিবাহ দিতে কি? পুরুষ গুলি হচ্চে নিতান্ত নির্লজ্জ! একজনের বিসর্জ্জন হ'তে না হতেই আবার আর একজনের আবাহন-গীতি গাইতে বসে! ওপক্ষে কিন্তু একেবারে খতম! [illegible] ঘোর [illegible] হাত হতে কত দিনে সমাজ [illegible]

লাভ করবে ?" ইত্যাদি। গণেশের কথা শুনিয়া কেহ হাসিত, কেহ বা তাহাকে 'বিদ্যাসাগর' বলিয়া বিদ্রূপ করিত, কিন্তু এ সকল হাসি বিদ্রূপকে গণেশ মোটেই গ্রাহ্য করিত না।

বর্ত্তমানে গণেশের সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা পিতামহী ছাড়া অন্য আর কেহই নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুরন্ত কলেরা রোগে তাহার মাতা পিতা একই দিনে মানবলীলা সম্বরণ করে। গণেশের পৈতৃক জমিজমা যাহা কিছু ছিল, তাহার উপস্বত্বেই উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ শিবনারায়ণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অপরাহ্ণে তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া একাগ্রমনে একখানি কুষ্ঠী বিচার করিতেছিলেন, এমন সময় গণেশ আসিয়া তাহার সম্মুখে নতভাবে দাঁড়াইল। তিনি গণেশকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"কিরে, গণেশ! কখন এলি? জেলে ছিলি ত ভাল?"

"আজ্ঞে, এই আজ সকাল বেলা এসেছি। জেলে আবার ভাল?"

"আহা! এমন অপকর্ম্মটা কেন কর্‌তে গিয়েছিলি? সাধারণ বিষয়ে লোভ করে জীবনের প্রথম পর্ব্বেই এই যে চরিত্রের উপর একটা দাগ পড়্‌ল, এ দাগ কি তোর জন্মে মুছবে?"

"কি করুব পণ্ডিত মশায়! ঘাড়ে তখন একটা ভূত চেপেছিল তাই!"

"তোর যত কিছু সুনাম সব গেল! এক হাঁড়ী দুধে এক বিন্দু গোমূত্র পড়লে যেমন হাড়ীশুদ্ধ দুধ নষ্ট হয়ে যায়, তোরও দেখছি তাই হল।"

"সবই অদৃষ্টের কথা পণ্ডিত মশায়!"

নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে সহসা বেত্রাঘাত করিলে সে যেমন ভাবে চমকিয়া উঠে, গণেশের শেষ কথায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও ঠিক তেমনই ভাবে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল প্রশান্ত মুখমণ্ডল নিমেষে রাহু কবলিত নিশাকরের মত মলিন হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বিক্ষুব্ধস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"তাইত ভাবছি, গণেশ! তোর অদৃষ্ট কেন এমন হয়? আমি যে বাল্যে তোর অদৃষ্ট গণনা করেছিলেম! সে আজ ষোল বছর আগেকার কথা, তখন তোর বয়স ছিল তিন বছর মাত্র। একদিন তোর বাপ এসে বল্লো—'দয়া করে খোকার একখানি কুষ্ঠী লিখতে হবে।' আমি হেসে বল্লাম 'গগন! তোমাদের গোষ্ঠীতে ত কাউকে কুষ্ঠী লিখতে দেখলাম না, তবে তুমি কেন বাপু, কুলাচারের বাহিরে যাচ্ছ?' সে লজ্জিত ভাবে উত্তর দিল—আজ্ঞে ওঃ হচ্চে সব নিরক্ষর লোক, কুষ্ঠীর মর্ম্ম কি বুঝবে?' গগনের আগ্রহ দেখে লিখে দিতে প্রতিশ্রুত হলেম। তারপর যথাকালে উহা শেষ হলে তাকে উহার ফলাফ পড়ে শুনালেম্—সে শুনে খুব খুসী হয়ে বল্লো—'চোর ডাকাত হ'য়ে কুলের মুখে কালী না দিলেই মঙ্গল; আর সব পরের কথা।' আমি দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেম্—'এ ছেলে তোমার কখনও চোর ডাকাত হতে পারে না। আমি ব্রাহ্মণ নই, যদি এ ছেলে কোন দিন চুরি করে।' গগন প্রফুল্লমনে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে আমাকে প্রণাম করল। গণেশ, আজ আমি গগনের স্বর্গগত আত্মার নিকট মিথ্যাবাদী হলেম! আমার গণনায় ভুল হল! আমার দীর্ঘকালের কঠোর শ্রমলব্ধ জ্যোতিষ জ্ঞান মিথ্যায় গেল! অভ্রান্ত ঋষিবাক্যে প্রমাদ ঘট্‌ল! আমি অব্রাহ্মণ হলেম! গণেশ! এ রকম ভুলত জীবনে আর কোন দিন আমার হয়নি! গণেশ! এ রকম ভুলত জীবনে আর কোন দিন করি নাই।"

গণেশ মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"ঐ যে আপনাদের কি একটা কথা আছে—মুনীনাঞ্চ"—সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাড়াতাড়ি তাকে বাঁধা দিয়া বলিলেন—"অসম্ভব! এ ক্ষেত্রে আমার মতিভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি বড় যত্ন করে কুষ্টিখানি লিখেছিলুম; অধিকন্তু তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লক্ষণ সকল নিরূপণ করে, হস্তপদ ও ললাটের রেখা সমূহ পরীক্ষা করে, সামুদ্রিক গণনার সঙ্গে জ্যোতিষ গণনা ভাল করে মিলায়ে নিয়েছিলেম, উভয় গণনাই আমার ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল।'

"গণনায় ও ত ভুল থাকতে পারে?"

"কখনো নয়! ঐ লক্ষ লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্রের রহস্যময় সঞ্চার পরীক্ষা করে আজও আমি যে সময় নির্দ্ধারণ করে দিই, তা তোদের ঐ

ঘটিকা যন্ত্রের সঙ্গে একেবারে কাটায় কাটায় মিলে যায়, আর এই চোখের সামনে এত বড় একটা স্থূল বিষয়ে এরূপ সাংঘাতিক ভুল করে বস্‌ব? আমি যে কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে গণেশ!"

গণেশ আর কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থানোন্মুখ হইল, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "দেখ গণেশ! আর যেন কোন দিন এমন অপকর্ম্ম করে না বসিস; গোয়ালার ছেলে হলেও গগন গ্রামের মধ্যে প্রতিপত্তি রাখত, দশজনে মান্‌ত। তুই তার একমাত্র সন্তান, সুতরাং তোর কোনও কলঙ্কের কথা শুনলে সত্য সত্যই প্রাণে বড় লাগে। আর তোর স্বভাবও ত কোন দিন মন্দ ছিল না, স্বভাবের গুণে বরাবরইত তোকে আমরা ভালবেসে আস্‌ছি।"

২

গণেশচন্দ্র কেবল যৌবনের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, তাহার বয়স এখন এই উনিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু পরিপুষ্ট, সবল ও দীর্ঘকায় বলিয়া তাহাকে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবকের মত দেখাইত। গণেশ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তারপর পড়াশুনা ছাড়িয়া দেয়। গণেশের পিতা গ্রাম্য জমিদার মিত্র বাবুদের তহশীলদারের কার্য্য করিত। পিতৃ বিয়োগের পর গণেশ সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই একটী মোকদ্দমায় প্রজার পক্ষ সমর্থন করার অপরাধে জমিদার মহাশয় তাহাকে পদচ্যুত করেন। তারপর গণেশ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার দত্ত বাবুদের তহশীলদারি কর্ম্ম গ্রহণ করে। প্রায় এক বৎসর যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া একদিন সামান্য কি এক কাজে সে অযথারূপে তিরস্কৃত হয়। সেই দিনই চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া চলিয়া আইসে। তৎপর গণেশ আর পরের চাকুরী করিতে যায় নাই। চাকুরীর খেয়ালকে সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। গৃহে থাকিয়া তখন চাষ আবাদের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দিবসের অধিকাংশ সময় সে কঠোর পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহার কয়েক খানা জমিতে আলু, পটোল, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, বেগুন, মূলা, কপি ও সালগোম প্রভৃতি নানা জাতীয় তরি-তরকারী ও বহুবিধ শাকসব্জি উৎপাদন করিত এবং নিজেই তাহা মাথায় লইয়া প্রত্যহ

নিকটবর্ত্তী হাটবাজারে বিক্রয় করিয়া আসিত ; তাহাতে তাহার বেশ দু'পয়সা লাভ হইত । অবসর সময় সে গ্রাম্য লোকের নানা কার্য্যে নানারূপ সহায়তা করিতে বিরত থাকিত না। যদি কাহারও নৌকা ডাঙ্গা হইতে জলে নামাইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তখন দেখা যাইত, গণেশ কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সকলের আগেই গিয়া নৌকা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। যদি কাহারও নৌকা জল হইতে ডাঙ্গায় তুলিবার আবশ্যক হইয়া থাকে, সেখানে দেখা যাইত গণেশ কোমরে গামছা জড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে বুক জলে নামিয়া গিয়াছে। যেখানে বাঁশের চাল আড়ার উপর তুলিবার আয়োজন চলিত, সেখানে দেখা যাইত— গণেশ রজ্জু হস্তে খুটীর মাঝখানে ঝুলিয়া রহিয়াছে। কোনও উচ্চ বৃক্ষের অগ্র ডাল কাটিবার প্রয়োজন হইলে অন্য লোক যেখানে সাহস পূর্ব্বক উঠিত না, গণেশ যাইয়া সেখানে হন্ হন্ করিয়া উঠিয়া পড়িত। কাহারও গৃহে কোনরূপ ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে গণেশ সেখানে গিয়া প্রাণপণে খাটিত। গ্রামে বারোয়ারী উৎসব হইলে জলতোলা, কাঠচেরা প্রভৃতি কার্য্যে গণেশকেই অগ্রণী হইতে দেখা যাইত। সে কখনও বসিয়া বসিয়া কি বৃথা গল্প গুজব করিয়া সময় কাটাইত না। সে তাহার ক্ষুদ্র জীবন-তরীটীকে এক অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া দিয়াছিল। গ্রামের প্রায় সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত এবং শত মুখে তাহার প্রশংসা করিত। এইরূপে সে যখন তাহার বন্ধনহীন নিরাবিল জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, সেই সময় সহসা একদিন পুলিশের লোক তাহাকে চৌর্য্যাপরাধে ধরিয়া লইয়া যায়। তারপর চারি মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সে যখন স্বগ্রামে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার নিতান্ত আপনার লোকও তাহাকে ডাকিয়া একটী কথা জিজ্ঞাসা করিল না। যাহারা তাহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারাও তাহার সঙ্গে আর মিশিতে আসিল না। সে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে গেলে তাহারা দুই এক কথায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিত ; সে তখন মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। গ্রামের সকলের নিকটেই গণেশ ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিল, তাহার সকল গুণ চাপা পড়িয়া গেল। সাধারণতঃ মানব প্রকৃতির এই এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য যে তাঁহারা অপরের শত গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার দোষটুকু ধরিয়া টানাটানি করিবে, তাহাই শুধু জন সমাজে

প্রচার করিয়া বেড়াইবে, গুণের কথা মুখেও আনিতে চাহিবে না। যাহা হউক কয়েকদিন পর গণেশকে আর সে গ্রামে দেখা গেল না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রতিবেশীরা সবিস্ময়ে দেখিল যে গণেশ রাত্রিতে তাহার ঘর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া বৃদ্ধা মাতামহী সহ কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে।

৩

লক্ষ্মীপুর গ্রাম খানি খুব বর্দ্ধিষ্ণু। এ গ্রামে অনেকগুলি অবস্থাপন্ন লোকের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মোদক, নাপিত, গোয়ালা, তাঁতি, ধোপা ও ভুঁইমালী প্রভৃতি উচ্চনীচ নানা শ্রেণীর লোকদ্বারা গ্রামটী পরিপূর্ণ। এই গ্রামে বড় একঘর ব্রাহ্মণ জমিদার ও দুইঘর কায়স্থ জমিদার ছাড়া ছোটখাট আরও কয়েকঘর জমিদার ও তালুকদার আছেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বাস ভবন এই গ্রামের এক প্রান্তে। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক যেই গাত্রোত্থান করিবেন, এমন সময় বাহির বাড়ী হইতে কে ডাকিল—

"ঠাকুর খুড়ো! বাড়ী আছেন?"

ভিতর হইতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় উত্তর দিলেন—

"কে ডাক্‌ছে?"

"আজ্ঞে, আমি বীরেন।"

"কে, বীরেন!"—বলিতে বলিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বাহিরে আসিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে আগন্তুক লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি বাবাজী! ভালত? কল্‌কেতা থেকে কবে এলে?"

"এই কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি। আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই।"

"সঙ্গীটি কে?"

"ইনি আমার একজন বন্ধু, আমরা একসঙ্গে পড়ি, এই বড়দিনের ছুটীতে এসেছেন।"

"তা' বেশ, বস তোমরা।"

"বস্‌বই ত ঠাকুর খুড়ো! আপনার নিকট কিছুক্ষণ বস্‌তে হবে আমাদের।'

'কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বে বুঝি?'

'আজ্ঞে হাঁ, আমার এই বন্ধুটি আপনার অদ্ভুত গণনার কথা শুনে এখানে এসেছেন।'

'আচ্ছা, চল, আগে গিয়ে বসি,—তারপর প্রশ্ন শুন্‌ব' এখন্‌।'

'সত্য কথা বল্‌তে কি, আমার এই বন্ধুটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর ঘোর সন্দিহান, ইহাকে শুধু একটা ধাপ্পাবাজি বলে মনে করেন। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনার নিকট কোনও প্রত্যক্ষ সত্য আবিষ্কৃত হয় কি না, তাই পরীক্ষা করবার জন্যই ইহার এখানে আসা এবং পূর্ব্বেও ইনি এ উদ্দেশ্যে অনেক অর্থব্যয় করে অনেক স্থানে ঘুরেছেন।'

'উনি নেহাৎ মিথ্যে মনে করেন না, ইদানীং শাস্ত্রটা কতকটা ধাপ্পাবাজির উপরই চলছে বটে।'

তারপর তাহারা সকলে বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলে সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় দ্বিতীয় যুবকটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন—

'বল ত বাবা! তোমার জান্‌বার কি আছে?'

দ্বিতীয় যুবকটি সসঙ্কোচে কহিল, 'মাপ্‌ করবেন পণ্ডিত মহাশয়! আমার বন্ধুটী যা বলেছেন, তা মিথ্যে নয়।' সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—'তোমার সঙ্কোচ করবার কিছু নেই, অসঙ্কোচে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর্‌তে পার।'

'আচ্ছা, আপনি বল্‌তে পারেন কি, বর্ত্তমানে আমার বয়স কত?' সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় তখন সেই প্রশ্নকারী যুবকটির দক্ষিণ হস্তখানি আপনার উৎসঙ্গের উপর টানিয়া লইয়া তদ্‌গত চিত্তে করতলস্থ, বক্র, সরল, ত্রিকোণ ও অর্দ্ধবক্র প্রভৃতি রেখাগুলি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 'চিন্তার গভীরতায় তাঁহার ললাট দেশ কুঞ্চিত ও ভ্রূযুগের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল। কিয়ৎকাল চিন্তা করিবার পর তিনি ধীরভাবে কহিলেন—

"তোমার প্রকৃত বয়স এখন এই একুশ বৎসর একমাস, এগার দিন।" যুবকটী তখন তাহার কোটের গুপ্ত পকেট হইতে একখানি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া একটি পৃষ্ঠার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে তাহার সুন্দর মুখ মণ্ডল এক অভিনব শোভা ধারণ করিল। মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখ হইতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। প্রথম যুবকটি

উৎসুক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দ্বিতীয় যুবকটি পুনরায় প্রশ্ন করিল—

'আমি কোন্ মাসে, কোন্ পক্ষে, কোন্ তিথিতে, কোন্ বারে এবং কোন্ সময় জন্মেছিলুম তা, কি আপনি বল্‌তে পার্‌বেন?'

'পার্ব্বো। মাস, পক্ষ ও বার বের করা তেমন কিছু কঠিন নয়, তবে সময়টা বের কর্‌তে হলে একটু খাট্‌তে হবে; তা একটু অপেক্ষা কর, সবই বলে দিচ্ছি।'

তার পর তিনি তাঁহার জীর্ণ, শীর্ণ, পুরাতন এক কাঠের বাক্স হইতে দীর্ঘ একখানি শ্লেট বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাতে অনেকগুলি অঙ্ক লিখিলেন। কোথায়ও ৫ এর সঙ্গে ৩ যোগ দিয়া যোগ ফল নামাইলেন ৭। কোনও স্থানে ৮ কে ৪ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল রাখিলেন ১৩। কোথায়ও বা ৯ হইতে ৫ বাদ দিয়া বিয়োগ ফল বসাইলেন ৬। কোনও স্থানে আবার ভাজ্য ৮, ভাজক ২, কিন্তু ভাগফল হইল ৬ ও ভাগ শেষ থাকিল ১।—ইত্যাকার অদ্ভুত রকমের অনেক গুলি অঙ্ক কষিয়া কিয়ৎকাল স্থিরচিত্তে কি চিন্তা করিলেন। তারপর যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বাবা! তুমি ফাল্গুন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে গুরুবারে জন্ম গ্রহণ করেছ। তোমার জন্ম গ্রহণের কাল—রাত্রি দ্বিপ্রহর ৩ দণ্ড, ১৬ পল।'

উত্তর শুনিয়া যুবকটি পুনরায় সেই নোটবুকের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তারপর অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—

'অদ্ভুত আপনার গণনা! সব ঠিক্ ঠিক্ মিলে গেছে!'

প্রথম যুবকটি উচ্চহাস্য সহকারে কহিল—

'কেমন, আমার কথা সত্য হল? আমি যে বলেছিলুম—আমাদের গাঁয়ের সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের নিকট গেলে তোমার সব সংশয়ের সমাধান হবে। বুঝ্‌লে কিনা, এঁরা সব হচ্চেন্ একজাতীয় conservative; সহরে লোকের মত আপনার ঢোল আপনার কাঁধে নিয়ে আপন নাম প্রচারের পক্ষপাতী নন। এঁরা বলেন—তাতে নাকি বিদ্যের বিশেষ হানি হয়। আচ্ছা, আরও কিছু জিজ্ঞেসা করনা?'

'দরকার নেই। বাস্তবিক আজ আমার বহুদিনের একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর হল।"

'পরীক্ষার ফলটাও এ সময় জেনে নেও না কেন? ভবিষ্যতেরও একটা গণনা হয়ে থাক।'

'তুমিই জানো।'

তখন প্রথম যুবকটি সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়কে বলিল—'আমার এই বন্ধুটি এবার বি, এ পরীক্ষা দেবেন; পাশ কর্‌তে পার্‌বেন ত?'

জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় পুনর্ব্বার যুবকটির হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন—

"ইনি সসম্মানে বি এ পাশ কর্‌বেন।'

তারপর তাহারা সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে তিনিও উঠিয়া ভিতর বাড়ী চলিলেন। গৃহিণী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন; সহাস্যে মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কারা এসেছিল ওরা?'

সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় গায়ের নামাবলী খানি খুলিয়া গৃহিণীর হাতে দিতে দিতে বলিলেন—

'ওঃ! চিন্‌তে পারনি বুঝি? ও হচ্ছে বীরেন! জমিদার রামরতন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র; একটি বন্ধুকে গণাতে এনেছিল। ছেলেটি বড় ভাল, কথা-বার্ত্তা ও আচার ব্যবহারে অতি ভদ্র, গ্রামের সকলেই উহাকে খুব ভালবাসে এবং সম্মান করে।'

৪

আষাঢ় মাস। সমস্ত আকাশ খানি মেঘে আচ্ছন্ন। শেষ রাত্রি হইতে অবিশ্রান্ত ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে। বৃষ্টিপাতের বিরাম নাই। শন্ শন্ শব্দে বাতাস বহিতেছে। সূর্য্যদেব নিবিড় মেঘাবরণ বিদীর্ণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। বায়ু চালিত ধূম্র বর্ণ মেঘ খণ্ড সমূহ অতিকায় দৈত্যদলের মত আসিয়া অবিরত তাঁহার প্রকাশ পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে। পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত। স্থানে স্থানে পথের উপর একহাটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ দুর্য্যোগে বড় কেহ ঘরের বাহির হইতেছে না। পশুপক্ষীরাও

তাহাদের আবাস স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না। ইতর প্রাণির মধ্যে কেবল বর্ষাপ্রিয় ভেককুল ডোবা হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া একঘেয়ে মক্ মক্ শব্দে এই দুর্দ্দিনের পূর্ব্বাহ্নকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া একাগ্রমনে লীলাবতী পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় জমিদার রামরতন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেনবাবু অর্দ্ধসিক্ত কলেবরে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার হাতে একখানি খবরের কাগজ। সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি বাবাজী! এই দুর্য্যোগের ভিতর কি মনে করে?' বীরেনবাবু না বসিয়াই আবেগ পূর্ণ স্বরে বলিলেন—'ঠাকুর-খুড়ো! আশ্চর্য্য আপনার গণনা! ধন্য আপনার জ্যোতিষ বিদ্যা! আমার সেই বন্ধুটি সত্য সত্যই এবার অনার্সে বি এ পাশ করেছেন। আপনি যে সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে দুর্গম গিরি প্রান্তর ও অরণ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তা' আপনার সার্থক হয়েছে। আপনার গণনা অভ্রান্ত।'

"সে ভরসা ত বরাবরই আমার ছিল। কিন্তু জানি না, কোন্ কুগ্রহের ফেরে এক জায়গায় আমাকে বড় ঠক্‌তে হয়েছে।"

"সে কেমন?"

"আমি একটি ছেলের কুষ্ঠি লিখেছিলেম। তার বাপ আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'ছেলেটি আমার কেমন হবে?' আমি উত্তর দিলেম ছেলে তোমার ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী, সচ্চরিত্র ও তেজস্বী হবে। সে তখন হেসে বল্লে,—'চোর ডাকাত হয়ে কুলের মুখে কালী না দিলেই মঙ্গল, আর সব পরের কথা।' তার উত্তরে আমি দৃঢ়তার সহিত বল্লেম—'আমি ব্রাহ্মণই নই, যদি এ ছেলে কোন দিন চুরি করে।' কিন্তু বীরেন! উত্তর কালে সেই ছেলে চুরি করে জেলে গেল! আমার গণনা মিথ্যা হল, অবশেষে আমি অব্রাহ্মণ হলেম! বীরেন! আজ কয় মাস ধরে বড় অশান্তি ভোগ কর্‌ছি। এ কথা মনে হলে আমার আর অশান্তির অবধি থাকে না।

'ঠাকুর খুড়ো! কে সে?'

'সে আমাদের গ্রামেরই ঐ গণেশ গোয়ালা।'

বীরেনবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, সহসা তাহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ললাটদেশ ঘামিয়া গেল, কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, দুই তিন বার ঢোক গিলিবার পর তিনি জড়িত স্বরে কহিলেন—

'তাই ত দেখ্‌ছি।'

বীরেনবাবুর এই আকস্মিক ভাবান্তর সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি সন্ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বাবা বীরেন! কি হলো তোমার?'

বীরেনবাবু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া নিজকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইলেন। তারপর উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—'যাগ্‌গে,এ দুর্ব্বহ বেদনার ভার আর বইতে পারিনে।' তৎপর আপন চেয়ার খানি টানিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের খুব নিকটে লইয়া গিয়া ভগ্নস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'ঠাকুর খুড়ো! সে আজ ১০।১১ মাস আগেকার কথা। আমি স্বর্গীয়া পিতামহী ঠাকুরাণীর সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে বাড়ী আসি। যে দিন আবার কল্‌কেতা ফিরে যাব, তার আগের দিন রাত্রে নষ্টচন্দ্র। রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে আমি, মিত্রদের বাড়ীর হরেন ও বোসেদের বাড়ীর সুরেশ এবং যতীশ এই চারজনে হরেনের লাইব্রেরী ঘরে বসে তাস খেল্‌ছি; খেল্‌তে খেল্‌তে হঠাৎ হরেন বলে উঠ্‌ল—'থাক্‌গে এখন তাস খেলা, চল 'নষ্টচন্দ্র' করে আসি। আমি এ প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানালেম্। কিন্তু সে তা' শুন্‌ল না, আমার হাত থেকে তাস কেড়ে নিল। সুরেশও বল্‌ল, 'চল্‌না বীরেন্, একটু রগড় করা যাক্, তোকে কিচ্ছু কর্‌তে হবে না, কেবল আমাদের সঙ্গে থাক্‌বি। আর, এখন সব বেটাই শুয়ে পড়েছে।' এই বলে কোচার খুট্ ধরে তারা আমাকে টেনে নিয়ে চল্ল। তখন দুপুর রাত। ঘোষালদের বাড়ী কেউ থাকৃত না, একবেটা বুড়োমালী পাহারা দিত, সে তখন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল। হরেন ঘোষালদের নারিকেল গাছ থেকে ১৫।২০ টা নারিকেল পাড়্‌ল। তখন সুরেন বল্‌ল—'নেমে আয়' আর দরকার নেই।' তারপর তারা তিনজনে সেই নারিকেলগুলি বয়ে নিয়ে চল্ল। আমরা বরাবর হরেনদের বাড়ীর দিকে চল্‌ছি, সাম্‌নে পথের ধারে গদা নাপিতের বাড়ী। হরেন বল্‌লে—'এখানে খুব বড় এক কান্দি

মর্ত্তমান কলা আছে, আজ কালই পেকে উঠ্‌বে, একেবারে পথের ধারে!' হরেন গিয়ে তখন সেই কলার কান্দি কেটে এনে আমার ঘাড়ে চাপায়ে বল্‌লে—'নিয়ে চল্‌' তারপর আমরা পথে ভাগা ভাগি করে নেব'খন।' আমরা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় সহসা কে "চোর" "চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে তিন চারি খানি ঘর থেকে তিন চারটি লোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌ল, তাদের চিৎকারে আরও কয়েক খানি বাড়ী হতে অনেক লোক ছুটে আস্‌ল। ইত্যবসরে আমরা কতকটা দূর এগিয়ে পড়্‌লাম কিন্তু তারা আমাদের অনুসরণ কর্‌তে ছাড়ল না, "চোর" "চোর" বলে চিৎকার কর্‌তে কর্‌তে পিছু পিছু ছুটে আস্‌তে লাগল। আমরা প্রাণপণে ছুট্‌লেম, সঙ্গীদের ঘাড়ে অপেক্ষাকৃত লঘুভার থাকায় তারা আমার অনেক আগে চলে গেল। আমার স্কন্ধস্থিত প্রকাণ্ড কলার কান্দিটা সঙ্গীদের সঙ্গে সমানে ছুট্‌তে প্রতিবন্ধক জন্মাতে লাগ্‌ল। আমি তখন এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেম যে ঘাড় হতে ওটা ফেলে দিবার বুদ্ধিটা পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছিল। সঙ্গীরা ক্রমশঃ আমার দৃষ্টি পথ অতিক্রম কর্‌ল, অনুসরণকারিদের পদ শব্দ খুব নিকটে শোনা যেতে লাগলো, ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে আস্‌ল। সর্ব্বনাশ! এমন সময় সম্মুখ হ'তে কে একজন অতর্কিত ভাবে দৃঢ় মুষ্টিতে আমার ডান হাতের কব্জা চেপে ধর্‌ল। আচম্বিতে এইরূপ আক্রান্ত হওয়ায় আমার ঘাড় হ'তে কলার কাঁদিটা ধুপ করে মাটীতে পড়ে গেল। অনুসরণকারিরা পশ্চাৎ হ'তে "ঐ, ঐ, ধর ধর" বলে চীৎকার করে উঠল, আমি হাত ছাড়ায়ে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলুম। কিন্তু সব নিস্ফল হ'ল, সে বজ্রমুষ্টি, একটুও শিথিল হ'ল না, আমি তখন অষ্টমী-পূজার উৎসর্গ করা পাঠার মত কাঁপতে লাগলুম্‌। তার পর আমি মুখ তুলতেই লোকটা আমায় চিনে ফেলল। সে তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত বিস্মিত ভাবে বলল—'কে বড়বাবু! কি আশ্চর্য্য! আর ত পালায়ে সারতে লারলেন না! যেরূপ তেড়ে আস্‌ছে, তাতে আর দু'মিনিটের মধ্যেই আপনাকে ধরে ফেল্‌বে। সর্ব্বনাশ! কি কলঙ্ক! কণ্ঠস্বরে চিন্‌লেম, এ গণেশ! গ্রামের মাইনর স্কুলে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। আমি তখন ভীতি-বিহ্বল স্বরে বললেম্‌—'গণেশ! এখন উপায়?' গণেশ তখন

উদ্ধমুখে মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবল; তারপর ব্যস্তভাবে শুষ্ককণ্ঠে বল্‌ল—'বাবু, ঐ এসে পড়েছে! শিগগির পালান! বরাবর আমার পিছনের দিক, ধরে, তিলার্দ্ধ বিলম্ব করবেন না।' আমি তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নির্ব্বিঘ্নে বাটী পর্য্যন্ত পালিয়ে এলেম। তার পর ঘরের দরজা উত্তমরূপে তালা বন্ধ করে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেম।

পরদিন শয্যা থেকে উঠেই শুন্‌লেম্—গণেশ'ঘোষ কলাচুরি অপরাধে ধৃত হয়েছে। রাত্রিতে গ্রাম্য চৌকিদার ডেকে গণেশকে তাদের জিম্বায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। সকাল বেলা গণেশকে বাবার নিকট হাজির করা হ'ল, বাবা গ্রাম্য পঞ্চাইতের প্রসিডেণ্ট; তিনি আরক্ত নেত্রে চৌকিদারদিগকে বল্লেন—'যা' এক্ষুণি ওকে থানায় নিয়ে যা, চালান দিতে হবে। গ্রামের মধ্যে এ সকল দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়,—নতুবা আজ গদার কলা চুরি করেছে, কাল আবার হরের ঘরে সিঁদ দেবে।' অনেক গোয়ালা এসে এবারকার জন্য গণেশকে ক্ষমা করতে বাবার হাত পা ধরে কাঁদাকাটি করল। বাবা তখন একটু নরম হলেন বটে, কিন্তু নাপিতের দল বেঁকে বস্‌লো—'না, গণেশকে কিছুতে ছাড়া হবে না। শাস্তি দিতেই হবে।'

আপনি বোধ হয় জানেন—গত বৎসর গোয়ালারা জোট করে নাপিত-বাড়ী দই বয়ে নেওয়া বন্ধ করে। প্রতিদান স্বরূপ নাপিতেরাও গোয়ালাদের ক্ষৌরি বন্ধ করে দেয়। গোয়ালারা ভিন্ন স্থান হ'তে পশ্চিম-দেশীয় নাপিত আনায়ে আপনাদের কাজ চালাতে থাকে। কিন্তু এক দিন রাত্রে গ্রামস্থ নাপিতেরা গোপনে সেই হিন্দুস্থানী নাপিতকে গুরুতর প্রহার করায় পরদিন সে প্রাণভয়ে গ্রাম গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই হ'তে দু'দলে রীতিমত ঝগড়া চলছে। এই সামাজিক দলাদলিকে উপলক্ষ করে উভয় পক্ষে কয়েক বার হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। যা হোক্, তারপর চৌকিদারেরা গণেশকে বেঁধে থানায় নিয়ে গেল। তখন আমার হৃদয়ের এই বলটুকু হলনা যে সব কথা বাবাকে খুলে বলি। সেই মোকদ্দমায় গণেশের চারমাস জেল হয়।

তারপর গণেশ যে দিন মুক্তি লাভ করে, সে দিন আমি মহকুমায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। নানা কথার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—আচ্ছা,

গণেশ! সে দিন অতরাত্রে একাকী তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?' সে উত্তর কর্‌লে—'ঐ সময় মালী বাড়ীর একটা ছেলে জ্বর বিকারে মর মর; তার বাপ মা রাত জেগে জেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে রাতে বার বার ওষুধ খাওয়াতে হত। আমি তিন রাত ধরে, ১২টা হতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত সেখানে জাগ্‌ছিলেম।' ঠাকুর খুড়ো! তার কথা শুনে আমার বুকের পাঁজর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।' যা'হক, আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—'তখন তোমার কি পালাবার কোন উপায় ছিল না?' সে হেসে বল্লে—চেষ্টা কর্‌লে পারতুম্‌ বোধ হয়, কিন্তু তা হলে আপনাকে সেই সদর রাস্তার উপর নিশ্চয়ই ধরা পড়তে হত। আমরা চাষা ভুষা লোক, আমি না হয় পাড়ার মধ্যে ঢুকে, আস্তাকুড় ডিঙ্গিয়ে বেড়া ভেঙ্গে যেমন তেমন করে, একরূপ পালিয়ে যেতে পারতেম, কিন্তু আপনি তা কখনও পারতেন না। বিশেষতঃ গ্রামের ভিতরকার সরু সরু আঁকা বাঁকা পথ গুলিও আপনাদের তত পরিচিত নয়। আর বেটারা যেন তখন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত রুখে আস্‌ছিল; ব্যাঘ্রের মত এসেই আমার ঘাড়ের উপর পড়েছিল; চড় লাথি ও কিল পিঠে নেহাৎ কম পড়েছিল না। প্রথম রোকের মাথায় আপনি এগুলির হাত হতে অব্যাহতি পেতেন না, মানীর অপমান শিরশ্ছেদ তুল্য! আমার চোকের সাম্‌নে তাকি আমি হ'তে দিতে পারি? ঠাকুর খুড়ো! আমি খোঁজ নিয়েছি, সে এখন সেই বুড়ীকে নিয়ে মাগুরায় তার পিসীর বাড়ী আছে। আহা! কেবল আমার দুষ্কর্ম্মের জন্যই সেই নির্দ্দোষ বেচারী নিরর্থক এত লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌লে, এমন কি "চোর" নাম পর্য্যন্ত কিন্‌তে হল! মানুষের চক্ষে গণেশ চোর হল বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে প্রকৃত চোর—আমিই।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বীরেন বাবু নীরব হইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এতক্ষণ রুদ্ধ আবেগে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতেছিলেন। তারপর যখন তাহার কথা শেষ হইল, তখন তিনি সে আবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চেয়ার হইতে সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—'তবে গণেশ চোর নয়! আমার গণনায় ভুল হয়নি! ধন্য পরমেশ্বর! বাঁচালে! আজ আমার চিত্তাকাশ হতে একটা বিরাট অশান্তির মেঘ কেটে গেল! আঃ এই কয় মাস ধরে কি অশান্তিটাই না ভুগেছি!'

ব্রহ্মচর্য্য।

(শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

ব্রহ্মচর্য্যের অনভ্যাসে আমাদের এত দুর্গতি—আমরা ক্ষীণদেহ এবং হীনমতি হইয়াছি। সংযম ও সদাচার ব্যতীত স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং চরিত্রগঠন অসম্ভব। এই স্বাস্থ্য এবং চরিত্রের অভাবেই সৎসংকল্প ক্ষণস্থায়ী হয়, এবং সৎকার্য্যে উদ্যম, পূর্ণ অধ্যবসায়ের অভাব হয়। শিক্ষার দোষেই ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার লোপ হওয়া বশতঃ, আমরা সত্য, সংযম, অহিংসাদি বিষয়ে উদাসীন—বৈদেশিক শিক্ষা-প্রভাবে আমরা আচার ভ্রষ্ট এবং ভোগবিলাসে রত হইয়াছি। এই কামনা পরিতৃপ্তির জন্যই আমরা অর্থ উপার্জ্জনে এত যত্নশীল। সংযম শূন্য মন আমাদিগকে দিন দিন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। আত্মহিত এবং দেশের কল্যাণ জনক কোন সৎবিষয়েই যেন আমাদের ভোগবিলাসোন্মত্ত মন প্রবেশ করিতে চায় না, পারেও না। প্রাচীন সভ্যজাতীর বংশধরগণের পক্ষে ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযম সদাচার বিষয়ে ঘোরতর উদাসীনতার বিষয় ভাবিলে, দেশের কল্যাণ সাধন যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বর্ত্তমান তিনটী প্রধান সমস্যার সমাধান হইবে, প্রথম অন্ন সমস্যা, কারণ সংযম দ্বারা ক্ষয় নিবারিত হইয়া, অল্প, সারবান আহার্য্যেই দেহের পোষণ হইবে এবং সংযত ব্যক্তি, শ্রমশীলতা এবং কর্ত্তব্য পরায়ণতাদ্বারা অধ্যবসায়ের সহিত উদারন্ন সংস্থানে সক্ষম হইবেন। দ্বিতীয় বস্ত্র-সমস্যা—কারণ সংযমে দৃঢ়কায় ব্যক্তির শীতাতপ নিবারণে অধিক বস্ত্রাদি আবশ্যক হয় না; মহাত্মাজীর আদর্শানুযায়ী ২।৪ খানি খদ্দর বস্ত্রখণ্ড দ্বারাই পরিধান এবং অঙ্গাবরণের কাজ চলিয়া যাইবে এবং সুস্থদেহে, স্বাবলম্বী ব্যক্তি, উৎসাহে, কাপাস গাছ লাগান, সূতা কাটা এবং কাপড় বুনিতে পারিবেন। তৃতীয়—অর্থ সমস্যা—কারণ ভোগবিলাস ত্যাগী ব্যক্তির জীবনে, পান, তামাক সিগারেট, সাবান, এসেন্স, গন্ধ তৈল, পাউডার, ক্রিকেট, ফুটবল, থিয়েটার

বাইওস্কোপ, এবং পরিচ্ছদাদিতে অর্থের অপব্যবহার হইবে না; দেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন, ইহাতে দেশের অর্থ দেশেই থাকিবে এবং দেশবাসী ধনশালী হইবেন। মহাত্মাজীর মন্তব্য দুইটী হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম্ হইবে:—

"To attain Atma-Sidhi through self-less deeds, the practice of Brahmacharyya is a necessary and the best meams." I realise the grandeur of truth and Brahmacharyya. I constantly feel the importance of Brahmacharyya to be so great as to take place with truth. And it is my faith that with all these, the calamities can be wiped off."

এখন দেশবাসীগণ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণে কৃত সংকল্প হইলেই নিজের হিত এবং দেশের কল্যাণ হইবে।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী।

(শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।)

ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বার বার॥ চৈঃ ভাঃ

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন শ্রীচৈতন্য প্রভু অবতীর্ণ হন নাই। দেশ তখন একরূপ বিষ্ণুভক্তি শূন্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার তৎকালীন সমাজের এইরূপ একটী নিপুণ চিত্র তাঁহার অমর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহা দম্ভ করি॥

ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংস দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগ-পাল ভোগী-পাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণু মায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহা তমোগুণে॥ চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড

দেশের সেই দুর্দ্দিনে কিন্তু একটী সম্প্রদায় সমগ্র ভারতে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিবার ভার লইয়াছিলেন। আমরা অতীব গৌরবের সহিত বলিব, তাঁহারা; শ্রী মাধ্বী সম্প্রদায়। এই শ্রী মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত পরম ভগবদ্ভক্ত ব্যাস তীর্থের প্রধান শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতির নিকট হইতেই আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা;—

নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্র দীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার॥
নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে।
নেত্রজলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে॥
শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষা মন্ত্র দিল॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রও এই লক্ষ্মীপতির শিষ্য। সুতরাং উভয়ে গুরু ভ্রাতা হইতেছেন। কিন্তু—

নিত্যানন্দে বন্ধু জ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরু বুদ্ধি-করে নিত্যানন্দ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডে মাধবেন্দ্র বলিতেছেন—

জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি॥

অন্যত্র—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥

তখনকার ভক্তিগ্রন্থ সমূহের এক মধুর অধ্যায় এই মাধবেন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম তৎকালীন জগতে এক দর্শনীয় বস্তু ছিল।

"মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেক সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥' চৈঃ ভাঃ

তখনকার সেই বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সমাজে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইত। সুতরাং লোক সমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি বনে বনে ফিরিতে লাগিলেন, এবং কয়েক জন প্রিয় শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া কৃষ্ণ প্রেম সুখ-সিন্ধুনীরে ভাসমান থাকিতেন। 'রোম হর্ষ অশ্রুকম্প' এ সমস্ত সর্ব্বদাই তাঁহার পবিত্র শরীরে বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইত। মাঝে মাঝেহুঙ্কার, গর্জ্জন ও মহাহাস্য করিতেছেন, গাত্র স্তম্ভিত হইতেছে, আর সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়িতেছে। বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই, সর্ব্বদাই শ্রীহরির ধ্যানে চিত্ত নিরত। কি করি-তেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থির নাই। পথে চলিয়া যাইতে যাইতে খানিক দাঁড়াইয়া নৃত্য করেন' আবার কখনও বা সুমধুর কণ্ঠে মধুর হরিধ্বনি করিতে থাকেন। কখনও বা তাঁহার পরমানন্দে এরূপ মূর্চ্ছা হয় যে দুই তিন প্রহরেও মধ্যে ফিরিয়া আসেন না। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে এরূপ রোদন করিতে থাকেন যে দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী নয়ন-হইতে নির্গলিত হইতেছেন।

"কখন হাসেন্ত অতি অট্ট অট্ট হাস,
পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগ্‌বাস ॥
এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী ॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তার মতি ॥
কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড।

এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে একদা তাঁহার সহিত অদ্বৈত আচার্য্যের সাক্ষ্যাৎ হয়। আচার্য্যও "বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার" অপার দুঃখে ভাসিতেছিলেন। তিনি শিষ্য মণ্ডলীর নিকট, নিরন্তর গীতা ভাগবত পড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে ভক্তি যোগের ব্যাখ্যা করিতেন। এমনই সময় একদিন মাধবেন্দ্র পুরী আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হন। তিনি আগন্তুকের, বৈষ্ণবোচিত লক্ষণ দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলেন, পুরী গোসাঞিও তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া "সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে।' তাহার পর যে কৃষ্ণ কথায় হিল্লোল উঠিল তাহাতে উভয়ে ভাসিয়া চলিলেন। যাহার প্রেম বর্ণনাতীত, মেঘ দর্শনে যিনি মূর্চ্ছিত হইতেন, কৃষ্ণনাম কর্ণে পশিলে যিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন, ক্ষণেকে যাহার শ্রীঅঙ্গে সহস্র কৃষ্ণ বিকার প্রকাশ পাইত, সেই অগ্রগণ্য প্রেমিক মাধবের সহিত মিলিত হইয়া অদ্বৈত প্রভু পরম পুলকিত চিত্তে তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং অদ্বৈত প্রভু তাঁহার একজন মন্ত্র শিষ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোক সমাজে তিনি সুখ না পাইয়া তীর্থে তীর্থে অথবা অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। কৃষ্ণ নামই তাঁহার সঙ্গী, শ্রীকৃষ্ণের গুণ গানেই তাঁহার সুখ। এইবার আমরা আমাদের নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার মিলনের কথা বলিতেছি। আপনারা জানেন প্রভু আমাদের তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, জনৈক অবধুতের সহিত গৃহত্যাগ করেন। তিনি নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইরূপ সময়ে একদা এই উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের সহিত মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। নিতাই তাঁহাকে চিনিতেন না, দেখিলেন বহুশিষ্য পরিবেষ্টিত একটী প্রশান্ত মূর্ত্তি ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন, সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর কলেবর প্রেমময়, আর তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত অনুচর আছেন তাঁহারাও সকলে প্রেম ময় তাঁহাদের আহার কৃষ্ণ রস। অনবরত দেহে কৃষ্ণের বিকার হইতেছে। অদ্বৈত আচার্য্য যাঁহার মন্ত্র শিষ্য সেই মাধবেন্দ্রের প্রেমের বড়াই আমরা আর অধিক কি করিব। মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীপাদ পুরী গোসাঞিরও সেই দশা ঘটিল। তাঁহাদের উভয়কে চেতনা শূন্য হইতে দেখিয়া ঈশ্বর পুরী আদি শিষ্যগণ আনন্দাতিশয্যে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে চেতনা পাইয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কখন প্রেমরসে বালুকায় গড়াগড়ি দিতেছেন, কভুবা কৃষ্ণ প্রেমের আবেশ হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। উভয়ের নয়ন হইতে প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। শ্রীঅঙ্গে কম্প, অশ্রু ও পুলক ভাব কত যে প্রকাশ পাইতেছে তাহার অন্ত নাই। এ দৃশ্য দর্শনে সহজেই অনুমিত হয় যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সর্ব্বদাই তাঁহাদের দেহে বিরাজ করিতেছেন।

উভয়েই মহাপ্রেমিক, সুতরাং উভয়ের মিলনে উভয়ে মহানন্দ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বক্ষে ধারণ করিলেন, আর প্রেমানন্দে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। এই যে এতদিন সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, আজ তাঁহার সে উদ্বেগের শান্তি হইল। নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার প্রীতি এতদূর বদ্ধ হইয়াছে যে তাঁহাকে আর বক্ষ হইতে নামাইতে পারিতেছেন না।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "আমি এত দিন যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি, তাহা আজ সফল হইল; যেহেতু মাধবেন্দ্র পুরীর চরণ দর্শন করিতে পারিলাম।"

"নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক তাহার ফল পাইলাম তত॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥ চৈঃ ভাঃ

আর মাধবেন্দ্র—

"---নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে কণ্ঠ রুদ্ধ প্রেম জলে॥

কতক্ষণ পরে বলিলেন—

"—প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ স্নেহ প্রেম যথা॥
জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে আমার প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময়।
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেইজনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥" চৈঃ চঃ

উভয়ের প্রেমে বদ্ধ হইয়া বহুদিবস উভয়ে একত্রে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত, দিবারাত্র কোথা দিয়া যাইতেছে জানেন না। কতক দিবস একত্রে অবস্থান করিয়া, মাধবেন্দ্র সরযূতে স্নান করিতে এবং নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ দর্শনার্থ গমন করিলেন।

শ্রীল ব্যাস মহাশয় ইহাদের মিলন কথা বর্ণনা করিয়া ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন।"

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেম-ভক্তির যে বীজ রোপন করিয়া যান, কালে তাহা শ্রীচৈতন্য রূপী ফলবান মহাদ্রুমে পরিণত হয়। তাহার দুই স্কন্ধে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং বহু শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিল। মাধবেন্দ্রের অন্যান্য শিষ্যগণ;—

পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণু পুরী কেশব পুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥

ভুবনপাবন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

'শ্রীচৈতন্যদীপিকা' গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ধ্যান মন্ত্রে এ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

' ততো ধ্যায়েৎ যথা ওঁ আশ্চর্য্যং যস্য কন্দো যতি মুকুটমণি মাধবাখ্যা মুণীন্দ্রঃ শ্রীলাদ্বৈত প্ররোহস্ত্রিভুবন বিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ। শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময় বপুষঃ স্কন্ধ শাখা স্বরূপো বিস্তারো ভক্তি যোগঃ কুসুম মথফলং প্রেমনিষ্কৈতবং যৎ॥ তং হরি হরি ভক্তিযোগ শিক্ষা সংসম নাজগদেব নিস্পুণান্। হরি হরি কনকাম্বুকান্ত কান্তিদ্বিজ ভবনেহ বতার বাললীলঃ॥ আয়মানঃ পূর্ণিমায়াং মুপরাগচ্ছলেন যঃ। গ্রাহয়ামান যুগপৎ হরের্নাম জগজ্জনান্ ইতি ধ্যাত্বা॥"

"ধ্যান যথা, আশ্চর্য্য শ্রীচৈতন্য বৃক্ষের মূল স্বরূপ মুনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং ত্রিলোক বিখ্যাত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে বৃক্ষের প্ররোহ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাহার স্কন্ধ দেশ, রসময় শরীর শ্রীমদ্বক্ত বক্রেশ্বর প্রভৃতি যাহার বিস্তৃত শাখা স্বরূপ, ভক্তিযোগ যাহার পুষ্প এবং প্রেমই যাহার অতি উত্তম ফল, বারংবার হরিনাম দ্বারা সকলের মনকে আর্দ্রীভূত করিয়া যিনি জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। গ্রহণ ছলে পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণ গৃহে সাক্ষাৎ সেই ভগবান হরি এককালীন জগৎ জনকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন সেই গৌরাঙ্গ প্রভুকে আমি নিরন্তর ধ্যান করি।

শ্রীমহাপ্রভুর গুরু পরম্পরা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীপাদ মাধবাচার্য্যের বংশধর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবত রত্ন মহাশয় তাহার উপাদেয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমন্মধ্ব মুনেঃ শিষ্যো পারম্পর্য্যানুসারতঃ।
মাধবেন্দ্র পুরী নাম তথেশ্বর পুরী স্বয়ং॥

মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্যৌ নিত্যানন্দাদ্বৈত চন্দ্রৌ।
ঈশ্বর শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ॥
দীক্ষিতা প্রভুনাতেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং
সিদ্ধোমন্ত্রে যদি পতিস্তদা পত্নীং সদীক্ষয়েৎ
ইতি শাস্ত্র বলাদ্ধেতোঃ স্বভার্য্যামুপদিষ্টবান্।
অথ তং যাদবাচার্য্যং সর্ব্বেষাং ন পরং গুরুং॥
সানুজং দীক্ষয়া মাস কৃপয়া শক্তি রীশিতুঃ।
যাদবাচার্য্য শিষ্যোঽভূৎ মাধবাচার্য্য আত্মবান্॥
তস্য শিষ্য প্রশিষ্যানু শিষ্যাবয় মিহ স্মৃতাঃ॥
সং প্রতিষ্ঠা পনায়াসৌ নৈজীং প্রতিকৃতিং ততঃ।
ভার্য্যামাজ্ঞায় ভগবান্ বভূবান্তর্হিতঃ প্রভুঃ॥

প্রথমতঃ পরম্পরা ক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী আর ঈশ্বরপুরী। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু এবং ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীমহাপ্রভু; তিনি আপনার ভার্য্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দীক্ষা প্রদান করেন; কারণ যদি সিদ্ধ মন্ত্র হয় তবে আপন পত্নীকেও দীক্ষা দিতে পারা যায়। এই তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রবল হেতু তিনি পত্নীকে উপদেশ করিয়াছেন, অনন্তর আমাদিগের পরম গুরু শ্রীযাদবাচার্য্য ঈশ্বরের শক্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে দীক্ষিত হন। সেই যাদবাচার্য্যের শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে আমাদিগের সম্প্রদায় সিদ্ধ প্রণালী ইতি।

পূজ্যপাদ ভাগবত রত্ন মহাশয় বলিতেছেন—"মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ" প্রকৃত কথা তাহা নহে। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দের গুরুভ্রাতা তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি।

মাধবেন্দ্র পুরী অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন। সুতরাং কোন বিধি নিষেধের ধার ধারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাবন্দন! ভদ্রমস্তু ভবতো ভো স্নান! তুভ্য নমঃ
ভো দেবা পিতরশ্চ! তর্পণ বিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাং।

যত্রকাপি নিষাদ্য যাদব কুলোত্তমস্য কংস দ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥

(পদ্য বল্যাং)

সন্ধ্যা বন্দনা! তুমি কুশলে থাক. ত্রিসন্ধ্যা স্নান! তোমাকে নমস্কার, পিতৃগণ, আমি তর্পনা দিতে অক্ষম আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যে কোন স্থানে বসিয়া যদু কুলোত্তম কংসরিপু শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া সমস্ত ঋণভার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইব, আমার অন্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক কি ?

বাস্তবিক অনুরাগী ভক্তের আর লৌকিক বিধির আবশ্যক কি, শ্রীগৌর প্রেমের জ্বলন্ত মাধুরী, যাঁহার হৃদয় মন্দিরে অনুক্ষণ জাগরিত রহিয়াছে তিনি নিত্য মুক্ত। আমরা অনুরাগী ভক্তের একটি পদ এখানে উঠাইয়া দিতেছি—

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরাচাঁদ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেমকান্তি কলেবর,
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥
পলকে না হেরি তায়, পাজর ধসিয়া যায়,
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের তুলি দিয়ে, অন্তর বাহির হিয়ে,
না জানি তার কত ধার ধারি॥
সুরধুনী-নীরে যেয়ে, কুল দিব ভাসাইয়ে,
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সমুখে করি, দেখিব নয়ন ভরি,
বাসু নহি চায় আন কাজ॥

'দণ্ডে দণ্ডে তিলে তলে' প্রাণনাথের চাঁদমুখ না দেখিয়া যিনি মরমে মরিয়া যান, তাঁহার ভাগ্যের সীমা দেখিনা। আমাদের শ্রীল মাধবেন্দ্রও এইরূপ এক-জন উৎকৃষ্ট ভক্ত ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেঘ দর্শনে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়িত এবং প্রেমে অচেতন হইতেন। মাধবেন্দ্রের কথা হইলে

প্রভু আনন্দে গদ গদ হইয়া বাহ্য হারাইতেন। তিনি এখন শ্রীবৃন্দাবনে যান তখন কৃষ্ণদাস নামক একজন বিপ্র তাঁহার চরণ কমলে প্রণত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রেম যোগ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত প্রেম কোথায় পাইলে?" ব্রাহ্মণ বলিলে "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থ ভ্রমণ পথে মথুরায় আমার বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাকে শিষ্য করেন। আর তদবধি আমি ধন্য হইয়াছি।" দেখুন প্রেমিকের কি বিচিত্র ভাব! কি সম্মোহিনী শক্তি!! তখন দুই জনে বাহুতে বাহু বাঁধিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু অনেক সময় মাধবেন্দ্রের আখ্যান ভক্তগণেকে শুনাইতেন। একদা মাধবেন্দ্র শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরিভ্রমণ এবং গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করিয়া এক বৃক্ষমূলে ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। আহারের চেষ্টা মাত্র নাই। কিন্তু ভক্তের ভগবান ভক্তের নিমিত্ত সদাই ব্যস্ত। তিনি স্বীয় "বহাম্যহং" (ক) শ্লোকের সাক্ষ্য দিতে অতি সত্বর এক অভিনব এবং অতি সুন্দর গোপবালকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া তথায় আগমণ করিলেন। আর মধুর হাস্য করিয়া পুরী গোসাঞিকে বলিলেন,—"তুমি কি চিন্তা করিতেছ?' ভিক্ষা এবং আহার কর না কেন? নাও এই দুগ্ধ পান কর।" এই প্রিয় দর্শন বালকটীকে দেখিয়া, এবং ততোধিক তাহার মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে, শিশির সুস্নিগ্ধ নব প্রভাতের তরুণ আলোকবৎ বালকটীর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, তুমি কে? তোমার নিবাস কোথায়? আমি যে উপবাস করি এ কথা তুমি কিরূপে জ্ঞাত হইলে? বালক তখন সুধা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন,—"আমি জাতিতে গোয়ালা, এই স্থানে আমি বাস করি, আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না। সকলেই স্বীয় স্বীয় আহার্য্য আহরণ করিয়া লয়। আর যে তাহা পারেনা। আমি তাহার গৃহে খাদ্য দ্রব্য বহণ করিয়া দিয়া আসি।" (খ) আবার কপট করিয়া বলিতেছেন,—"স্ত্রীলোকেরা জল লইতে

(ক) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥ গীতা ৯ম অধ্যায়।

(খ) অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার। চৈঃ চঃ মধ্যলীলা

আসিয়াছিল, তাহারা তোমাকে উপবাসী দেখিয়া আমাদ্বারা দুগ্ধ পাঠাইয়া দিল। আমাকে গাভী দোহন করিতে হইবে, সুতরাং চলিলাম। তুমি এই দুগ্ধ পান কর, আমি ভাণ্ড লইতে আবার আসিব।" বলিতে বলিতে বালকরূপী শ্রীভগবান দুরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। মাধবেন্দ্র ইহাতে অতীব বিস্মিত হইলেন। দুগ্ধ পান করিয়া সোৎসুক নেত্রে বালকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক আর আসিলেন না। অনন্তর তিনি বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতে লাগিলেন। আমরা জানি লীলাশুক মহাশয়কেও শ্রীভগবান এইরূপে বালকবেশে দর্শন দিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। অহো! মাধবেন্দ্র পুরীর কি সৌভাগ্য!

"বসি নাম লয় পুরী, নিদ্র নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল,—বাহ্য বৃত্তি-লয়।" চৈঃ চঃ

তিনি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেই বালক একটি কুঞ্জ মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমার সহিত আইস"—এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া একটী কুঞ্জের মধ্যে লইয়া গেলেন; আর বলিতেছেন "দেখ আমি এই কুঞ্জেতেই থাকি, শীতাতপ, বারিধারা ও দাবাগ্নিতে আমি কাতর হই। গ্রামের লোকের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া এই পর্ব্বতের উপর একটী মঠ স্থাপন করিয়া তুমি আমার সেবা প্রকাশ কর। বহুদিন আমি স্নান করি নাই; তুমি শীতল জলে আমায় স্নান করাইও। দেখ, বহুদিন হইতে আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি যে কবে আমার প্রিয় মাধব আসিয়া আমার সেবা করিবে। তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়া আমি তোমার সেবা অঙ্গীকার করিতেছি—আর তখন জগদ্বাসী আমাকে দর্শন করিয়া উদ্ধার হইতে পারিবে। আমি সেই বৃন্দাবন বিহারী নন্দ নন্দন, বজ্র (গ)

(গ) ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্ন তনয় অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংশ হইলে পর অর্জ্জুন ইহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যান এবং তথাকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পুত্রের নাম প্রতিবাহু। লেখক।

আমাকে স্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব্বে আমি পর্ব্বতের উপরেই ছিলাম কিন্তু আমার সেবক ম্লেচ্ছভয়ে আমাকে এই কুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া পালাইয়া গিয়াছে। আর সেই হইতে আমি এই স্থানেই আছি। তুমি আসিয়াছ ভাল হইয়াছে, আমাক সাবধানে এই কুঞ্জ হইতে বাহির কর।” এই বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইলেন। তখন মাধবপুরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছেন,—“হায়! আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না।” আর প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রবল বেগে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

তখন ভোর হইয়াছে। তিনি চেষ্টা করিয়া স্বীয় ভাব সম্বরণ করিলেন, যেহেতু প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। পরে স্নান করিয়া আসিয়া গ্রাম বাসীকে বলিলেন—“দেখ, তোমাদের ঈশ্বর সেই গোবর্দ্ধনধারী শ্রীহরি, কুঞ্জের মধ্যে আছেন, চল সকলে মিলিয়া গিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনি।” কিন্তু কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথ নাই—চারিদিকে নিবিড় বন। লোক সকল আনন্দিত মনে কুঠার কোদালি প্রভৃতি লইয়া আসিল, আর তদ্দারা পথ প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, প্রকৃতই তাঁহাদের সেই গোবর্দ্ধন ধারী শ্রীহরি, মাটী তৃণ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, অবস্থান করিতেছেন। সকলে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত, কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। তখন আচ্ছাদন দূরীভূত করিয়া বলবান লোকগণের সাহায্যে, ঠাকুরকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যাওয়া হইল। প্রকাণ্ড ঠাকুর, তাঁহাকে তদুপযুক্ত এক প্রকাণ্ড সিংহাসনের উপর বসাইয়া, পৃষ্ঠে এক বড় পাথর অবলম্বন দেওয়া হইল। নয়শত নূতন ঘট আসিল, গ্রাম্য ব্রাহ্মণেরা সেই নূতন ঘটদ্বারা গোবিন্দ কুণ্ড হইতে জল আনিলেন। নানারকম বাদ্য বাজিতেছে, স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতেছে, আবার কেহ বা নৃত্য করিতেছে। এইরূপে মহা মহোৎসব হইল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পুষ্প, বস্ত্র প্রভৃতি যে কত আসিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। অভিষেক কার্য্য আরম্ভ হইল। মাধবপুরী নিজ হস্তে ঠাকুরের অভিষেক করিলেন। প্রথমে গাত্র ধৌত করিয়া অঙ্গমলা দূর করা হইল, বহু তৈল দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ করা হইল। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া তাঁহার অঙ্গে শত ঘট জল ঢালা হইল। পুনরায় তৈল মাখাইয়া গন্ধোদকে স্নান

সমাপ্ত হইল। সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিয়া বস্ত্র, চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি পরাইয়া দিলেন। পুরী গোস্বামী, প্রাণের সহিত ভক্তি করিয়া দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ প্রভৃতি যাহা কিছু আসিয়াছিল তদ্দ্বারা ঠাকুরের আরতি করিলেন এবং দণ্ডবৎ হইয়া নিজকে সমর্পন করিয়া দিলেন। গ্রামের লোক— তাঁহাদের যত তণ্ডুল, ডাল ও গোধুমচূর্ণ ছিল সমস্ত আনিয়া পর্ব্বত পূর্ণ করিয়া দিল। কুমারের ঘরে যত মৃৎপাত্র ছিল সমস্তই আসিল। প্রাতঃকালে গ্রাম হইতে দশজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিলেন। এই রন্ধন যে কত রকমের এবং তাহার পরিমাণ যে কত আমরা তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন নব বস্ত্রের উপর পলাশের পাত রাখিয়া তদুপরি স্থাপিত হইল। অন্নের পার্শ্বে রক্ষিত রুটিররাশি রহিয়াছে দেখিয়া বোধ হইল যেন পর্ব্বতের পার্শ্বে উপপর্ব্বত স্থাপিত হইয়াছে। আর,—

তার পাশে দধি দুগ্ধ মঠো শিখরিণী।
পায়স মথনী সব পাশে ধরি আনি॥
হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পন॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধা গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর অঙ্গস্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাই গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥

চৈঃ চঃ

তখন পুরী গোস্বামীর আদেশ ব্রাহ্মণগণ গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা-গণকে প্রসাদ ভুঞ্জাইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে যাহারা গোপাল দর্শনে আসিয়াছিলেন তাহারাও প্রসাদ খাইয়া গেলেন। পুরীর অপূর্ব্ব প্রভাবে সকলেই চমৎকৃত হইল। আর তাঁহার সঙ্গগুণে সকলেই বৈষ্ণব হইল। পুরী গোস্বামী

সমস্ত দিনই উপবাসী ছিলেন, রাত্রে ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া কিছু দুগ্ধ পান করিলেন। মহোৎসব কার্য্য এই এক দিনে সম্পূর্ণ হইল না, প্রত্যহই চলিতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে এক এক দিন এক এক গ্রামের লোক আসিয়া মহোৎসব করিয়া যাইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত নানা দূরদেশের লোক গোপাল প্রকট হইয়াছেন শুনিয়া নানা দ্রব্য লইয়া আসিতে লাগিলেন। গোপাল যে ব্রজবাসিগণের প্রাণ, সেই গোপালের আবির্ভাবে তাঁহারা যেন নব জীবন লাভ করিল। গোপালেরও ব্রজবাসিগণের প্রতি কত স্নেহ তাহা কি বলিবার! এক কথায় উভয়ে উভয়ের ভালবাসায় বদ্ধ।

মথুরায় বড় বড় ধনীর বাস। তাহারা ভক্তি করিয়া নানা দ্রব্য ঠাকুরকে দিয়া যাইতেছে। 'স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য' প্রভৃতি নিত্য অসংখ্য আসিতেছে! এইরূপে ক্রমশঃ গোপালের সুন্দর মন্দির, পাক গৃহ, চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। ব্রজবাসিগণ সকলেই গোপালকে গাভী দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সহস্র সহস্র গাভী হইয়াছে। এখন গোপালের রাজার ন্যায় সেবা চলিতেছে, মাধবপুরীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইহার মধ্যে গৌড়দেশ হইতে দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, মাধব তাঁহাদিগকে শিষ্য করিয়া সেবার ভার দিয়াছেন। অনুষ্ঠানের আর কোনদিকে কোনরূপ ত্রুটী নাই।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইয়া গেলে একদিন পুরী গোস্বামী স্বপ্ন দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "গোসাঞি, আমার দেহ শীতল হয় না, তুমি নীলাচল হইতে সুগন্ধি মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। এ কার্য্যের ভার অন্যের উপর না দিয়া তুমি নিজেই গমন করিবে।" তিনি, ঠাকুরের প্রত্যাদেশ বাণী অবগত হইয়া পরমানন্দ মনে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়েই কয়েক দিবসের জন্য, তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভু তাঁহার অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম দর্শন পূর্ব্বক, সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া ধন্য হন।

নানা তীর্থ ভুমি অতিক্রম করিয়া, গোস্বামী আবার চলিতে লাগিলেন, পথে রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন করিতে গেলেন। গোপীনাথের অঙ্গ-মাধুরী তুলনা রহিত; তিনি দেখিয়া মোহিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন এবং পরে জগমোহনে বসিয়া গোপীনাথের ভোগের বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন; দেখিলেন ঠাকুরকে যে সমস্ত ভোগ দেওয়া হয়, তাহা অতি উত্তম। মনে মনে সংকল্প করিলেন যে তিনি শ্রীগোপালেরও ঐরূপ ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। সন্ধ্যাকালে অমৃত কেলি নামক ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয়। অপর কোন দেব মন্দিরে ঐরূপ ভোগের বন্দোবস্ত নাই। যথাকালে নিয়ম মত বারপানি ক্ষীর ভোগ দেওয়া হইল। এই যে ভুবন বিখ্যাত ক্ষীর, ইহার আস্বাদ কিরূপ তাহা জানিবার জন্য গোসাঞির মনে বাসনা জন্মিল। ইচ্ছা এই যে, ইহার তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার ঠাকুরের জন্য ঐ মত ভোগের বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু মনোমধ্যে এই লোভের উদয় হওয়ায় তিনি লজ্জিত হইলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥
প্রেমামৃত তৃপ্ত—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥ চৈঃ চঃ

মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গ্রামের শূন্য হাটে গমন করিয়া, শ্রীহরির ভুবন মঙ্গল নাম কীর্ত্তনে রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে ভোগ দিয়া পূজারী শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর তাঁহাকে স্বপ্নে বলিতেছেন, "উঠ, আমার নিচোল বস্ত্র মধ্যে একখানি ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছি, তোমরা আমার মায়ায় তাহা জানিতে পার নাই। ইহা লইয়া তুমি বাজারে যাও; দেখিবে মাধবেন্দ্র পুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসী নামকীর্ত্তনে নিশি যাপন করিতেছেন, তিনি আমার প্রিয়জন, তাঁহাকে দাও।" পূজারী তাঁহার দেবতার আদেশ বাণী অবগত হইয়া, আনন্দে অবশ চিত্ত হইলেন; এই অপূর্ব্ব ভক্ত

প্রবরকে দেখিতে বলবতী বাসনা জন্মিল। তিনি ঠাকুরের ধড়ার অঞ্চলে লুক্কায়িত, ক্ষীর খানি লইয়া গমন করিলেন, এবং মাধবকে তল্লাস করিয়া তাহার সম্মুখে উহা স্থাপন করিলেন আর বিনীতভাবে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "গোসাঞি আমাদের মুরলীধারী গোপীনাথ আপনার নিমিত্ত এই ক্ষীর চুরি করিয়া ধড়ার অঞ্চল মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি আস্বাদ করিয়া ধন্য হউন।'

ঠাকুর তাঁহার ভক্তের নিমিত্ত, ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই সেই দিন হইতে তাঁহার নাম হইল—"ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।" (ক্রমশঃ)

৺দুর্গাচরণ নাগ।

(শ্রীরাজকুমার সেনবর্ম্মা)

বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতার সৃষ্টি মধ্যে সময় সময় কত অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা না সংঘটিত হইতেছে? তিনি যে কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা কি ভাবে কি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা মানব সাধারণের বুদ্ধির অগোচর। আজ যে মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব, তাহা দ্বারা ভগবান দেখাইছেন যে এই ঘোর কলিযুগের অবসান সময়ে,—যে যুগে এক পাদ ধর্ম্ম ও ত্রিপাদ পাপের প্রাদুর্ভাব, যে কালে যুগ মাহাত্ম্যে পাপের প্রবল প্রভাবে পদে পদে ধর্ম্ম লাঞ্ছিত ও পরাভূত হইতেছে, যে সময় সংসারের মায়া মুগ্ধ মানব অকাতরে সনাতন সত্যধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক পাপ পিশাচের প্ররোচনায় অহরহ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পবিত্র সংসারাশ্রমকে নিরয় নিকেতন করিয়া তুলিতেছে,—সেই সময়ও, সেই মেঘাচ্ছন্ন ঘোর তমসাবৃত তামস,

নিশীথেও প্রদীপ্ত বিদ্যুচ্ছটা সদৃশ মহাতপা রাজর্ষি জনকের মত মহাপুরুষ শোক দুঃখময় মর্ত্ত্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; দেখাইয়াছেন যে ইহকালেও বন্ধু বান্ধব বনিতা পরিবৃত সংসারের প্রলোভনের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া মানুষ কেমন করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন—দেখাইয়াছেন কাঙালের ঘরে কেমন করিয়া দেব দুর্লভ মহানিধির আবির্ভাব হয়।*

পুণ্য সলিলা শীতলক্ষা প্রবাহিনীর পশ্চিম পাড়ে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের পশ্চিম দিকে ঈষদূন এক ক্রোশ মধ্যে দেভোগ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে ১২৫৩ সনের ৬ই ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ তিথীতে শ্রীমৎ দুর্গাচরণ নাগ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ নাগ। মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। অষ্টম বর্ষ বয়সে দুর্গাচরণ মাতৃহীন হইলে তাঁহার পিসীমা তাঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন-পালন করেন। বাল্য হইতেই যে তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে সত্য নিষ্ঠার বীজ সতেজে অঙ্কুরিত হইয়াছিল একটী ঘটনাই তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে। একদা খেলার সময়ে অপর পক্ষকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার পক্ষীয় সঙ্গিগণ তাঁহাকে একটী মিথ্যা কথা বলিতে বার বার অনুরোধ করে; কিন্তু তিনি কিছুতেই মিথ্যা বলিতে স্বীকার করিলেন না। সে জন্য তাহাদের হার হইল। তাহাতে তাঁহার ঐ সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধান ক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার রক্তপাত করিয়া দেয় এবং বলে—"আবার তোমার সত্য কথায় আমাদের হার হইলে এর চেয়ে অধিক শাস্তি দিব।" তিনি রক্তাক্ত শরীরে গৃহে ফিরিলেন। পিতা ও পিসীমা, এরূপ অবস্থা কেন হইল পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া পাড়ায় একটা গোলমাল হইবে বলিয়া তিনি ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ করেন নাই।

তাঁহার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার সময় উপস্থিত হইল। তিনি নারায়ণগঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন। তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাঁহাকে

---

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সাধু নাগ মহাশয়" নামে এই মহাপুরুষের যে জীবন চরিত লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রবন্ধের অনেক কথা লিখিত হইয়াছে কিন্তু মধ্যে মধ্যে লেখকের নিজ জ্ঞাত সারেও কতক বৃত্তান্ত বিরচিত হইয়াছে। লেখক।

ঐ স্কুল ছাড়িতে হইল—কারণ ঐ শ্রেণীই ঐ স্কুলের উচ্চতম শ্রেণী ছিল। পরে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে গেলেন। ঐ স্কুল তাঁহার বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। প্রতিদিন পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সকালে বাড়ী হইতে খাইয়া যান, আর বৈকালে স্কুল ছুটীর পর বাড়ীতে রওনা হন। যাতায়াতে দৈনিক দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর। তিনি ১৫ মাস নর্ম্মাল [illegible]। [illegible] ১৫ মাস [illegible] মাত্র দুই দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত [illegible]। [illegible] প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রশ্মি, বিদ্যুৎভাসিত [illegible] ঝঞ্ঝাবায়ু বৃষ্টি প্রবাহ [illegible] এই বালকের গতি রোধ করিতে পারে [illegible]। [illegible] অবস্থা [illegible] আমরা [illegible] অমানুষিক কষ্ট সহিষ্ণুতা [illegible] চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নর্ম্মাল স্কুলের একজন শিক্ষক তাঁহাকে [illegible] পদব্রজে যাতায়াত করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "বাবা! আর [illegible] না। না হয় আমার এখানে থাকবে, [illegible] খাওয়াইব" তিনি উত্তর দিলেন "আমার কোন [illegible]।"

নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া তিনি [illegible] অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। "[illegible]" [illegible] পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। [illegible] উদ্দেশ্যে রচিত হয়। ভাষা প্রাঞ্জল ও বালকগণের [illegible]।

পরে তিনি কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল [illegible] ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার পিতা ভোজেশ্বরের পালবাবুদের [illegible] করিতেন। [illegible] বাসা ছিল। তিনি সে বাসায় থাকিয়া [illegible]। কয়েক দিন পরে মেডিকেল স্কুল ছাড়িয়া ডাক্তার [illegible] নিকট হোমিওপেথিক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। [illegible] চিকিৎসায় তিনি কৃতীত্ব লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার [illegible] লাগিল বটে কিন্তু তাঁহার বাহ্যাড়ম্বর ছিল না তাঁহার পিতা [illegible] পরিচ্ছদ কিনিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন। "আমার [illegible] দরকার নাই। ঐ টাকা দিয়া কোন গরীব দুঃখীর সেবা করিলে [illegible] দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তোর দ্বারা আমার বহু [illegible]। এখন দেখিতেছি যে আমি আত্ম-বঞ্চিত হইয়াছি। তুই যে দরবেশ হতে চ'লেছিস।"

তিনি একদিন একটী গরীবকে চিকিৎসা করিতে যান। গিয়া দেখেন রোগী একটা ছেড়া কাঁথা গায়ে দিয়া খোলার ঘরে পড়িয়া আছে। ৩।৪ ঘণ্টা শুশ্রূষার পরে দেখিলেন এই শীতকালে, খোলার ঘরে ছেড়া কাঁথা গায় দিয়া থাকিলে রোগীকে আরোগ্য করা অসম্ভব। ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহার ভাগলপুরী খেলাত দিয়া রোগীকে জড়াইয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন রোগীর বাড়ী আসিলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন "আমার চেয়ে তোমার শীতবস্ত্রের বেশী দরকার, এজন্য তোমাকে এই খেলাত দিয়ছি।" দীন দয়াল এ বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং পরদিন আর একখানি শীতবস্ত্র আনিয়া পুত্রকে দিলেন। (ক্রমশঃ)

সমাজে নারীর স্থান।

(শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়)

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার কল্পে আজকাল এক শ্রেণীর লোক বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। দেশের মহা সুলক্ষণই বলিতে হইবে। কবিও গাহিয়াছেন—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

আমরা শিক্ষা বিস্তার করিয়া মাতৃজাতিকে জাগাইব তবে আমাদের দেশের সুদিন আসিবে, সে দিন যে কত সুদূরে তাহা কল্পনারও অতীত। যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া স্ত্রী জাতির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত না হইবে তত দিন সমাজের একটী পদ চিরপঙ্গু হইয়া থাকিবে। শুধু স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে একটা দুরাকাঙ্ক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে এবং যত দিন না স্ত্রী জাতিকে মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার দান করা হয় তত দিন স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার করিয়া সমাজে একটা বিপ্লব-বহ্নির সৃষ্টি করা হইবে মাত্র। স্ত্রীজাতি শিক্ষায় উন্নত হইয়া আপনাদের ন্যায্য অধিকার আদায়

করিয়া লইবে এবং স্ত্রী-পুরুষ তখন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে,— সুদূর ভবিষ্যতের সেই দিনের অপেক্ষা করিতে করিতে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির চিহ্ন কি সমাজ হইতে একেবারে লোপ পাইবে না? গৃহে গৃহে আমাদের চক্ষের সম্মুখে মাতৃজাতির প্রতি যে অবহেলা উপেক্ষার ভাব প্রদর্শিত হইতেছে, আমরা তাহা ক্ষয় জনে লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ের প্রতিকার করে একটু মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া থাকি! পল্লী-কবি গোবিন্দদাস মহিলা কুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত কাতর-কণ্ঠেই গাহিয়াছিলেন—

বাবা থাকুক আমার বিয়ে,

* * * * *

আবার যদি জন্মে মেয়ে দিও গঙ্গায় ভাসাইয়ে।

* * * * * *

রাজপুতনার মত, করবো না হয় জহরব্রত,

তারাও নারী মোরাও নারী নারীর রক্ত দিয়ে।"

আজকাল দেশে দেশে জহর ব্রতের অভাব নাই। নারী-নির্য্যাতন কাহিনী পত্রিকার স্তম্ভে লাগিয়াই আছে। এই গুলো প্রকাশ্য ঘটনার বিবরণ। কিন্তু ঘরে ঘরে এরূপ নিদারুণ নির্য্যাতন কত নারী নীরবে সহ্য করিয়া শুধু অদৃষ্টের উপর আত্মনির্ভরশীল হইয়া দুঃখের দিবসগুলি কোনমতে কাটাইয়া দিতেছে। আমি একটী চাক্ষুষ ঘটনার কথা এই স্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেবল বিবাহিতা রমণী পারিবারিক নির্য্যাতনের হাত হইতে চির মুক্ত হইবার কামনায় সর্ব্ব শরীর কেরোসিন সিক্ত বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে আবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। হঠাৎ বাড়ীর লোক টের পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। অর্দ্ধদগ্ধ দেহ নিয়া রমণী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দুই দিবস কর্ত্তন করিয়া শোক তাপের অতীত রাজ্যে চলিয়া যান। এই দুই দিবস এই হতভাগিনী রমণী বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। কিন্তু এই অপমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুধু কপালে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেন, ইহা তাঁহার প্রাক্তন। পরিবারের অপযশ হইবে ভাবিয়া রমণী পরপারের যাত্রী হইয়াও মর্ম্মন্তুদ যাতনার কারণটী পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন না। এমন সহিষ্ণুতা শুধু এ দেশের নারীর মধ্যে বর্ত্তমান।

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি মাতৃজাতি এমন ভাবে দিবস যামিনী যাপন করিতেছে বলিয়াই এ দেশের সমাজে এখন পর্য্যন্ত একটা বিপ্লব দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই। পাশ্চাত্য দেশে আত্মশক্তির ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য যে তাণ্ডব লীলার অভিনয় হইতেছে, কে জানে অদূর ভবিষ্যতে সে স্রোত এ দেশেও আসিয়া তরঙ্গায়িত না হইবে! এ দেশে নারীকুল নিতান্তই অবলা তাই আমাদের রক্ষা। এ দেশে রমণীর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিবার তেমন আবশ্যকতা হয় নাই; কারণ এ দেশের আদর্শ ছিল—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা

তাই সমাজে রমণীর স্থান ছিল উচ্চে, রমণীর দাবীই ছিল অগ্রগণ্য, তাই রমণীর মর্য্যাদার একটু হানি হইলে তখন সমাজের মেরুদণ্ডও কম্পিত হইয়া উঠিত। এ দেশেই রমণীর লজ্জা নিবারণের জন্য ভগবানকেও ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল। খনা লীলা গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আদর্শ রমণিগণকে তৎকালে সমাজ কি উচ্চ আসনই না দিয়াছিল। তাই তখন দেশ দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সমাজ আজ সে আদর্শ ভুলিয়া গিয়া নারীকুলের প্রতি এখন সে চক্ষে দেখিতেছে না। গৃহস্থালীর কর্ম্ম সম্পাদনই তাঁহাদের একমাত্র কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের সুখ সুবিধার প্রতি কাহারও লক্ষ্য মাত্র নাই, কাজেই আজ সমাজ-দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশে দিন দিন শিশুর মৃত্যু হার কেন এত বাড়িতেছে তাহা কেহ একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমি বলিব তাহার এক মাত্র কারণ মাতৃকুলের প্রতি অবজ্ঞা। বীর প্রসবিনীগণ এখন মূষিক প্রসবিনী হইয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছেন। অনেক শিক্ষিত পরিবারেও দেখিয়াছি স্ত্রীলোকদের অসুখ হইলে যে পর্য্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত না হয় সে পর্য্যন্ত চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করা হয় না। অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও মাতা পিতা কি বলিবেন ভয়ে, সহধর্ম্মিণীরও ব্যাধিপীড়ার প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। দারুণ রোগ যে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে তাহা আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই। গৃহের খাদ্যসামগ্রীর অবশিষ্টাংশ খাইয়া স্ত্রীলোকগণ কোনরূপে জীবন ধারণ করেন, আর তাহার পর যদি ব্যাধি আসিয়া অবাধ গতিতে তাঁহাদের শীর্ণ দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তবে

তাঁহারা যে এই বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন অপেক্ষা সদ্য মৃত্যুকেই সাদরে আহ্বান করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু অনেকেই তাহা করেন না। জীবন্মৃত অবস্থায়ও তাঁহারা পবিত্র সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে অধিক ভালবাসেন। সেজন্যই আজও গ্রামের মর্য্যাদাহীন সমাজ একেবারে শ্মশানে পরিণত হয় নাই। সন্তানোৎপাদনের পর প্রতি বৎসর কত প্রসূতি ইহলীলা সম্বরণ করেন তাহার একটা সংখ্যা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আমি পূর্ব্ববঙ্গের একটী জিলার (নাম না বলিলেও চলিবে, যাহাদের বাড়ী সে জেলায় তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে) স্ত্রীলোকদের বিষয় একটু অনুসন্ধান করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেখানের লোক বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে নিতান্তই নারাজ। ইহাতে নাকি তাহাদের মর্য্যাদার বড়ই হানি হয়। আর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোককে পিত্রালয়ে পাঠাইবার কথা বলিতে গেলে ত তাহারা ক্রোধে অপমানে অন্তের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। অথচ এদিকে তাহাদিগকে দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিয়া উপায় নাই। স্ত্রীলোকের প্রতি উদাসীন এমন হতভাগ্য স্থান ভারতের অন্য কুত্রাপি আছে কিনা আমি জানি না। তবে এই মন্তব্যটা সে স্থানের লোক বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইতেছে। এ স্থানের স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার বোধ হয় বঙ্গদেশের সব স্থান অপেক্ষা অধিক। কারণ দ্বিতীয়, তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই এমন লোকের সংখ্যা এখানে অতি বিরল। আমি এখানে শুধু সভ্যতার আলোকে আলোকিত, শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কথাই বলিতেছি, বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রেণীর ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি অধিকাংশেরই জননী বর্ত্তমান নাই, কাহারো কাহারো পিতা তৃতীয় চতুর্থ পত্নী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কত বালক গৃহে মাতৃ স্নেহের অভাবে বাহিরে কুসঙ্গের মোহিনী শক্তিতে আসক্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখানের অভিভাবক মণ্ডলী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি এ বিষয় যতই একটু অনুসন্ধান করিতেছি, ততই ইহার সমাধান কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইতেছি। তবে কি এখানের যুবক মণ্ডলীকে পতঙ্গের মত অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবার জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন ! আর সে জন্যই কি শৈশবেই তাহাদিগকে মাতৃ স্নেহ হইতে বাঞ্চিত করা হইয়াছে ; ছেলের নৈতিক

চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দুই একজন অভিভাবকে বলিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা কেহ কেহ বলেন—"মহাশয় কি করিব? আমার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ঘরে, মাতৃহীন সন্তানকে বেশী শাসন করিলে যে লোকে মন্দ বলে" তখন মনে মনে বলি—"হাঁ মহাশয়! আপনি কৃপার পাত্রই বটে, কিন্তু ছেলেটীকে ত ধ্বংসের মুখে আপনিই ছাড়িয়া দিলেন।" এখানে বৃহৎ বৃহৎ পুকুরের পারে লোকালয়ের অন্তরালে যখন ছেলেদের আড্ডা বসিয়া যায়, তখন আবার বলি ভগবান অনর্থক জনহীন মাঠে এরূপ পুকুর খনন করিতে লোকজনকে প্রবর্ত্তিত করিয়া নৈতিক অবনতির পথটা আরো সুগম করিয়া দিতেছ কেন? কিন্তু কি বলিতে ছিলাম, গৃহে স্নেহময়ী জননীর নৈতিক প্রভাব সন্তানের জীবনে যেমন কার্য্যকরী হইয়া থাকে, বিদ্যালয়ের শত নৈতিক শিক্ষাও সেরূপ কার্য্যকরী হইতে পারেনা, তাই এস্থানে নৈতিক শিক্ষা অরণ্যে রোদন হইতেছে, যে গৃহে জননীর অভাব সে গৃহের সন্তান একটু বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন না হইয়া যায় না। তাই বলিতেছি যাঁহারা দেশের যথার্থ কল্যাণকামী, তাঁহারা মাতৃ জাতিকে বাঁচাইবার পথ প্রশস্ত করুন, তাহাদিগকে শুধু জাগাইয়া ফল নাই, জাগাইলেই যে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ত সে সম্বল নাই। তাঁহারা যে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত এ কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার আগে আমাদের কর্ত্তব্য যে টুকু স্বাধীনতা দান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত তাহা আগে তাঁহাদিগকে প্রদান করা। তাঁহাদের সকলের সাধারণ সুখ সুবিধার ব্যবস্থা না করিয়া মুষ্টিমেয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার পথটা উন্মুক্ত করিয়া দিলে আর কত লাভ হইবে? আমাদের যেমন স্বাধীনতা লাভেরও অবসর সময়ে আমোদ প্রমোদ উপভোগের বাসনা বলবতী স্ত্রীলোকদেরও তেমন ইচ্ছা বলবতী হয় না কি? কিন্তু তাঁহারা জানেন, তাঁহারা পরাধীন, মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই, তাই নীরবে এ সব সহ্য করিতে করিতে তাঁহাদের মন হইতেও সে প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সামান্য লেখা পড়া জানেন বা যাঁহাদের সঙ্গীতাদিতে অধিকার আছে, লোক লজ্জার ভয়ে অনেক সময় তাঁহারা সেগুলিরও চর্চ্চা করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোকদের পর চর্চ্চার প্রবৃত্তিটা খুব প্রবল অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মহদ্বৃত্তির বিকাশের সুযোগটা দান করিয়া দেখিয়াছেন

কি, কোন দিকে তাঁহাদের স্বাভাবিক আনুরক্তি? পরের ব্যথায় যাঁহাদের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া উঠে ব্রতাপবাস দির সময়ে ভগবৎ প্রেমে যাঁহাদের সরল প্রাণ আকুল হইয়া উঠে এবং অলক্ষিতে নেত্র যুগল অশ্রু প্লাত হয়? তাঁহারা কি শুধু পর চর্চ্চায় আমোদ উপভোগ করিতে পারেন? তাঁহাদের সম্মুখে কি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সকলেই আবার একটা সীতা সাবিত্রী হইয়া দাঁড়াইবে? পূত স্বভাবা সীতা সাবিত্রীর কথা বলিতেই আবার মনে হইল হয় ত অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইবে যখন সীতা সাবিত্রীর নামটাও স্ত্রীলোকদের নিকট বৈদেশিক বলিয়া ঠেকিবে; কারণ আজকাল একেত শিক্ষার ক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার শিক্ষার আদর্শ-টাও এদেশের মাটির অনুপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে আর রামায়ণ মহা-ভারতের তেমন মর্য্যাদা নাই, উপন্যাস নবন্যাস এগুলিই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কাজেই নারী জাতির মানসিক অবনতি ও অসংযম্ভ্রান্তী। ফলে, গৃহে গৃহে আজকাল কুপুত্রের সংখ্যাও বাড়িতেছে। জার্ম্মেনীর কতিপয় রাজনীতিবিদ্ ইটালীতে যুদ্ধে বন্দী হইয়া অনাহারে অর্দ্ধাহারে কতিপয় দিবস যাপন করিয়া রাজনীতির কথা মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়া নাকি শুধু ভাবিতেন উদরের কথা। আমাদের দেশের নারী কুলও উচ্চ চিন্তা উচ্চাদর্শের কথা ভুলিয়া গিয়া রাতদিন শুধু নিজের দুরদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছেন কিনা কে বলিবে? নারীহত্যা যে সমাজ হইতে এখনও দূরীভূত হইতেছে না, সে সমাজের কল্যাণ যে কোন শুভ প্রভাবে আপনা আপনিই হইয়া যাইবে এরূপ চিন্তা করা শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ কল্পনা বই আর কি? বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিয়া উপরে জল সেচনে কোনই ফলোদয় হয় না। নারীকুলের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়া পুরুষ একা একা বড় হইয়া সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করিবে, ইহা কোন দেশেই কোন দিন সম্ভবপর হয় নাই। ঐ শুনুন পাশ্চাত্য কবিও বজ্রকণ্ঠে বলিতেছেন—

"The woman's cause: is man's they rise or sink
Together, dwarf'd or God-like, bond or free:
If she be small, slight natured, miserable,
How shall man grow?"

সমাজ তরুকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিতে হইলে তাহার দুইটী শাখাকেই সমান ভাবে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দান করিতে হইবে। একটীকে আলোকে আর একটীকে আঁধারে রাখিলে বৃক্ষটী রুগ্ন হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তবে আর নারীকুলকে অন্তঃপুরের অন্তরালে নীরবে অশ্রুপাত করিতে দিয়া পুরুষকুলের স্বাধীনতা সাতন্ত্র্য ভান করিয়া দেশটাকে জাগাইবার চেষ্টা কেন? সমাজে নারীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না। ইহা আর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না, তবে সমাজের সংস্কার দ্বারা উহাকে উন্নতির পথে মনুষ্যত্বের পথে পরিচালিত করা আর না করা আমাদের খেয়ালের উপরই নির্ভর করিতেছে, কারণ সমাজের শাসন শৃঙ্খল এখন শিথিল হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে নারীর উপর অত্যাচারের অনুষ্ঠান অবাধ গতিতে চলিতেছে; সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, অথবা দেখিতে পাইয়াও দেশকাল পাত্র বিবেচনায় ইহার কোন একটা প্রতিকারে সাহসী হইতেছে না। এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করে ভগবান আবার সুদর্শন চক্র নিয়া ছুটিয়া আসিবেন না, যদি না আমরা আমাদের যথাশক্তি চেষ্টাদ্বারা ইহার প্রবল স্রোতটাকে একটু প্রতিহত করিতে বদ্ধ পরিকর হই। মাতৃজাতিকে শিক্ষিতা করিতে হইলে আগে চাই তৎপ্রতি মানুষের মত ব্যবহার,—মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার দান, তৎপর শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যত্ন না দিয়া যদি আমরা তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াই, তবে আমাদের এ পাপ ভগবানের প্রাণে সহ্য হইবে কেন? আর তাহার ফলও আমরা হাতে হাতেই পাইতেছি। লাঞ্ছিত নারীর তপ্তনিশ্বাসে, অস্বাভাবিক উপায়ে জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ কারিণী নারীর চিতার ধুমে সমাজ ছারখার হইয়া যাইতেছে, তবু আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মীদের মুখের হাসি চিরতরে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সন্তান সন্ততি অধিকাংশই শৈশবে প্রাণ হারাইতেছে আর যাহারা রোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে, তাহারাও জীবন্মৃত অবস্থায় সংসারের কোন সুখই উপভোগ করিতে পারিতেছে না ইহাতো আজকাল সকলে চক্ষের উপরই দেখিতেছে। পরীক্ষায় প্রমোশন পাইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের শতকরা তেত্রিশ জনেরই দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, ইহার কারণ কি পিতৃ

যত্ন প্রভাব নহে পল্লী গ্রামের সূতিকাগারের কথাই ধরুন না কেন যে গৃহে প্রসূতি মাসেক কাল যাপন করেন, তাহা এত সঙ্কীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর যে ইহাতে অন্য কোন লোক বাস করিতে দিলে কারাগৃহ বলিয়াই মনে করিবে, কিন্তু আমাদের দেশের এই কংশাগারের পরিবর্ত্তনে কোন চেষ্টা ত কোথাও দেখিতেছি না। তারপর প্রসূতির খাদ্যের প্রতিও, যাহাদের সম্পূর্ণ সংস্থান আছে, তাহারাও তেমন যত্ন নেয় না। তাই অনেক জায়গায় এক গুলিতে দুই বাঘই মারা পড়ে। এ সব কিছুই নূতন কথা নয়, তবে আমরা যে চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাইতেছি না, ক্ষমতা থাকিতেও প্রতিকারে অগ্রসর হইতেছি না, তাই দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। অন্যান্য দেশে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কি ভাবে সুস্থ দেহ নিয়া দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারে, ইহার কোনরূপ উপায় উদ্ভাবনের জন্য কত গবেষণা আলাপ আলোচনা হইতেছে, আর আমরা অলস শয়নে শুইয়া থাকিয়া গৌরবময় অতীতের সুখ স্বপ্নই দেখিতেছি, কিন্তু অতীতের সুবর্ণ যুগ আর ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছি না। আমরা অতীতকে আনিয়া আবার বর্ত্তমানের সম্মুখে দাঁড় করাইতে চাই। কিন্তু আমরা নিজকে অতীতের মানবরূপে পরিণত করিতে সচেষ্ট হই না। এখন বক্তৃতা গলাবাজির যুগ চলিয়া গিয়াছে, দেশের সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে সকলেরই সময় থাকিতে কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত। পাশ্চাত মনীষীও বলিয়া গিয়াছেন—"Good thoughts are no better than good dreams, unless they are put into action."

মতিলাল-তর্পণ*

("নচ্‌কু," রাজেন্দ্র কলেজ—ফরিদপুর।)

স্তব্ধ নিশীথিনী। বিশ্ব-চরাচর
তিমির গুহার তলে গিয়েছে ডুবিয়া;
মত্ত বায়ু ফিরিতেছে ঘুরি'—সহসা
মেঘের ফাঁকে আলেয়ার ক্ষীণ আলোসম
কভু তারা হয় প্রকটিত! বিজন নির্জন
সম ভাতে ধরা-খানি! প্রতি গৃহে
নিভিয়াছে শিখা—'গভীর রজনী'
প্রকৃতি-ললাট-তলে রহিয়াছে লিখা!

কেগো ওই এ হেন সময় মুক্ত
বাতায়ন-ধারে—ক্ষীণ আলোটিরে
করিয়া আড়াল—এলো-মেলো বই-খাতা
রাখিয়া ছড়ায়ে—দূরে অসীমের পানে
মেলিয়া নয়ন, ধ্যান-রত যোগী সম,
রয়েছে বসিয়া? কভু বা কুঞ্চিত হয়
বিষাদে ললাট! কভু বা ভবিষ্য-গভে
কল্পনার পটে—স্বদেশ গৌরব-চিত্র করিয়া অঙ্কন
আনমনে আঁখি-তারা হ'তেছে উজ্জ্বল—
অধরের কোণে-কোণে স্নিগ্ধ হাসি-টুকু
চল-চপলার মত যাইছে খেলিয়া!.........

---

* ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত

চিনেছি তোমায়—কেগো তুমি ধ্যান-রত
এ ঘোর অমায়!
ভারত আকাশে তুমি
কোহিনুর সম, রাজিতেছ মতিলাল
অতি অনুপম।

* * * *

হায়, আজি ঐ নিশ ফিরে গেল ডাকি' ডাকি'—
গৃহ-কোণে জ্বলিল না বাতি—বাতায়ন দ্বার
খোলা নাহি হ'ল আর—অসীমের তলে
কেহ মেলিল না আঁখি—কম্বিল না কল্প-তুলে
আলেখ্য চিত্রন।—গেল চাঁদ—নিভে
তারা—তিমিরা রজনী মরণ-মুরছাতুর
আলোকের দ্বারে পড়িল ঝরিয়া;
ডালি সাজাইয়া হাসিলেন উষারাণী—
গেলেন ফিরিয়া,—পূরব-তোরণ-দ্বারে
লোহিতের রাগে করিয়া রঞ্জিত ঐ উঠিল
অরুণ—স্মিত-হাসে স্নিগ্ধ-ভাষে,
জাগাইয়া ধরা—শ্যাম-শষ্প-ভরা
বিহগ গাহিল গান—মৃদুল পবন তা'র
বহিয়া চকিতে—চুম্বন আঁকিয়া দিয়া
কুসুম আঁখিতে—ধীরে বহি' যায় ঐ
শিহরণ তুলি'!—অবসাদ ঐ ওরে
গেলরে ছুটিয়া,—জড়িমা ধরণী হ'তে
পড়িল টুটিয়া! তুমি কোথা মতিলাল?
জাগিবে না আজ? জাগে ধরা—
হাঁকে রবি—গায়িছে চারণ
তুমি শুধু জাগিবে না বল কি কারণ?
করা কিগো হ'ল সব কাজ? অথবা

সে ভালবাসা— প্রীতি-প্রেম-স্নেহ
ফুরা'য়ে গিয়াছে সব ?—ভারত-আকাশ
করে না নয়নে আর মোহের
বিকাশ ?

ঐ হের বন্দিনী জননী তব—
একদিন যাহার কল্যান, আপন জীবনে সদা,
করেছিলে সার—করা-ঘাত করি' বক্ষে
কাঁদে ঝুরে ঝুরে————

আয়, আয়, আয় বাছা—আয়, আয়, ফিরে—
স্নেহের নন্দন তুই—নয়নের মণি—আয়, আয় ফিরে—
তুই বিনা কে মুছা'বে মা'র আঁখি-নীরে ?
ত্রিংশ-কোটী ঐ তব ভাই-বোনে মিলে—
ঐ হের তুলিয়াছে কিবা হাহাকার—
আকাশে-বাতাস ভরি' গৃহ-দ্বার ;
শোকের মথিত শ্বাস গুমরিয়া ফিরে
কাতর করেছে আজ এই ভারতেরে !
নিঠুরের মত তুমি আছ আজি কোথা ?
কহিবে না কথা ?

একদিন ছিল হায়,
ভারতের ক্ষীণ-শ্বাসটুকু
তোমার হৃদয়-দ্বারে করিয়া আঘাত
তুলিত আকুল ঝড় ; ক্ষীণ-ব্যথাটুকু তা'র
বুকে বাজিলে সে কভু—আপন বেদনা-বোধে
হইতে আকুল ! স্বদেশের শঙ্কা
গণি' মনে, হইতে বিষম সখা,
ব্যথিত ব্যাকুল !—…………

— চাহ নাই নিজ সুখ—
নিজ সম্পদ ;—ভারতই যে ছিল তব
সব-খানি জুড়ে! মনে পড়ে যেই দিন
রাজার নন্দন—তব সঙ্গে করিবারে
চাহে আলাপন! গিয়েছিলে দীন-বেশে—
হাত-খানি দিলে হেসে—লও নাই তাহা।
ভিখারী পূজারী সম—নিজ ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ
পূজেছিলে তা'রে—দেবতার রূপে!
নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলি'—ভুলি' অন্য কথা
বলেছিলে শুধু এক-কথা—
ভারতের বুক জুড়ি' রাজে যেই ব্যথা! আজি
এ কেমন? কেন হেন ধারা?
জননী-ভগিনী-ভ্রাতা কেঁদে
হয় সারা,—কেনগো পাষাণ
আজি—কোমল হৃদয়?
কোন্ স্বপনের ছায়া হেরিছে
মুদিত আঁখি? মন্দার-কুসুম-গন্ধ আসিছে
ভাসিয়া? কিবা কুহু-তান মোহিছে মানস তব
পশিয়া শ্রবণে? তাই কিগো ভুলে গেলে
শ্মশান-ভারতে—নিগড় লাগে না ভাল
আর?—কঠিন নীরস? তাই কিগো
নিলে মাগি' আপন হরষ?

—অথবা—কি জানি—
পারা কিগো যায় ভোলা—যেবা ছিল রাণী?
আজন্ম—সাধন-ধন—ধ্রুব—ধ্রুব-তারা
নীরব জীবন-তলে প্রেরণার ধারা?
কি জানি গো—

দেখি' নিজ কার্য্য বাধা পায়—
তাই কিহে চলে গেলে দূর যাত্রা
পারে ?.....................
অমিত হৃদয়
বল যেথা উপজয় ? অফুরন্ত হাসি
যেথা নিতি উঠে ভা'সি'—প্রেমের
আলোক যেথা জ্যোছনার পারা
নিয়ত ছুটিয়া যায় তুলিয়া ফোয়ারা,—
যেথা শুভ্র সিংহাসন 'পরে—
আপনার করে—ধরি' দণ্ড রাজ-অধিরাজ
বিরাজ করেন সদা ? তাঁ'রি কাছে
গেলে কিগো চলি'—ভারতের আবেদন
করিবারে পেশ ?

যাও তবে——যাও বীর—
মায়ের সন্তান !
ক্ষীণ প্রাণ যদি কাঁদে কভু——
হীন-বল যদি হয় হিয়া—অদৃষ্ট-
আসন হ'তে কর বুলাইয়া করিয়ো
সবল তা'র ;—তোমার স্মিরিতি ধরি'
জীবনের পথে চলে যা'ব বীর—
বেশে স্বকার্য্য সাধিয়া ! তার পরে
অস্ত-তোরণের মূলে—মরণের কুলে
আঁখির পল্লব যবে আসিবে বুজিয়া
নিবে কিগো বরি' তায় আসিয়া—খুঁজিয়া ?

যাও তবে—যাও বীর
সগৌরবে ;—কর গিয়ে নিজ কাজ
—আপন সাধনে !

ও নাম ধ্বনিবে হেথা চিরদিন
মুখরিয়া ভারতের গগণে পবনে।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২।

বিবিধ।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বঙ্গের নানা স্থানে কায়স্থের আদিপিতা শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের বার্ষিক পূজা মহা সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে কয়েক স্থানের পূজার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বিগত ৫ই কার্ত্তিক রবিবার ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার শুভ দিনে ফরিদপুর জেলান্তর্গতঃ দোলকুণ্ডী গ্রামে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্তমাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে ভগবান ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের চতুর্দ্দশ বার্ষিক পূজা এবং উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুখের বিষয় প্রচারক মহাশয় স্বয়ং এই পূজা যথারীতি সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি প্রত্যেক উপবীতী কায়স্থ মহোদয় পূজা আর্চ্চনাদিতে পুরোহিত অভাবে ক্ষুণ্ণ এবং নিরুৎসাহ না হইয়া ভক্তি সহকারে তদ্গতচিত্তে স্বয়ং যথাসাধ্য মতে দেব পূজাদি নির্ব্বাহ করিবেন। উপাসনা কার্য্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়া প্রকৃতই অত্যন্ত বিড়ম্বনার কারণ। বিশেষত উন্নত জাতির পক্ষে ইহা সুসভ্য সমাজের নিকট অতীব হাস্য জনক। প্রতিনিধি দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক এমন অনেক কার্য্য আছে—যাহা কোন মতেই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, অনেক কার্য্য আছে প্রতিনিধি দ্বারা চলে না। তন্মধ্যে উপাসনা অন্যতম। এ বিষয়ে স্থান বিশেষ নিজে যতটা পারা যায় ততই মঙ্গল।

২। দিনাজপুর বাটীস্থ স্বর্গীয় হরেন্দ্র নারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয়দিগের উদ্যোগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা, হোম্ ও পাঠ ইত্যাদি যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।

৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়োজনে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার বিগত ৫ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পূণ্য তিথিতে কলিকাতা বাগবাজার, ১নং লক্ষ্মী-নারায়ণ দত্তের লেনস্থ "লক্ষ্মী নিবাসে" শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের শ্রীমূর্ত্তির পূজানুষ্ঠান মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা গুণে স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রবর সুপ্রসিদ্ধ রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র কায়স্থ-সভার সর্ব্ব প্রথম আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূধদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্যত্বে ৯ জন কায়স্থ সন্তানের যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হয়। অপরাহ্নে তারাসের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গের চারি শ্রেণীর বহু সংখ্যক কায়স্থের সম্মিলনে পূজা মণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে এক সভাধিবেশন হয়। উপস্থিত সকলকে জলযোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। যশোহর জেলার চাঁচুরিয়া নিবাসী বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় সুললিত কণ্ঠে অমর কবি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা এবং অন্যান্য মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন পূর্ব্বক রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

৪। বিগত ৫ই কার্ত্তিক মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত নিমতিতার স্বধর্ম্ম পরায়ণ স্বজাতি বৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গত বৎসরের ন্যায় কায়স্থ বীজ পুরুষ ভগবান ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে চব্য-চুষ-লেহ্য-পেয়, চতুর্ব্বিধ আহার্য্যের দ্বারা ভোগ নিবেদিত হয়, এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

৫। বিগত ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পূণ্য বাসরে দিনাজপুর রাজধানীর সান্নিধ্যে গর্ভেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী বলতৈড় গ্রামের কায়স্থগণের শুভেচ্ছায় উক্ত গ্রামের বারোয়ারী ক্ষেত্রে সুসজ্জিত মণ্ডপ গৃহে কায়স্থাদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা হোম ও যথোপযুক্ত পূজোপকরণ সহ অন্নভোগ দেওয়া হইয়াছে। দিনাজপুর ঘাসীপাড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রেরিত দশ কর্ম্মান্বিত শ্রীযুক্ত শ্রীধর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহশয়দ্বয় দেবতার পূজা আরতি ও হোমাদি কার্য্য করিয়াছিলেন। পূজা মণ্ডপে পিতৃ দেবের শ্রীমূর্ত্তি বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল। তাঁহার পরিহিত শোভনীয় বস্ত্র

ও উজ্জ্বল মুকুট শোভিত শ্রীমুখপদ্ম, চতুর্ভুজ, শ্যাম কমল লোচন মূর্ত্তি দর্শনে দর্শকবৃন্দ ভক্তিভাবে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। মূর্ত্তির হস্ত চতুষ্টয়ে দণ্ড, তরবারি, মসীপাত্র, লেখনী ও গলদেশে ত্রিদণ্ডী যজ্ঞসূত্র এবং মাল্যাদি শোভা পাইতেছিল। সিংহাসন তলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মহিষ শায়িত ছিল। উৎসব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি নানা জাতীয় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে রাত্রি ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজা অঙ্গনে বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে স্থানীয় কায়স্থগণের একটী বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে সমাজিক এবং জাতীয় সংস্কার সম্বন্ধে কতক গুলি আবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়, ও অনেক বিষয় আলোচনান্তে ' বলতৈড় কায়স্থ-সভা" নামে একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠীত হইয়াছে!

৬। যশোহর জেলান্তর্গত মধুমতী নদীর তীরবর্ত্তী ইতিনা গ্রামের উপবীতী কায়স্থ মণ্ডলীর উদ্যোগে বিগত ৫ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস উক্ত গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ রায় ভবনে ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা অন্ন ভোগাদির দ্বারা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিনা সমাজের কায়স্থগণের কর্ত্তব্য পরায়ণতা এবং অদম্য উৎসাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উক্ত সমাজের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে অগ্রগামী, স্বজাতি হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় বর্ম্মা মহাশয়কে আমরা সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীভগবান এই পরম উৎসাহী এবং অক্লান্ত কর্ম্মী যুবককে নিরোগী এবং দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।

কায়স্থাদিপিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজার উৎসবটীকে সঞ্জিবীত রাখিবার জন্য গৌরবঙ্গের প্রত্যেক কায়স্থ মহোদয়কে আমরা বারংবার সানুনয় অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) তিথিতে ভগবান ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব ব্রহ্মার কায়া হইতে উদ্ভব হন। এই দিনটী কায়স্থ মাত্রেরই মহা পুণ্য জনক এবং প্রধান একটী পর্ব্ব দিবস এই দিনটীকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি কায়স্থ গৃহে অদ্যাপি ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা এবং মহোৎসব হইয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ নিজ জাতীয় মর্য্যাদা এবং জাতীয় ধর্ম্ম ভুলিবার সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রত্বরূপ গভীর পঙ্কে নিপতিত হইয়া নিজেদের এই পিতৃ পূজা বিস্মৃত হইয়াছেন। কায়স্থ মহোদয়গণ বাচস্পত্য ও শব্দ কল্পদ্রুমোক্ত ভবিষ্য পুরাণে কায়স্থাদি পিতার পূজার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। এই দিনটী কায়স্থদিগের পক্ষে কতদূর পুণ্য জনক এবং পূজার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত পুরাণে উল্লেখ আছে।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীবিজয়গোপাল সরকারবর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নবপর্য্যায়] ওঁ ১৩২৯ সাল

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৪শ খণ্ড। { পৌষ মাস। } ৯ম সংখ্যা।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী

(শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা)।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীগৌর ভগবান নীলাচলে যাত্রা করিবার সময় এই রেমুনাতে আসিয়া ঠাকুরের এই ক্ষীর চুরি ঘটনা, অতীব আনন্দের সহিত তাঁহার ভক্তগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। এই স্থানে আমি আমার শিশির বাবুর গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

"ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুজ মুরলীধর। প্রভু এই প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি আপনি দেখিলেন ও ভক্তগণকে দেখাইলেন।

"এ কথার তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিভুজ মুরলীধর ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার মানে এই যে, তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে ধ্যান করিতেন। এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্য্য ভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। মাধুর্য্য ভজন এই যে, শ্রীভগবানকে নিজ জন রূপে অর্থাৎ পতি পুত্র প্রভৃতি রূপে ভজনা করা। সেই ভগবান যদি চারি হস্ত সম্পন্ন রহিলেন, তবে তাঁহাকে পতি কি পুত্র বলিতে জীবের সাহস হইবে কেন? মুখে বলিলে ত হইবে না? অন্তরে একজন চারি হস্ত সম্বলিত শঙ্খ চক্র প্রভৃতি ধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষ

নির্ভয়ে পুত্র কি পতি কি সখা বলিতে পারেন না। সুতরাং মাধুর্য্য ভজন, করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের দু'খানি হাত ফেলিয়া দিতে হয়। আর যে দু'খানি রহিল তাহাতে এমন কোন বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষ্য ব্যবহার উপযোগী। অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দ নন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দের নন্দন ত চতুর্ভুজ নহেন? তাহা হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বাধা বহাইবেন, কি যশোদা তাহাকে বন্ধন করিবেন? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, আর প্রভু মাধুর্য্য ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান দিতে লাগিলেন।

"প্রভুর ভক্তগণ অবশ্য প্রভুর এই ন্যায় সঙ্গত কথা বলিবামাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যাঁহারা বাহিরের লোক তাঁহারা তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, যদি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইলেন, তবে প্রাচীন এরূপ মূর্ত্তি নাই কেন? ভক্তগণ এ কথায় উত্তর দিতে পারিতেন না কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বহু দিনের প্রাচীন মূর্ত্তি। আর তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর। তাই প্রভু ভক্তগণ সম্বলিত, বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন করিতে আইলেন।"

"এই ঠাকুর উদ্ধব কর্ত্তৃক বারানসী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি রেমুনাতে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা স্মরণ করিয়া 'উদ্ধব' 'উদ্ধব বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের অগ্রে আইলেন। আসিয়া, প্রথমে উদ্ধবের ঠাকুর বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, মস্তক স্পর্শ করিয়া, শ্রীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"উদ্ধব" "উদ্ধব" ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারে বার॥"

* * * * *

ভক্তগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু বসিলেন, আর সকলে বসিয়া মনসুখে কৃষ্ণ কথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—

এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম ক্ষীর চোরা গোপীনাথ হইয়াছে। 'ভক্তগণ ইহাতে সে কাহিনী শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিতে লাগিলেন।—আমরা সে ঘটনা ইতি পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি।

অতএব মাধবেন্দ্রের কথা, যাহা মহাপ্রভু স্বয়ং বলিতে গিয়া কত আনন্দ পাইতেন—সেই জগদ্বরেণ্য ভক্ত শ্রেষ্ঠের কথা আমরা কি বলিতে জানি। শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার শিষ্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রের প্রতি কথা স্মরণ করিতে গিয়া, আমাদের চিত্ত, কি এক অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দাবেশে স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

আমরা বলিতেছিলাম, মাধবেন্দ্র ঠাকুরের নিকট হইতে একথানি ক্ষীর উপহার পাইলেন। ঠাকুরের প্রেমে ও কারুণ্যে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর দুটি হাত যোড় করিয়া সেই মহা প্রসাদের স্তব করিলেন। আস্বাদ করিয়া দেখিলেন, উহা একেবারে অমৃত। ক্ষীরটুকু খাইলেন আর পাত্রটী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া লইলেন—পরে সে গুলিও আস্বাদ করিয়া দেখিবেন—ঠাকুরের স্বহস্তের উপহার কিছুই ফেলা যাইতে পারে না।

ক্রমশঃ রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে, তিনি ভাবিলেন ঠাকুর আমার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন,—একথা লোকে যখন শুনিবে, তখন আমার নিকট লোক সংঘট্ট হইবে।

এই ভয়ে রাত্রি শেষে চ'ললা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥ চৈঃ চঃ

তখন চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল মাধবপুরী আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে জনতার সৃষ্টি হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বেষ্টন

করিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে তিনি কিরূপ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণ প্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল—পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥ ঐ

তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে গোপালের আদেশ জানাইয়া চন্দন প্রার্থনা করিলেন। সেবকগণ ইহাতে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং রাজকর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া, প্রচুর পরিমাণে কর্পূর ও চন্দন সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু পথের সম্বল সহ এক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য সঙ্গে দিয়া দিলেন। এবং—

ঘাটী দানী ছাড়াইতে রাজ পাত্র দ্বারে।
রাজ লেখা করি দিল পুরী গোসাঞির করে॥

প্রত্যাবর্ত্তন পথে, তিনি রেমুনাতে আসিয়া, গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। গোপীনাথের সেবকগণ তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া, ভোগের ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। রাত্রে সেই দেবালয়ে শয়ন করিয়া আছেন, শেষ রাত্রে তাঁহার গোপাল আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—মাধব! এই যে গোপীনাথ, ইনি আমার অভিন্ন কলেবর, চন্দনাদি ইহাকেই অর্পণ কর, তাহাতেই আমার পাওয়া, হইবে। আমার কথা শুন, বিশ্বাস করিয়া গোপীনাথকে চন্দন পরাও, আমার বাক্যে দ্বিধা করিও না।" এই বলিয়া গোপাল তাঁহার স্বপ্ন পথ হইতে অন্তর্হিত হইলে তিনি জাগ্রত হইয়া গোপীনাথের সেবকগণকে ডাকাইয়া গোপালের আদেশ শুনাইলেন। বলিলেন,—গোপাল বলিয়াছেন এই চন্দন নিত্য গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন কর, তাহাতেই আমার দেহ শীতল হইবে। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর প্রবল আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিবে।'

গোপীনাথ শ্রীঅঙ্গে চন্দন পরিবেন শুনিয়া সেবকগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন, যেহেতু তখন গ্রীষ্মকাল। পুরী বলিলেন, আমার সঙ্গের এই দু'জনা লোক চন্দন ঘসিবে। আপনারা আরও দুই জনা লোক সংগ্রহ করিয়া দিন, আমি তাহাদের বেতন দিব। এই মত চারি জন লোকে প্রত্যহ চন্দন ঘসিয়া আনিয়া এবং সেবকগণ তাহা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে লেপন করিয়া দিতেন। এইরূপে প্রতিদিন ঠাকুরকে চন্দন পরান হইত, আর যত দিন না তাহা শেষ হইয়াছিল ততদিন পুরী সে স্থান ত্যাগ করেন নাই। গ্রীষ্ম কাল অনন্তে, তিনি পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া চারি মাস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার প্রেমের পরাকাষ্ঠা অনুভব করুন।

এই যে অতি মধুর মাধবেন্দ্র চরিত, ইহা প্রভু গোপীনাথের মন্দিরে বসিয়া ভক্তগণকে শুনাইয়াছিলেন। তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রভু কহে— নিত্যানন্দ! করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল॥
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা—অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইলা॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত বৎসল।
চন্দন পরি ভক্ত শ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী—সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন॥ চৈ চঃ

এমন যে লোক তিনি গোপালের 'আজ্ঞামৃত' প্রাপ্ত হইয়া, এই যে বহু

দূরদেশ এখানে দ্বিধাশূন্য চিত্তে চলিয়া আসিলেন। পথে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও কাহার নিকট কিছু চাহিতেছেন না। এমনই তাঁহার অযাচিত বৃত্তি, আর এমনই তাঁহার অলৌকিক প্রেম।

মনেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজ পত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছ দেশ—দূর পথ—জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব?—নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে।
তথাপি চন্দন লৈয়া উৎসাহ লইতে।
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুনা আনিল।
আনন্দ বাঢ়য় মনে—দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হইল দয়াবান॥
এই ভক্ত,—ভক্তপ্রিয়—কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমা সবার নাহি অধিকার॥

প্রভুর শ্রীমুখের এই প্রশংসা বাক্যের পর আমাদের আর কি বলিবার আছে। ইহার পর যখন, শেষের সে দিন আসিল, তখনও তিনি নিঃসম্বল—আপনার বলিতে নিজ জন কেহ নিকটে ছিল না। নির্জ্জন বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, কেবল একটী ভক্ত শিষ্যের সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। সেই শিষ্যটী আমাদের বহু পরিচিত ঈশ্বর পুরী।

ঈশ্বর পুরী অতি সন্তর্পণে তাঁহার রোগক্রান্ত গুরুর সেবা করিতেছেন, দ্বিধা শূন্য চিত্তে মল মূত্রাদি পরিষ্কার রাখিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

এই ঈশ্বর পুরী, জাতিতে কায়স্থ কিংবা বৈদ্য। অনেকে ইহাকে কায়স্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। পূর্ব্ব নিবাস হালিসহরের একাংশ কুমার হট্টে।

মাধবেন্দ্র এই দয়ালু শিষ্যটীর সেবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের করুণা স্মরণ করিয়া সুস্বরে স্ব যুক্ত এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া, তাঁহার অনন্ত বিরহ ব্যথা জ্ঞাপন করিতেছেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্য সে।
হৃদয়ং ত্বদ লোক কাতরং, দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

তিনি রাধাভাবে বলিতেছেন, "হে নাথ! দীনজনের দুঃখে তোমার কোমলহৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে প্রিয় আমার হৃদয় তোমার অদর্শন জনিত দুঃখে কাতর হইয়া তোমাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, আমি কি করি? হে মথুরানাথ! আমি তোমাকে কবে দেখিব?" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটীর এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন,—

ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাঢ়ে,—তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী।
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন॥
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥

এই শ্লোকের উপর অনেক গীত রচিত হইয়াছিল। মাথুরের পালায় একটী গীত আছে,—

হে মথুরানাথ! হে দীন দয়ার্দ্র-নাথ!
একটিবার প্রসন্ন হও হে।

তব কংস-ধনে মত্ত হ'য়ে, নিজ তত্ত্ব পাসরিয়ে,
কাঙ্গালে দয়া নাহি করে।
তখন করযোড়ে বল্‌বো—
হে রাধানাথ! হে ব্রজনাথ!
ভুলিলে কি তোমার কমলিনী?

ইত্যাদি—

এই শ্লোকটি লইয়া শ্রীল শিশির বাবু এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—

"আচ্ছা, তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয়া, কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তিনি কি শ্রীভগবান্‌কে বিদ্রূপ করিতেছিলেন? অবশ্য তাহা কখনও নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায় বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেন্দ্রপুরী বুদ্ধি-বিদ্যায় সাধনে অদ্বিতীয়, নতুবা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, ক্ষুদ্র সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার বহুতর লোক অনুগত থাকিবে, রাজা মহারাজাগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই পাইলেন না, তবে পাইলেন কি না, না রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটি জলপাত্র, ও কৃপালু একটি শিষ্যের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহার সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃত্যুকালে, বলিতেছেন যে, "হে দীন দয়াদ্রনাথ" ইহার তাৎপর্য্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণকে দীন দয়াদ্রনাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহস্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মহাসুখের সময়ও তাহা বলিতে পার না। কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাসদাসী দ্বারা যে সুখ, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অন্য জাতীয় সুখ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাঁহার ভক্তগণও এই "ভবের বাজারে" সার্থক "বিকিকিনি" অর্থাৎ বিক্রয় ক্রয় করিয়া থাকেন।

"আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র, "হে দীন দয়ার্দ্রনাথ! আমি তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথা,—'আমার গা জ্বলিতেছে" কি "উদরে যন্ত্রণা হইতেছে" কি অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল," ইত্যাদি. ইহা একবারও বলিলেন না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন?

"কোন কোন পণ্ডিত লোক বলেন, সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপনি হয়। অর্থাৎ নিসর্গই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ বলিয়া আর কোন পৃথক বস্তু নাই। জ্ঞানালোকের এই কথায় আমার তত দুঃখ নাই, যেহেতু তাঁহারা ইহাও বলেন যে, স্বভাবের সৃষ্টিতে জটিলতা নাই যথা,— স্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন তেমনি অভাব দূর করিবার বস্তু দিয়াছেন, যেমন পিপাসা দিয়াছেন, তেমন জল দিয়াছেন, যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন তেমন অন্ন দিয়াছেন। শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তার সে সৃষ্টির যদি কোন ভুল না থাকে, "তবে আমি কখন মরিব না," কি 'কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা প্রাণে মরিব" এ সমুদায় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি বলিব, স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না শ্রীভগবানরূপ বস্তু যদি না থাকিতেন তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আনিতে দিত না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন না, ইহা হইতে পারে না।

"... যে, মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণ! দেখা দাও, প্রাণ যায়," বলিতে বলিতে প্রাণ... স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করিলেন ... কৃষ্ণ ... কি করিলেন বলিতেছি। এমত অবস্থায় কৃষ্ণ কি করিবেন, ... রূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখিয়াছেন। যখন গোবৎস হাম্বারবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্ত্তী বাছুর সেই ডাক শুনিবা-মাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। সেই মাধবেন্দ্র 'কৃষ্ণ দর্শন

দাও, প্রাণ যায়” বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ “এই যে আমি” বলিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। স্বভাব পরক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয়, তবে সমুদায় মিথ্যা, যে স্বভাব লইয়া নাস্তিক জনে গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা, তাহার বড় ভুল।”

মৃত্যুকালে মাধবেন্দ্র তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম, ভক্ত-শিষ্য ঈশ্বরপুরীকে অর্পণ করিয়া যান। এই প্রেমধনে ধনী হইয়া ঈশ্বর পুরী এক জন অপূর্ব্ব ভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে বসিয়া ভক্তগণকে মাধবেন্দ্রের চরিত্র সুধা আস্বাদন করাইতেছিলেন। এবং পুরীর সেই বিখ্যাত শ্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা—

এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃষ্ণ শ্লোক।
সেই শ্লোক চন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক॥
*　　*　　*　　*
এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রেমেতে বিবস হঞা পড়িলা ভূমিত॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল—উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কাঁদে গায়॥
‘অয়ি দীন অয়ি দীন’ বোলে বারে বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, বহে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম নাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।

চরিতামৃত।

অতএব এই মাধবেন্দ্র যে আমাদের গৌরভক্তমণ্ডলীর কত আদরণীয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। এই মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি উপলক্ষে আমাদের গৌর আনা গোসাঞিটী তাঁহার সর্ব্বস্ব দরিদ্র নারায়ণদিগের সেবার জন্য নিক্ষেপ করিতেন। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের বর্ণনা হইতে আমরা, তাঁহার এই তিথি আরাধন উৎসবের, এক বৎসরকার বিবরণ, প্রিয়তম পাঠকগণকে উপহার দিয়া, আনন্দ লাভ করিব বাসনা করিয়াছি।

মহাপ্রভু তখন নীলাচল হইতে, জগজ্জননী শচী দেবীকে দর্শন করিতে আসিয়া অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করিতেছেন। এমন সময় দৈবক্রমে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিত হইল। অদ্বৈত প্রভু আনন্দভরে ভাবি উৎসবের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। আর পারিষদগণ পরিবেষ্টিত শ্রীগৌর সুন্দর, সেই পবিত্র দিবসের আগমন দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। এদিকে সেই তিথি পূজা করিবার জন্য অদ্বৈত প্রভু, কত যে সজ্জা করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নানাদিক হইতে নানাবিধ দ্রব্য আসিতেছে। মাধবেন্দ্রের উপর সকলেরই ভালবাসা ছিল, প্রত্যেকেই উৎসাহের সহিত এক এক কার্য্যের ভার লইলেন। যেমন, আই * রন্ধন কার্য্যের ভার লইলেন। আর যত সব বৈষ্ণব সীমন্তিনীরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দের সীমা নাই, তিনি বৈষ্ণব পূজিবার ভার নিলেন। অন্যান্য সকলে, চন্দন ঘর্ষণ, মাল্যগ্রহণ, জল আনা, স্থান পরিষ্কার করা, আগন্তুক বৈষ্ণবগণের চরণ প্রক্ষালন করা, পতাকা বান্ধা, চাঁদোয়া টাঙ্গান, ভাণ্ডারের জন্য দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্য আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। কেহ সংকীর্ত্তন করিতেছেন, আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতেছেন পূজার কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন আর কেহ বা তিথি পূজার আচার্য্য হইয়াছেন। সকলেই পরমানন্দ রসে মগ্ন! সকলেই নিজ ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত। চতুর্দ্দিকে কেবল খাও খাও, নাও নাও ও হরি হরি ধ্বনি। কীর্ত্তনানন্দে কাহারও বাহ্য মাত্র নাই। অদ্বৈত ভবন যেন শ্রীধাম বৈকুণ্ঠের তুল্য বরনীয় হইয়াছে। আর আমাদের ভক্তের ভগবান—তিনি পরম সন্তোষে সজ্জা সম্ভার দেখিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিতেছেন দুই চারিটী গৃহে তণ্ডুল

* অর্থাৎ—শচীমাতা

পূর্ণ রহিয়াছে, পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠ সারি সারি সাজান আছে, পাঁচ ঘরে ঘট প্রভৃতি রন্ধনের জায়গায়, দুই চারি ঘরে 'মুদোগর বিমলি,' স্তুপীকৃত না। ... বস্ত্র, প্রচুর পরিমাণ খোলা-পাতা, চারিখানা ঘর চিপিটকে পূর্ণ ... প্র ... কাণি দর্পণ আর নারিকেল, গুয়াপান, পটল বার্ত্তাকু, থোড ... ইক্ষু, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, তৈল, লবণ, ঘৃত, প্রভৃতি কত যে আসিয়াছে ... সীমা নাই। এই অমানুষিক আয়োজন ও অনন্ত সম্ভার দেখিয়া প্রভু ... চমৎকৃত হইলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন—এত সম্পত্তি মানুষের থাকিতে পারে না,—বুঝিয়াছি আচার্য্য ঠাকুর স্বয়ং মহেশ। মহাপ্রভু হাস্য ছলে অদ্বৈত তত্ত্ব জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন।—

"মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥
বুঝিলাম আচার্য্য মহেশ অবতার।
এইমত হাসি প্রভু বলে বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে মহাদেবের অবতার, একথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অনেক বার ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। আর আজ পর্য্যন্ত তিনি বৈষ্ণব জগতে মহেশ যোগ্য পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

প্রভু তাঁহার এই বিরাট আয়োজন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। আচার্য্যের প্রভূত প্রশংসা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুকে পাইয়া কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ পরমানন্দে গাহিতে লাগিলেন। কে কোন দিকে নাচিতেছে ও গাহিতেছে, কে কোন দিকে আনন্দে ছুটিয়া যাইতেছে কে তাহার নির্দ্ধারণ করিবে। অনন্ত ভক্ত কণ্ঠ নিঃসৃত হরি হরি ধ্বনিতে দিক সমূহ মুখরিত হইতেছে। বৈষ্ণবগণের শ্রীঅঙ্গ মাল্য চন্দনে ভূষিত। ভক্তিতে কে বড় আর কে ছোট তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রভুকে বেষ্টন করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। গগণ ভেদিয়া হরি হরি ধ্বনি উঠিতেছে' আবাল বৃদ্ধ বনিতার কর্ণে সে ধ্বনি পশিয়া সুধা ধারার সৃষ্টি করিতেছে।

প্রেম সুখময়' নিত্যানন্দ বাল্যভাবে নাচিতেছেন। এই সুখকর দৃশ্যে বিহ্বল হইয়া আচার্য্য প্রভুও অনেক নাচিলেন। তাহার পর হরিদাস ঠাকুর নাচিলেন সে এক মধুর ব্যাপার। সর্ব্ব শেষে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর, অতি অশেষ [illegible]েষে নৃত্য করিলেন। প্রথমে তিনি সর্ব্ব পরিষদগণের নৃত্য দেখিলেন। তাহার পর আপনি আবার সকলকে লইয়া নাচিতেছেন। সকলের মধ্যে তিনি —সে এক সুন্দর শোভা হইয়াছে।

এইরূপে আনন্দাবেশে নৃত্য করিয়া সারাটী দিবস কাটিয়া গেল। প্রভু তখন ভক্তগণকে লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অবসর বুঝিয়া অদ্বৈত প্রভু অনুমতি লইয়া ভোজনের স্থান করিলেন। তখন,—

বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারা চয়।
মধ্যে কোটি চন্দ্র যেন প্রভুর উদয়॥
দিব্য অন্ন বহু বিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র আরাধনা আইর রন্ধন॥
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্বভক্ত লৈয়া॥
প্রভু বলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি॥ চৈঃ ভাঃ

আমাদের রঙ্গিয়া প্রভু, এইমত নানা রঙ্গ করিতে করিতে, ভোজন সমাধা করিয়া আচমন করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি সুগন্ধি চন্দন ও দিব্য মাল্য আনিয়া ভক্তিভরে মহা অনুরাগে দুই প্রভুর নিকটে রাখিলেন। প্রভু আপন [illegible] চন্দন ভক্তগণ মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তাঁহারাও [illegible] গাত্রে করিয়া আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। [illegible] যাহার গৃহে—সেই অদ্বৈতের ত আনন্দের অবধি নাই।

প্রভু এদিন যত রঙ্গ করিয়াছিলেন—তাঁহার ভক্তগণকে যত আনন্দ দিয়াছিলেন—তাহা কে বর্ণনা করিবে।

"এক দিবসের যত চৈতন্ত বিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্ত যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত দেন শক্তি তত মাত্র গাই॥
এবার কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যেতে মতে চৈতন্তের যশ সে বা খানি॥
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
যেবা পড়ে শুনেমিলে কৃষ্ণ প্রেমধন॥" চৈঃ ভাঃ

"অনন্ত ভক্তের কথা মহিমা অপার"—আমরা সাধ্যমত সেই দেব তুল্য মহাত্মার পুণ্য কথা আলোচনা করিয়া' কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার চরণকমলে কোটি কোটি প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই প্রেমার্দ্র মূর্ত্তি মনোমন্দিরে জাগ্রত রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

প্রয়াণ-গীতি। *

('নছক্ক' রাজেন্দ্র কলেজ—ফরিদপুর)

সাজা তা'রে আজি—সাজা, সাজা—সাজা
আরো ফুল দলে বাছি'—তাজা—তাজা
বাজা করতাল—বাজা—বাজা—বাজা
গা'বে আজি শুভ প্রয়াণ গীতি,—
দেখ্ চাহি' ঐ কাননে—কাননে
বিহগ কাকলি তুলি' আন্ মনে
শত বাহু তা'র প্রসারিছে কর
ছুটে যায় ঐ আশোক প্রীতি!
শোন্ কাণ পা'তে' ঐ যেন দূরে
কা'র বাঁশি আজি ঝরে সুধা সুরে—
নূপুর নিকনে বেজে যায় যেন—
আয়,—আয়—আয়—আয়রে আয়!
আঁখির পাতাটি তাই যেন বুজে'
আপনার মনে কা'রে আজি খুঁজে—
কা'র কথা স্মরি' ব্যাকুলিত হিয়া—
কেঁপে ওঠে আজি বেদনায়!
কেঁপে ওঠে আজি বেদনাতে মন
বেদনায় শ্বাস বহে ঘন ঘন—
বিরহের ব্যথা শেল হানে বুকে—
আঁখি আজি জলে উছলায়—
বাঁশরীর সুরে আবেশে আবেগে—
হিয়া—ছল্ ছল্ মন—অনুরাগে—
নিচলিত তনু সাড়া নাহি মানে—

* স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদারের মৃত্যুপোলক্ষে ফরিদপুর সাহিত্য সমিতিতে পঠিত

খোঁজে খোঁজে আজি ছুটে যায় !
চুপি' চুপি' আজি ছুটে যায়—
পাও টিপে টিপে ছুটে যায়—
ধীরে—ধীরে—ধীরে— কথা নাহি বলে'
শ্বাস—রোধ করি, আপনার বলে—
নীরবে গোপনে কত নানা ছলে—
(আজি) সবে ফাঁকি দিয়ে ছুটে যায় !
বাতায়ন ধারে বাজাইয়া বাঁশি—
যে'বা কাঁদা'য়েছে নিতি নিতি আসি'—
তা'রি সন্ধান বুঝি মিলিয়াছে—
তা'রি পানে আজি ছুটে যায় !
সাজা তাই সবে—সাজা—সাজা—সাজা—
নব নব ফুলে—কচি—তাজা—তাজা—
বাজা করতাল—বাজা—বাজা—বাজা—
গা'য়ে আজি শুভ প্রয়াণ গীতি—
বল্ ভোরী স্বরে—বল্ "হরি বোল্"
উঠায়ে পঞ্চমে—ঘন—কলরোল্—
এই "জড়" ফাঁকি—তা'র চেতা তোল্—
গাও আজি শুভ মিলন গীতি।
এতদিনে দুঃখ—পথ-চাওয়া—তা'র
মিটিয়াছে আশা—অমর আত্মার—
নেমে গেছে বোঝা—নেমে গেছে তার—
—জয়, জয়—জয় কররে সবে—
মুছে ফেল ত্বরা—মুছ আঁখি জল
করনা মলিন এবেলা নির্ম্মল—
দুই বাহু তুলি' আনন্দে মাতিয়া—
বল্ 'হরি' 'হরি' গভীর রবে,

* * * *

*   *   *   *

তুই শুধু মা, বসিয়া নিজনে
কাঁদ্ কাঁদ্—কাঁদ্—আপনার মনে—
আঁখির বাঁধন খুলে দিয়ে আজ—
প্রাণ খুলে কাঁদ্ অভাগীরে,—
নাহি জানি আর নাহি জানি কবে
তোর আঁখি-জল মুছিতে যে হ'বে
চির-দিন তুই—দুঃখিনী—জননী,
চিরদিন দুঃখ—পাথারে!
গেল 'দাদাভাই'—গিয়েছে তিলক
তোর গগণের মুছিয়া আলোক
গিয়েছে "গোখেল"—গেছেত 'রসুল'
সে দিন ত গেল স্নেহের 'মতি'—
আজ 'অম্বিকা' এই গেল চলে'—
যা'রে ভালবাসি' নিয়েছিলি কোলে—
যা'বার বেলায় চাহিল কি ফিরে—
হায়, অভাগিনী, তুহার প্রতি!
দু'দিনের তরে এসেছিল সবে
বলেছিল 'মা' (তোর) দুঃখ নাহি রবে,—
দিয়েছিল প্রাণ—দিয়েছিল মান
তবু হায়, সবে গেলত চলি'!—
নিশা শেষে সুখ স্বপনের সম
স্মৃতি টুকু শুধু রেখে মনোরম—
গেল পলাইয়া—নিঠুরের মত—
গিয়েছে কি হায়, কথাটি বলি?
কাঁদ—কাঁদ্ মা—কাঁদ্—কাঁদ্—কাঁদ্
প্রাণ খুলে আজ কাঁদিয়া নে'—
এই—ধরা বুকে বল্ অভাগিনী,—
তুই বিনা আর কাঁদিবে কে?

কে পেয়েছিল বল্ হেন গুণ-মান—
কোন বিজ্ঞানে কৃতী সন্তান—
তাও হায়, মার রেখে অপমান—
গিয়েছে চলিয়া এমন ছলে ?
কথা না বলে ?
তুই কাঁদিবে না কাঁদিবে কে ?

কাঁদ—কাঁদ্—কাঁদ—কেটে যাক—বুক
বল্ এ দশায় বেঁচে কিবা সুখ ?—
মর্ হতভাগী—মর্—মর্—মর্ —
মর অলক্ষিণী মাথাটী খুঁড়ে'—
আমি শুধু তোর শ্মশানের পরে—
গাব গান ভাঙ্গা বীণা ঝঙ্কারে—
ত্রিশকোটী তোর সন্তানের গুণে—
দিক হ'তে দিকে ছড়াবে দূরে।

শ্রীরাজে,
২৯—১২—২২।

শব্দতত্ত্ব।

(শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়)।

সত্যের যে একটা বিরাট রূপ আছে, তার অনাড়ম্বর নিরলঙ্কার বৈচিত্র্য যে কল্পনার যাদুকরী মূর্ত্তিকে [illegible] তার আভাস যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরা নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের জীবনকে সেই সত্যেরই সন্ধানে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের পথ ধ'রে সত্য যখন চেতনার দ্বারে এসে তার বাঁশীখানি বাজিয়ে যায় তখন যে আমাদের অজ্ঞানের সুপ্তি ভেঙ্গে উন্মাদনা জেগে উঠে না, তার একটা কারণ মনে হয় এই যে আমাদের অলস চেতনা সেই সুন্দরের উদ্দেশে অভিসারের যে বেদনা তাকে চায় এড়াতে, কিন্তু যত দিন যায় ততই সে জমিয়ে তোলে, তার গোপন ভাণ্ডারে সেই সহজ (সত্যের) উপহারের মালা।

বাইরে থেকে এই যে অনন্ত শব্দ আমাদের কানে এসে বাজছে, তাতো আমাদের সহিতই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একটা ব্যাকুলতা নিয়ে। সে নিত্য এসে বলে যায় তোমরা যা অনুভব কর আমি তাও এবং তারও অতিরিক্ত আরও কিছু তোমার অনুভবের বাহিরে আমার যে রূপ সেই রূপই ত সত্য!

আমি এখানে ইংরাজী *sound* শব্দটাকেই 'শব্দ' নাম দিয়েছি, অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে এই আশঙ্কাতেই তার ধ্বনি শব্দের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপে সাহসী হই নাই।

এই শব্দের জন্ম হচ্ছে স্পন্দনে। আমরা এই সত্যটা সহজেই প্রত্যক্ষকর্ত্তে পারি যে শব্দের অনুভূতি যে মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হয় তখনই একটা হয় আঘাত নয় একটা কোন অন্যবিধ কারণ শব্দের জন্মভূমিতে একটা কম্পনের বেদনা উৎপন্ন করেছে; শব্দের কারণ যে বস্তু সে একটা ইতস্ততো গতি লাভ করেছে; তার শরীরের

অনুতে কাঁপন ধরেছে। একটা কাচের পাত্রে সামান্য একটা আঘাত করলেই সে যেন বেদনায় অনুনাসিক স্বরে কেঁদে উঠে। তার উপর আঙ্গুলের একটু চাপ দিলে দেখা যায় তার অণুতে অণুতে যেন একটা শিহরণের ঢেউ চলেছে। আর তার সেই শিহরণ যখন থেমে যায়, তখন সেই শব্দের হয় আত্মলীলার অবসান।

বেহালার তারের উপর যখন ছড়ি দিয়ে টান মারা যায় তখন নগ্ন চক্ষেই ধরা পড়ে যে সেই আঘাতে ঐ ক্ষীণ প্রাণ তারটুকুতে যে নাড়া দিয়েছে সেই নাড়া সে ভোলেনি আর তার সেই মিষ্ট সুরটুকুর জীবন ততক্ষণই যতক্ষণ সেই আবেগটুকু বর্ত্তমান।

একটা বস্তু যে একই সময়ে দুই বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে না; গতির সঙ্গে সময়ের যে একটা নিত্য সম্বন্ধ সেটা ভারবান্ বস্তুর সম্বন্ধে যত বড় গলা করে বলা যায় শব্দের মত একটা অবাস্তব 'বস্তুর' পক্ষে ঠিক্ সেই পরিমাণ নিশ্চয় কোন প্রত্যক্ষ পরীক্ষা না কোরে যে কেউ ক'রে বসবেন এত বড় সরল প্রকৃতি বোধ হয় কেউ নেই।

বরং অধিকাংশ লোকের ধারণা যে শব্দ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক প্রেমিকের মত কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। সময় না তোলেও শব্দের কারবারে কোন ক্ষতি হয় না। এটা বোধ হয় অনেকেই দেখেছেন যে ইঞ্জিন যখন তার বাঁশীতে স্বর ভ'রে রাশি রাশি ধূম উদ্গীরণ কোর্ত্তে কোর্ত্তে আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন আমরা প্রথম দেখি তার ধূম—পরে শুনি তার বাঁশীর সুর। আমরা প্রথম দেখি সৌদামিনীর ললিত লাবণ্য পরে অনুভব করি বজ্রের ভৈরব নির্ঘোষ। একটা মোটামুটি নিয়ম করা যেতে পারে যে দীপ্তি ও গর্জ্জনের মাঝে প্রতি মাইলে ৫ সেকেণ্ডের ব্যবধান।

বাহন না হোলে শব্দের চলে না। সে মাটি কাঠ পাথর বায়ুর কাঁধে না চড়ে এক পাও এগুবে না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা কোরে দেখেছেন যে এই বাবুয়ানীটুকু শব্দের প্রকৃতির সঙ্গে এক হোয়ে আছে। একটা বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সত্যটুকু যে কেউ যাচাই কোরে নিতে পারেন। একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা একটা আবদ্ধ মুখ কাচপাত্রে যদি কোন রূপে আলগা কোরে ধরে ঐ পাত্রের খোলা মুখটা বায়ু নিষ্কাষণ

যন্ত্রের উপর বসান যায় আর ওর মাঝের বাতাস টুকু যদি পূর্ণরূপে টেনে নেওয়া হয় তবে দেখা যাবে সেখানে আঘাত থাক্‌লেও শব্দ এসে কানে পেঁছায় না। আর বাতাসে সেটা ভরিয়ে দেবা মাত্রই সে কি উদাত্ত ধ্বনি।

এথেকে এই অনুমান কল্লে বোধ হয় ভুল হবে না যে শব্দ ফাকা পথে এগুতে পারে না তবে তার পথ যে কেবল বাতাসেই ভরা হবে তা' নয় সে ঘন তরলে ও বায়বীয় সকল রকম জিনিষের ভিতর দিয়েই নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত কর্ত্তে সমর্থ। কেউ যদি টেবিলের উপর আঁচড় কাটে আর আপ-নারা যদি ঐ টেবিলের কোন জায়গায় কান পেতে ধরেন তবে দেখতে পারেন যে তার আওয়াজ আপনাদের অন্তরের অন্তঃপুরে পৌছেচে বরং একটু আগেই।

সকলেই বোধ হয় প্রত্যক্ষ কোরেচেন যে কোন জলাশয়ের শান্ত বক্ষে যদি ঢিল ছোড়া যায় তবে দেখবেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ বৃত্তাকারে ঐ ক্ষুব্ধ স্থানকে ঘিরে বহুদুর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ তরঙ্গের উপর কোনখানে যদি একটু টুকরা শোলা ফেলে দেওয়া হয় তবে দেখা যায়, সে এমন একটা গতিলাভ করে যার নাম দেওয়া যেতে পারে নর্ত্তন, যার প্রকৃতি অন্য গতিশীল বস্তুর চলাফেরার মত নয়। নিজের পায়ে ভর দিয়ে সে একটু: ডিঙ্গিয়া। শব্দের পথে অনুগুলির অবস্থা কতকটা ঐরূপই। বায়ুর পথে সে একটা আকুঞ্চন প্রসারণের স্তর ঐ আকুঞ্চন ও প্রসারণের ঢেউ এসে যখন আমাদের কানে পৌছায় তখন আমাদের কর্ণ পটাহেও কাঁপন ধারে; আর সেই কাঁপনটার প্রকৃতি ঠিক আদিম শব্দায়মান বস্তুর কম্পনেরই অনুরূপ এবং ঐ কম্পনের অনুভূতিই শব্দানুভূতি। এখানে তর্ক উঠতে পারে যে ঐ কম্পন আর ধ্বনি একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বাঁধনে বাঁধা কিন্তু প্রকৃতিতে তারা ভিন্ন। তাদের অভিন্ন বলে দেখা শুধু যে প্রকাণ্ড ভুল তাই নয়, ও সত্যটা প্রচার করার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অসাধারণ দম্ভ। কিন্তু একথা যারা মনে করেন তাঁরা এই অতি সহজ সত্যটী ভুলে যান যে মানুষের অনুভূতির বৈচিত্র্যের একটা মীমাংসা করা এ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য নয় এর মূলে রয়েছে কারণ পরম্পরার যথার্থ ধারাটির অনুসন্ধানের

ব্যাকুলতা। তার পরের কথাটুকুকে ফিজিয়লজি ও সাইকলজীতে মিলে বোঝবার চেষ্টা যে না করেছেন তা নয় তবে সে বিষয়ের অবতারণা করা এ স্থান প্রবন্ধে চলবে না। অনুসন্ধিৎসু তা অন্যত্র বিবদরূপে জানতে পারবেন এ বিষয়ের গ্রন্থের পাতা উল্টোলেই।

শব্দের গতির পরিমাণ যাঁরা মাপতে চান তাঁরা কাওকে একটা নির্দ্দিষ্ট দূরস্থানে বন্দুক আওয়াজ করে সময়টুকু লিখে রাখতে বলবেন আর নিজে লক্ষ্য রাখবেন কখন শব্দ এসে আপনার হৃদয়-মন্দিরের দ্বারে প্রবেশ ভিক্ষা করে। তার পর অতি সরল গণিতের সাহায্যে দেখবেন যে শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১৪২ বা এমনি একটা কাছাকাছি ফীট। এ হোল বিজ্ঞানের আদিম যুগের চেষ্টার ধারা। তার পর নিয়মের পর নিয়ম এল কত নূতন তথ্য ধরা দিল; যার ফলে আপন পাঠাগারের চতুষ্কোণের মধ্যে পরীক্ষা কোরেও নির্ভুলরূপে শব্দের গতি বাহির করা চল্‌ছে। এদিকে গণিত আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে মিতালী করে কি অচিন্তনীয় অসাধ্য ব্যাপার যে সম্ভব কোরে তুল্‌ছে তা যাঁরা প্রত্যক্ষ কোরেছেন বা করবেন তাদের মুখ থেকে অয়স্ত শুনে শুনে এই দুই গণিত বিজ্ঞান বন্ধুর কান থাকলে বধির হোয়ে পড়ত।

শব্দের একটা বড় কৌতুকাবহ দিক্ তার পরাবর্ত্তন ইংরেজীতে যাকে বলে reflection সে যখন আপন গমন পথে বাধায় প্রতিহত হয় তখন ফিরে আসে আপন পরিচিত দেশেরই নবীন পথ ধরে। পুরান পথে না ফিরে সে যেন বিচিত্রতার আকর্ষণে একটা নিয়মের সংযত বন্ধনে পরাঙ্মুখী হয়। সেই সমস্ত নিয়মের উল্লেখ বা পরীক্ষারীতির আলোচনায় কোন লাভও নেই আর সময়ের অপব্যয়ও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাতে কম হবে না তবে এরই ফলে একটা যে কৌতুকাবহ ঘটনা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্চে, তার একটু উল্লেখ বোধ হয় বিরক্তিকর হবে না। সেটা হচ্চে প্রতিধ্বনির কথা। ওটা এই পরাবর্ত্তনেরই ফল আর আদিম কম্পনের সহিত পরাবৃত্ত কম্পনের সৌসাদৃশ্য বশতঃই সেই প্রতিধ্বনির ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য।

যাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্ হাউসে কখনও গেছেন তাঁরাই বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন প্রকাণ্ড হল ঘরের একদিকে একটা অর্দ্ধবৃত্তাভাসের মত শূন্যগর্ভ কাষ্ঠফলক প্রাসাদের অপরিসর দিকটার সমস্তকে যেন ছেয়ে ফেলেছে। সমস্ত ঘর যখন পরীক্ষার্থী ছেলেতে ভরে যায় তখন তাদের আদেশ উপদেশ সুস্পষ্টরূপে দেবার মত কণ্ঠস্বর ভগবান্ যাঁকে দিয়েছেন তাঁর কথা ধার না কিন্তু অন্যের পক্ষে এমন কোন একটা কৌশলের আবশ্যক নিশ্চয়ই হবে যার সাহায্যে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর প্রাসাদের সুদূর প্রান্তের ছেলের কানেও বাজবে অন্তর্নিহিত সমস্ত অর্থবহন কোরে। শব্দের ঢেউ সমূহ যখন ঐ কাষ্ঠ দর্পণের অঙ্গে প্রতিহত হয় তখন তারা ফেরবার জন্য ব্যগ্র হয় যেন চঞ্চল শিশুর দল স্মিতাননে ছুটে চলেছিল হঠাৎ সকলেরই শিরোনিয়ে যুগপৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত, আর সঙ্গে সঙ্গে পলায়নের তাড়া। ঐ খানে গিয়ে যাঁরা অনুসন্ধিৎসার দোহদ চরিতার্থ করেছেন তাঁরা বোধ হয় দেখেছেন ঐ বর্দ্ধিতায়তন শব্দটা আকারগত চরমোৎকর্ষ ও সুস্পষ্টতার ঐশ্বর্য্য নিয়ে একটা বাঁধা ধরা স্থানেই এসে পৌঁছায় তা যত বারই শব্দ করাই হোক অবশ্য শব্দের জন্মভূমি যদি একটু দূরে হয়, তবে তা না হোলেও ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানের সামান্য একটু এদিক ওদিক হবে একেবারে বিদিক হবে না। ইংরেজী নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে ঐ বিন্দুটার একটা বাঙ্গলা নামকরণ করা যেতে পারে সে চেষ্টা সাহিত্য-পরিষদের যে বিভাগ পরিভাষা গঠনে ব্যাপৃত আছেন তাঁরাই কোরেছেন বা করবেন ওটাকে ইংরেজীতে বলে কোকস্ শব্দ বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সুবিধাকে বরণ কর্ত্তে গিয়ে অনেক জঞ্জাল কেও স্বীকার কোর্ত্তে হয়েছে; একজনের বেশী লোক কথা বললে শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি হোয়ে কোথাও ২।১টা পূর্ণ আয়তন শব্দকে নষ্ট করে ফেলে আর কোথাও বা পরিস্কার লেখার উপর কালী বুলোলে যে অবস্থা হয় সেইরূপই দুর্দ্দৈব এসে পড়ে। লণ্ডনের সেণ্ট পল গ্যালারীতে এমন একটা কৌশল অবলম্বন করা হোয়েছে যার ফলে একস্থানে একজনের ধীর কথাবার্ত্তা সেখানে উপস্থিত কারো কাণে যেয়ে পৌঁছায় না শুধু এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলানের ঠিক বিপরীত প্রান্তে যে লোক আছেন' তাঁরই নিকট স্তনতি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।' এইরূপ অসংখ্য বৈচিত্র্য

অসংখ্য অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখতে দেখতে প্রকৃতির সুন্দরজ্যোতিঃ পুরুষকে আমাদের খেলার ধন আমাদের নায়ক আমাদের বন্ধুকে ভালবাসিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সত্য শিব সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করা যদি সাধনার চরম লক্ষ্য হয় তবে মানুষ বিজিজ্ঞাসু না হইবে কেন ?

শব্দ আমরা শুনি ও শোনাই বিশ্রম্ভগোষ্ঠী গালাগালি করি আবার গান গাই কথনও কোন শব্দে সুধা ঝরে আবার বিষক্ষরে এমনও ঘটে শতবার এর কারণ কি ? প্রকৃতির খেয়ালে বল্লে কোন উত্তর হয় না। যত রকমের সুন্দরের অনুভূতি আছে তার সকলেরই মূলে বিশেষ লক্ষ্য কোল্লে দেখা যাবে তার উৎপত্তির ক্রমের মধ্যে একটা সুসংহত ধরা আছে একটা আকার গত শৃঙ্খলা একটা উৎপত্তি গত সামঞ্জস্য আবিস্কারই হচ্চে সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যার প্রচালিত রীতি। সঙ্গীতের যে মৌলিক সুর তার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তার প্রতিকম্পনের সময় হচ্চে সমান আর সুর কাঁপনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ঠিক একই। সঙ্গীতের সুরকে মিষ্ট করবার আর একটা উপাদান, শুধু তাই কেন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপাদানই হচ্চে তার ঝঙ্কার। এই ঝঙ্কার জিনিষটার মূলে কয়কটা মৌলিক স্বরের ওতপ্রোত মিশ্রণ ছাড়া অস্বাভাবিক কিছু যে নাই সে সত্যটা ধরা পড়েছে শুধু হেলমহোজের রেজনেটর, যার সাহায্যে প্রত্যেক মৌলিক স্বরটীকে বিচ্ছিন্ন করে ধরা যায় আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিরও নির্ব্বাচন হয়। নানারূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সুরকে ফুটিয়ে তোলার সংসারের দুঃখ বেদনার যে শৈত্য প্রাণের উৎসকে জমিয়ে তুলছিল সঙ্গিতের মোহন মন্ত্রে তার রজতধারাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রবার একটা সার্থক চেষ্টা যদি কেও ক'রে থাকে সে এই শব্দবিজ্ঞান। তার নানান প্রচেষ্টার আংশিক বর্ণনা দিতে হোলেও আরও যোগ্যতর সাধককে একখানা গ্রন্থলেখবার শ্রমকে বরণ ক'রে নিতে হয়। আজ যদি আমি জাগিয়ে থাকি যোগ্যতমের সেই আত্ম প্রকাশের স্পৃহা ডাক দিয়ে থাকি যদি সুধীজনকে সেই জ্ঞানময়ের পূজার মন্দিরে ফুলমালা নিয়ে ছুটে আসতে, তবে সেই জ্ঞানময়ের প্রসাদের একটী কণা লাভে যেন আমি সমর্থ হই, আপনারা আমাকে সেই আশীর্ব্বাদ করুণ' আমার জীবন ধন্য হক। আর যাঁর জ্ঞানে এই বিশ্ব ভুবন ভ'রে রয়েছে' সুর যার এসে কেবলই আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় তাঁকে পূজা ক'রবার ঐকান্তিক স্পৃহা নিয়ে জেগে উঠুক, আমার জাতি। এই বাঙ্গলাদেশর ঘরেঘরে বেজে উঠুক তাঁরই পূজার কাঁসরঘণ্টা, আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রবার শুভ অবসর লাভ করি।

ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির

অভিভাষণ।

আজ যে আনন্দানুষ্ঠানে ফরিদপুর তাহার দৈন্যজনিত সঙ্কোচ পশ্চাতে ফেলিয়া আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছে তার সমস্ত উৎসবকে ম্লান করিয়াছে ফরিদপুরের অন্তর্নিহিত মর্ম্মবেদনা। বার্দ্ধক্যের অবসাদ, রোগের গ্লানি, যাহার পুরুষকারের পূর্ণ প্রভাকে নিস্তেজ করিতে পারে নাই, সর্ব্ববিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে যিনি জীবনসঙ্গিনীর ও প্রিয়তম পুত্রের বিচ্ছেদবেদনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই দেশহিতব্রত, প্রতিভাবান, মনস্বী, বাগ্মী, জীবনে অনন্ত-যৌবন, অক্লান্তকর্ম্মা জননায়ক অম্বিকাচরণ ফরিদপুরের গর্ব্ব ও সম্পদ লইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই সাহিত্য সমিতি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অক্ষয় কবচ লইয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিয়াছে। যদি তাঁহার অমর আত্মা ঐহিক সুখ দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া না থাকে, তাহা হইলে আজিকার এই অনুষ্ঠানে তাঁহার আশীর্ব্বাদের করুণাধারা বর্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর 'ব'দ্বীপরূপে বঙ্গোপসাগরের গর্ভ হইতে ফরিদপুরের উৎপত্তি। এই পুণ্যভূমিকে সৌন্দর্য্যসম্পদে মনোহারিণী করিতে প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে রত্নালঙ্কার দান করিয়াছেন। কোথাও খর্জ্জুর-তাল-নারিকেল-বেষ্টিত, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত, স্বচ্ছ জলাশয়ে নীল গগন-পট প্রতিবিম্বিত, কোথাও শ্যামল-বনরাজি বিহঙ্গ-কূজন-মুখরিত, কোথাও বা হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত। কোথাও ক্ষীণ স্রোতস্বতীর রজতধারা শান্ত প্রবাহে কোন নিরুদ্দেশের দিকে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চলিয়াছে, কোথাও বিশালকায়া স্রোতস্বিনী উত্তালতরঙ্গ-ভঙ্গে ভৈরব গর্জ্জনে পৃথিবীর সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উপরে নিজের জয়ধ্বজা প্রোথিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

ইতিহাস ফরিদপুরকে উপেক্ষা করে নাই। একদিন বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বিক্রমপুরের স্বাধীন ভুঁইয়ারাজা চাঁদরায় ও কেদার রায়ের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; যে পরগণার অধিকাংশ এখন ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত, সেই ভূষণারই ভুঁইয়া মুকুন্দরায় সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত মোগল বাহিনীর গতিরোধ করিতে সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; সেই ভূষণায়ই একদিন রাজা সীতারাম রায় মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে যখন নিম্নবঙ্গ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের লুণ্ঠনাভিযান নিবারণকল্পে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবপ্রেরিত সেনাপতি সংগ্রাম সিংহ ফরিদপুরের অন্তর্গত বাণীবহ গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রজ বৈদ্যবংশে পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার জীবনের কতক অংশ এই ফরিদপুরে অতিবাহিত করেন। আজও মথুরাপুরে 'সংগ্রামের কেল্লা' তাঁহার স্মৃতি সজীব রাখিয়াছে। আজও কার্ত্তিকপুরের 'কেদার বাড়ী' এবং মধুখালির অনতিদূরে ভূষণার জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষ হর্ম্ম্যরাজি কেদার রায়, মুকুন্দ রায় ও সীতারাম রায়ের কীর্ত্তি বুকে রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। ফরিদপুর সহর হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন দুই ক্রোশ ব্যবধানে গেরদার অর্দ্ধভগ্ন মসজিদের প্রবেশতোরণে খ্রীষ্টীয় ১৫৯২ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একখানি আরবীয় শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এই ফরিদপুরেরই দক্ষিণাংশে কোটালীপাড়ায় গীতার টীকাকার, স্বনামধন্য বৈদান্তিক, প্রতিভাবান পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি নামক বিখ্যাত বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই জেলারই অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে পীর বাদশা মিঞার পিতামহ, কোরাণের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আবু হানিফের মতাবলম্বী, ফরাইজী মতের প্রবর্ত্তয়িতা হাজী সরিতুল্লা জন্মগ্রহণ করেন। যে মহাপুরুষ অষ্টাদশবর্ষব্যাপী মৌনব্রত পালন করিয়া এই ফরিদপুরকে তাঁহার সাধনার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, আজ বর্ষাধিক হইল সেই ব্রহ্মচারী জগদ্বন্ধু এইখানেই তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। এখনও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পত্রে, কৃষকের গানে, পল্লীর জনপ্রবাদে, এবং লৌকিক আচারব্যবহারে কত বিস্মৃত ও অর্দ্ধবিস্মৃত কাহিনীর আভাস পাওয়া যায়।

আজ বাংলার ভুঁইয়ারাজত্ব অতীতের কাহিনী। রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের বিশ্ববিশ্রুত সৌধরাজি এবং তাহার সর্ব্বপ্রধান গৌরব 'একুশ-রত্ন' কীর্ত্তিনাশার

গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ভূষণা-প্রান্তবাহিনী ক্ষীণকায়া চন্দনা আজ ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত ভূষণাবাসীর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাদীপ্ত পৃথিবীতে বাংলার সেই পুরাতন জীবনধারা কোথায় কোন অন্ধকার বনভূমির অন্ধগুহায় লুকাইয়া রহিয়াছে। মানবিকতার তীর্থ-যাত্রায় আজ কোথায় কার অভিশাপে আমরা পাথেয় হারাইয়া নিঃসম্বল হইয়াছি, এবং শূন্য চক্ষে সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি যেদিন আমাদের হারানিধির সন্ধান পাইব, আমাদেরই বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত কুটীরে।

আজ পশ্চিমের ভ্রান্ত জাতীয়ত্ব রক্তগঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনোভাবের অর্ণবপোত নূতন সত্যের প্রচ্ছন্ন শৈলে আহত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের অরুণরাগ তাহার নয়নের লালসামদিরাকে ধাঁধিয়া দিয়াছে। আজ এই নূতন ও পুরাতনের, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সন্ধিস্থলে বঙ্গবাণী তাঁহার পূজার ডালা সাজাইয়া বিশ্বভারতীর চরণে অঞ্জলি দিতে চলিয়াছেন—দূরে কোন স্বপ্নদেশে যেখানে মানবিকতার সিংহাসনতলে প্রতীচ্যের সাম্য ও প্রাচ্যের মৈত্রী সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার রসনচৌকীর প্রভাতী তানে আজ বিশ্ববাণীর ঝঙ্কার উঠিয়াছে। আজ বাংলার কৃতী সন্তানগণ মায়ের পুষ্পপাত্র ভরিয়া দিতে কুসুম আহরণে কণ্টকাকীর্ণ কাননপথে বাহির হইয়াছেন। ফরিদপুর কি তাহার অঙ্গনের উদ্যানপুষ্পটীও মায়ের ডালায় তুলিয়া দিবে না?

তাই ফরিদপুরের প্রাণেও একটা নূতন স্পন্দন উঠিয়াছে। শুভ্র সত্যের প্রতিমূর্ত্তি, নিঃশেষজাড্যাপহা বাণীর চরণে অঞ্জলি দিয়া ফরিদপুরও ঐ বিশ্ববাণীর ঝঙ্কার শুনিয়াছে। তাই সে আসিয়াছে এই বিশ্ববাণীর উদ্বোধনযজ্ঞে নূতন দীক্ষায়, নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরের জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা পরাজয় করিতে। তাহার সমস্ত দৈন্য ও অক্ষমতার চিন্তাকে অতিক্রম করিয়াছে তাহার এই নব জাগরণ।

তাই এই মহা-যজ্ঞের ঋত্বিকবর্গকে বরণ ও দ্রষ্টৃবর্গকে আমন্ত্রণ করিবার ভার এই অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। আমাদের অর্ঘ্য নাই, উপচার নাই, সাহিত্যের সোমরস নাই। তবুও ঐ দূরশ্রুত বিশ্বভারতীর ঝঙ্কারে আমাদের শিরায় শিরায় স্পন্দন উঠিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে শিহরণ

লাগিয়াছে—আমাদের ঋত্বিক ও দ্রষ্টৃ বর্গকে অন্তরের সাগ্রহ অভিনন্দন জানাইয়া বলিতেছি

“স্বাগতম্”।

বামা-রচনা।

তৃপ্তি কোন্ পথে?

(শ্রীমতী রোহিণীবালা দেবী।)

এই জগতে, জন্ম হইতে মানুষ সুখ শান্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। অতি ক্ষুদ্র শিশু, কোন জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই,—শিশু তাহাকেও খারাপ বিছানায় শোয়াইলে, কি কোন তিক্ত দ্রব্য তাহার মুখে দিলে, কত অসন্তোষই না প্রকাশ করে! আবার ভাল করিয়া রাখিলে, কত আনন্দ প্রকাশ করে,—দুলায়। এইরূপে ক্রমে বয়সের সঙ্গে মানুষের চিত্ত বহির্মুখ হয়। নানা দিকে চিন্তা ধারা প্রবাহিত হয়। কেহ শিক্ষা, কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য, কেহ ধর্ম্ম কেহ বা পাপকেই জীবনের বৃত্তিরূপে অবলম্বন করে, কেহ দাতা, কেহ বা পরস্বাপহারক। এইরূপ বহুপ্রকার ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ সর্ব্বদাই সংসারে দৃষ্ট হইতেছে। যিনি যে কাজ করিতেছেন, তাঁহার ভিতরেই তিনি সুখ খুঁজিতেছেন। শিক্ষার্থী ভাবিতেছেন—শিক্ষাতেই সুখশান্তি; তিনি তাহার সমস্ত শক্তি অধ্যয়নে নিয়োগ করিয়াছেন; শুধু গ্রন্থের পর গ্রন্থ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অবিরাম লিখিতেছেন ও পড়িতেছেন। শিল্পী অনন্যমনে তাহার মানসী-প্রতিমা দিনের পর দিন গড়িয়া তুলিতেছেন। তাহাতেই তাহার তৃপ্তি। ব্যবসায়ী কি উপায়ে তাহার প্রচুর লাভ হইবে, ভাবিতেছেন ও প্রচুর অর্থাগমে সুখানুভবও

করিতেছেন। ধার্ম্মিক সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, মালা জপ, পূজার ধ্যান ইত্যাদিতে সুখ পাইতেছেন। পাপী সর্ব্বদাই কুকাজ করিতেছেন,— অন্ততঃ আমরা তাই মনে করি,—সে কিন্তু পরের অনিষ্ট ইত্যাদি করিয়াই সুখানুভব করিতেছে। দাতা তাহার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া সুখী হইতেছেন, কৃপণ সঞ্চয় দ্বারা তৃপ্ত হইতেছেন।—এইরূপে, সংসারে প্রত্যেক লোকই শান্তি খুজিতে খুজিতে, যাহার মনে যাহা একটু ভাল লাগে সে সেই পথেই ছুটিয়া যায়। পরে, বহুকাল ঘুরিয়া মানুষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্ষণিকের সুখ শান্তি গভীর অবসাদে কোথায় ডুবিয়া যায়, ভাবে কি করিয়াছি, এতকাল এত দিন ধরিয়া। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি। এত গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপাধির পর উপাধি পাইয়া, কি লাভ হইল আমার? সংসারই—এই অশান্তির মূল। কোথায় তুমি ভগবান্। অকূল সংসারে কুল দাও প্রভু, শান্তি দাও।—ধনী ভাবিতেছে,—কেন সারাজীবন ব্যাপী পরিশ্রমে এই ধন উপার্জ্জন করিলাম। ইহা বেশী খরচ করিতেও অশান্তি, ঘরে থাকাতেও অশান্তি। ওঃ কি ভীষণ অশান্তির বোঝা সাধ করিয়া টানিয়া আনিয়াছি গো!—আহা! যদি দু'দণ্ড ভগবানের নামও লইতাম—তাহা হইলেও এই জ্বালাময় সংসারে শান্তি পাইতাম ওই মুটে, কৃষক—উহারাও আমা অপেক্ষা সুখী। দরিদ্র বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছে ও ভাবিতেছে—আহা! যদি সময়ে চেষ্টা করিতাম, মানুষ হইতাম, আজ কত বড় হইতে পারিতাম। কি বিচিত্র এই সংসার! শুধু রোগ, শোক, ছোটর উপর বড়র অত্যাচার,—শুধুই অশান্তি, কেবলই দুঃখ।

বহু প্রকৃতির লোক এই সংসারে নানা ভাবে বিচরণ করিতেছে। প্রত্যেক লোক বিভিন্ন প্রকৃতির,—কত ভাবে, কতরূপে, সুখকেই খুঁজিছে! অভিষ্টকে না পেয়ে নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কত তীর্থস্থান, দেশ বিদেশ, নানাস্থানে ঘুরিয়া, নানাভাবে খুঁজিয়া ভাবিতেছে—মহা অশান্তিপূর্ণ এই সংসারে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আর শান্তি নাই। কিন্তু হায়! একটী লোকও ভাবিয়া দেখে না, যাহাকে সে অশান্তির আকর বলিয়া মনে করিতেছে, তাহা কি। এই যে সাজানো সংসার,—কত সুন্দর, কত মনোহর,—কে এই ভুবন ভুলানো রূপে প্রকৃতি দেবীকে সাজাইয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য গ্রহ-

নক্ষত্র নিয়মিত গতিতে চলিতেছে। দিন পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, নিয়মিতরূপে অবিরাম গতিতে আসিতেছে ও যাইতেছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, মানুষের অজ্ঞাতসারে নীরবে আসিতেছে, যাইতেছে।

কে দিয়াছে মায়ের হৃদয়ে অনাবিল স্নেহ ঢালিয়া? শিশুর মুখে এই প্রাণ মাতানো হাসি—কে দিয়াছেন ইহা? মানুষ! অন্বেষণ কর তাঁহাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন 'দেহ'কে অসংখ্য 'মানুষ' মনে করিতেছি; দেহ তো ক্ষণস্থায়ী—জড়; এই আছে, এই চলিতেছে, ফিরিতেছে,—পরক্ষণেই হয়তো নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতে পারে। দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবৃত্তি সমূহ, কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? জড় মন কোথাহ ইতে চিন্তা শক্তি পাইল? কে এই দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? কাহাকে লইয়া এই সংসার? পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা, কে ইহারা? দু'দিনের অস্থায়ী এই শরীটাকে বাদ দিয়া দেখ। যাঁহাকে তুমি তীর্থে তীর্থে খুঁজিয়াছ, যাঁহার অন্বেষণে ৺বৃন্দাবনে ছুটিয়া গিয়াছ, বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও যাঁহার দর্শন মিলে নাই, তিনি স্বয়ং পূর্ণরূপে তোমার গৃহে 'গোপাল' রূপে খেলা করিতেছেন; আনন্দের হাসি ও কোলাহলে গৃহ তোমার মুখরিত। তোমার প্রাণের সবটুকু ভালবাসা কত সুখে উপভোগ করিতেছেন। আবার, মাতৃরূপে প্রাণঢালা ভালবাসায় তোমার প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিতেছেন। প্রতিগৃহে এইরূপ ৺বৃন্দাবন লীলা চলিতেছে; কিন্তু কেহ জানে না, বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না। একদিনে কখনও বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায় না। নিজের ছেলের ভিতর তাঁহাকে দেখিলে, ক্রমে দেখিতে পাইবে, পৃথিবীর সব ছেলের ও তোমার ছেলের মধ্যে প্রভেদ নাই কিছু; সুধু এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বালকরূপে খেলা কচ্ছেন। শত চেষ্টাতেও যাহাকে ভাল বাসিতে পার নাই, কত প্রার্থনা করিয়াছ, কত কাঁদিয়াছ—'প্রভু! তোমার মায়াজাল ঘুচাইয়া প্রেম ভক্তি দাও';—কিন্তু কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি,—যাহাকে সামান্য মায়া মাত্র মনে করিয়াছ, সে "বাৎসল্য প্রেম।" ছেলের দেহাত্মবোধকে বাদ দিয়া দেখ, কত ভালবাস তুমি—তোমার অভীষ্ট দেবকে।

যা' কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ,—সকলের ভিতরেই পূর্ণ ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন তোমার ভালবাসা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ থাকিবে না; বিশ্ব সংসার, নিজের সংসার,—বিশ্বমানবকে নিজের অপেক্ষাও প্রিয় মনে হইবে। 'ডোম' 'মেথর' ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান কোথায় ভাসিয়া যাইবে। জীব, জগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র,—সব তুমি। তুমিই পুত্র-কন্যা, তুমিই পিতা-মাতা, তুমিই গৃহ পরিবার, তুমিই আত্মারূপে সব। তাই এ সবে তোমার এত ভালবাসা।

মানুষ! কে তুমি? "কি তোমার স্বরূপ?"—একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? দু'দিনের এই জড় দেহ,—ইহাই কি তুমি? না,—তাহা নয়। তুমি নিত্য-সিদ্ধ মুক্ত আত্মা। প্রাণে প্রাণে নিজেকে নিজে উপলব্ধি কর, দেখিবে—কেহ নাই, কিছু নাই। মনুষ্য, জীব, জন্তু, পৃথিবী, জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু,—স্বপ্ন সব। সুধু এক নিজেকেই নিজে বহুভাবে দেখিতেছ, ও বহুভাবে ভাবিতেছ। তুমি এক নিষ্ক্রিয়, মুক্ত।

পূর্ব্বে যাহকে পাপী মনে হইত, তাহাতে ও পুণ্যাত্মায় কোন প্রভেদ নাই। কাহার জিনিষ কে চুরি করে? কে পাপ করে? পাপ, পুণ্য—কিছুই যে নাই। সর্ব্ব দেহে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব জীবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বহুরূপে নিজেকে নিজে দেখিতেছেন ও বহুভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিতেছেন। সাধক যখন ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকে, পাপী যখন অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, তখন কেবলই হাসিতেছেন। আহা! কি মায়ার খেলা রে! নিজের মায়ায় নিজে মুগ্ধ হ'য়ে, নিজেকে নিজে চিনিতেছেন না! সাধু ব্যাকুল হ'য়ে ডেকে ডেকে নিজেরই আত্মাকে নানাভাবে দেখিতেছেন, আর অপূর্ব্ব শান্তিতে মনঃপ্রাণ ডুবিয়া যাইতেছে। কেহ ভাবিতেছে—"আমাকে এই পাপের ফল ভুগিতে হইবে",—সে তাহাই ভুগিতেছে। জানে না—সে কে? মানুষ! নিজের গণ্ডীতে বদ্ধ, দেহাত্মবোধক এই "ছোট আমি"কে ভুলিয়া যাও। আমি অনন্ত, অখণ্ড নিত্যানন্দ, শুদ্ধ মুক্ত আত্মা; আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জরা ব্যাধি আমাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, 'যম' আমার একটী রূপ মাত্র; অনন্ত ব্যাপিয়া সুধু আমি'। দেখ, মনঃপ্রাণ শান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে, অপূর্ব্ব আনন্দে ও তৃপ্তিতে হৃদয় উদ্ভাসিত;—এ আনন্দের আর তুলনা নাই। নিজে ইহা উপলব্ধি না করিলে, বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা অতুলন, অব্যক্ত।

জীব নিজেই আনন্দের স্বরূপ, কিন্তু নিজের মায়ায় নিজে মুগ্ধ হইয়া

আপনাকে ভুলিয়া আছি; ‘হু তাবে নিজের স্বরূপ, আনন্দ বা সুখকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদিন সে পাইবেই। নিজের স্বরূপ জানিতে পারিবে যে দিন সেই দিনই সে অনন্ত তৃপ্ত।

স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা।

(কুমারী প্রতিভা সেন।)*

(২)

স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। স্ত্রী জাতিই ঘরের গৃহিণী, যদি তাহারা রীতিমত শিক্ষিতা না হন তবে তাঁহারা সংসারের কাজগুলি সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। যদি মা সুশিক্ষা পান, তবে তাহার ছেলে মেয়েদিগকে সাধ্যানুসারে শিক্ষা দিতে পারেন, ও সন্তান মাতার উপদেশানুসারে চালিত হইয়া মাতৃগুণ লাভ করে। অনেকে মনে করেন যে মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই; ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা, কারণ মেয়েরাই গৃহের কঠিন কার্য্যগুলি সর্ব্বদা সম্পন্ন করে। স্ত্রী জাতি মাত্রই কোমল প্রাণা; এই শিক্ষার গুণে তাহাদের কোমলতা পরিস্ফুট হয়। তবে শুধু ইংরাজি কিম্বা কিছু বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া কিছু পড়িতে শিখিলেই, শিক্ষার গুণ হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য বহু, তন্মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য, গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়তঃ সন্তান পালন তৃতীয়তঃ সকলের সহিত সৎ ব্যবহার। যাহারা অশিক্ষিতা তাহারা প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষিতা স্ত্রী প্রায়ই প্রতিবেশীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করেন। স্বামীর যদি অল্প আয় হয় তবে শিক্ষিতা স্ত্রী অল্প অর্থ দিয়াই সংসার যাত্রা এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করেন যে কোন অভাব জনিত ক্লেশ স্বামীকে জানিতে দেন না। মাতা যদি কলহ-প্রিয়া কিম্বা কুটিলা প্রকৃতির হন, তাহা হইলে সন্তানও সেই দোষ পায়; যাহা মাতা করেন তাহাই ভাল মনে করিয়া সেইরূপ কার্য্য করে। নানারূপ শিক্ষার মধ্যে স্ত্রী জাতির গৃহশিক্ষাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

* ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-লিখিত।

সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম।

(কুমারী শৈলবালা দেবী)।

যে ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করেন এবং কর্ম্মের ফলাফল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নশীল হন তিনি কর্ম্ম যোগী। আর যে ব্যক্তি সংসারকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আমার আমার করিয়া কর্ম্ম করে সে কর্ম্মী। সংসারী লোকেরা এই সংসারের অসার বস্তুগুলিকে সার ও আমার ভাবিয়া কর্ম্ম করে। আর যাহারা কর্ম্ম যোগী, তাহারা এই সমস্ত ভগবানের ও ভগবান আমাকে ইহাদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন আমার এই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এই কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করেন, এবং কর্ম্মফল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

সকাম কর্ম্মের লক্ষণ :—

সকাম কর্ম্মীরা ফলের আশায় কর্ম্ম করেন। কেহ ধনের আশায়, কেহ যশের আশায়, কেহ মানের আশায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্ম করিলে বন্ধনে পড়িতে হয়। কারণ যে যাহার আশায় কর্ম্ম করে সে তাহার নিকটই বন্ধনে পড়ে; যেমন কেহ টাকার আশায় কর্ম্ম করিতেছে, যাহার টাকার উপর লোভ আছে সে সেই লোভ ছাড়াইতে পারিতেছে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ :—

যিনি নিষ্কাম কর্ম্মী তিনি কোন কামনা করিয়া কর্ম্ম করেন না। তিনি ভাল কাজ করিয়া সুখলাভ করিতে চাহেন না। ও কোন অন্যায় কাজ করিয়াও দুঃখ ভোগ করিতে চাহেন না, তিনি কর্ম্মফল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। তিনি কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রতিদান চান না। তিনি কর্ত্তব্যবোধে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এইরূপ কর্ম্মে বন্ধন খোলে কারণ এই কর্ম্ম সমস্তই ভগবানের উদ্দেশে হইতেছে।

বিদায় পত্র।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

১

সে দিনটা ছিল বাদলার দিন, সকাল থেকে কেবল জলই পড়চে—বাতাসের বিরাম ছিল না। আমাদের 'হল এল' ডেষ্ট্রয়ারখানা জর্ম্মণ সাগরের নীলজলে নাচতে নাচতে ছুল্‌তে ছুল্‌তে প্রথম চল্‌তে শেখা ছেলের মত ছুলে যাচ্ছিল। সে দিনটার বাদলার দিনটার মতই একটা নিরানন্দময় ভাব আমার মনের মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছিল, আমি আমার কেবিনের মধ্যে গিয়ে জানালা খুলে দিয়ে বাহিরের দিকে চাইলুম; বাহিরেও যেমন একটা অন্ধকারের ছায়া—একটা এলোমেলো কাণ্ড—আমার মনের ভিতরও তাই তবে বাইরে যেটা একটু ঘোরাল রকমের, আমার মনের মধ্যে সেটা পাতলা ছায়ার দাগের মত, যেন বাহিরের অশান্ত ভাবটার প্রতিবিম্ব আমার বুকের ভিতর গিয়ে পড়েছে।

আমরা কত দিন থেকে "এমডেনের" পিছনে পিছনে ঘুরছি,—শুধু আমরা নয় আমাদের মত অনেকেই তাকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কিছু করতে পাচ্ছে না। এমডেনটা এক একবার বুন শুয়া[illegible] দেয়, আবার চকিতের ভিতর কোথায় লুকিয়ে পড়ে। আজ এখানে কাল সেখানে এমনি ক'রে সমুদ্রের নীল বুকের উপর দিয়ে আমরা কেবল ছুটিয়ে বেড়াচ্ছি। এমডেন আপনার সংহার লীলায় দিন দিন যেরূপ মেতে উঠেছে, তাতে যদি অল্প সময়ের মধ্যে সে ধরা না পড়ে তা হলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক বড় রকমের গোলযোগ পড়ে যাবে। আমাদের কাপ্তেন তাহার একজন সহযোগীর কাছ থেকে তারহীন বার্ত্তাযন্ত্রের সাহায্যে খবর পেয়েছেন, আজকালের ভিতরেই এমডেন জর্ম্মণ সাগর দিয়ে লিয়ো উপসাগরের দিকে রওনা হবে তাই আমাদিগে তার ঘাটি আগলে বেড়াতে হচ্ছে।

আমি একজন নৌ কর্মচারী, সমুদ্রের বুকেই আমার জীবনের অধিকাংশ কাল কেটে গেছে। তবুও আমার প্রাণটা একেবারে অন্ধকারময় বা নীরস নয়। জীবন মরণের সন্ধিস্থলে থেকেও—কর্ম কোলাহলের ভেতর দিয়েও, আমার প্রাণের মাঝে কখনও কখনও একটা আলোর অস্পষ্ট রেখা কল্পনায় একটা অস্ফুট আনন্দ জেগে উঠতো—তা সে গুলো যত অল্প সময়ের মধ্যে কেন নষ্ট হ'য়ে যাক না।

আমাদের জাহাজে উইলিয়ম গ্রেগরী বলে আর একজন কর্মচারী ছিল। সকলের চেয়ে তার অল্প বয়স। ছোকরাটী দেখতে বেশ, যেন মাইকেল এঞ্জিল তৈরী সাদা পাথরের একটী সুন্দর মূর্ত্তি বিশেষ। সমুদ্রের জলের মতই তার চোখ দুটী নীল, সোণালী রঙের চুলগুলি একটু বড়—কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। আমার কেবিনের পরেই তার থাকবার জায়গা। ছোকরাটি দেখতে শুনতে বেশ বটে, তবে তার স্বভাবটা একটু বিদ্‌ঘুটে রকমের, কারও সঙ্গে বড় একটা কথা কইতে চায় না। সে একলা হাঁ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকবে, তবু কারও সঙ্গে মিশতে চাইবে না—সে যেন প্রকৃতির মহানীরবতার সঙ্গী। যদিও সে কারও সঙ্গে মিশতে চাইতো না, তবুও সে আমার সঙ্গ অনেকটা পছন্দ করিত—অবশ্য এর কারণটা তখন আমি জান্‌তে পারি নাই; পরে পেরেছিলুম বটে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

[illegible] বসে থেকে থেকে যখন মনটা নিতান্তই হাঁপিয়ে উঠলো। তখন ৰাইৱে এসে দাঁড়ালুম তখনও জল পড়ছিল। ঝড় গোঁ গোঁ শব্দে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে পাগলা দৈত্যের মত দিক্‌ বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল। আমি বাইরে অপেক্ষা না করে গ্রেগরীর কামড়ায় ঢুকে পড়লুম। গ্রেগরী তখন তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা হাভানা চুরুট ধরাইয়া একমনে টান্‌ছিল।

আমি ডাক্‌লুম—'গ্রেগরী।'

গ্রেগরী তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লো, আমি বল্লুম "বেশ আরামে শুয়ে আছো গ্রেগরী।"

"আর কি করব?' এখনতো কোন কাজ নেই।"

আমি বিছানায় এক পাশে বসে পড়ে বল্লুম "আজকের দিনটা কি বিশ্রী, কেবলই জল পড়ছে একবারের তরেও রোদ উঠ্‌ল না।" গ্রেগরী একটু হাসিয়া বলিল তাতে আর হয়েছে কি, তুমি জলের উপর বাস ক'রে আর কি চাও?

"আর একটু বেশী চাই বই কি, এই যে অগাধ জলের উপর ভাস্‌ছি, বৃষ্টির ধারারও বিরাম নেই—চারদিকটা কুয়াসারার মত আবছায়া ঘেরা, এমন সময়টা কি কেবল চুপ ক'রে একলাটী বসে থাকা যায়—তুমিই বলনা কেন?

গ্রেগরী হাস্‌তে হাস্‌তে আমার গায়ে ঢলে পড়ল, কি কোমল স্পর্শ তার আমার মনে হ'ল তার দেহটী যেন ফুলের পাপড়ী দিয়ে গড়া, আমার বুকের ভেতর বিদ্যুৎ ছুটে গেল। তৃণশীর্ষ শিশির বিন্দুটীর স্পর্শ পেয়ে ফুল্ল হ'য়ে ওঠে কিনা জানি না, আমার কিন্তু সমস্ত মনটা একটা গরিমাময় আত্মপ্রসাদে ভরে উঠলো। আমি তাকে আবেগ ভরে বুকের উপর চেপে ধরলুম। সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "তুমি দেশে গিয়ে বিয়ে করবে, এ কাজ তোমার নয়।"

আমি তার গোলাপফুলের মত নরম চিকচিকে গালে চুম খেয়ে বল্লুম, যদি বিয়ে করতে হয় গ্রেগরী তাহ'লে তোমাকেই বিয়ে করব—তোমার চেয়ে কে আমাকে বেশী ভালবাসবে।"

আমি মনে করেছিলুম এ কথায় গ্রেগরীর খুব আমোদ হবে কিন্তু তার মুখটা ঝ'রে পড়া ফুলের মতই শুকিয়ে গেল। আমার বাহু [illegible] তার শীর্ণ দেহখান থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করলাম "কি হল তোমার?"

সে খুব হেসে বল্লে "এমনি কিছু, এখন তোমার সেই গানটা গাও দেখি [illegible] of England [illegible] মনটা সাহসে ভরে উঠুক; আমরা যাচ্ছি "এমডেন" [illegible] এখন ও সব আলোচনা ভাল নয়"

আমি [illegible] দৃষ্টিতে গ্রেগরীর মুখের দিকে চাইলুম' সে মুখ আবার প্রসন্নতর [illegible] অরুণময় কিরণে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—কোনখানে একটু ও বিবর্ণতার চিহ্ন নেই।

আমাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্যই বোধ হয় গ্রেগরী আমার হাতে একটী সিগারেট দিয়ে বল্লে "খাও দেখি এটা, নিশ্চয় তোমাকে নতুন লাগবে, এগুলি আমি

এক বন্ধুর নিকট থেকে বিদায় উপহার পেয়েছিলুম।"

আমি কোন কিছু না ব'লে সিগারেটটী মুখে লাগিয়ে যেমন ধরাতে গেছি অমনি আমাদের জাহাজ খানা কেঁপে উঠলো আমি চকিত দৃষ্টিতে গ্রেগরীর মুখের দিকে চাইলুম সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো 'ব্যাপার কি?" আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম আর বলা হ'লনা, ডেকের উপর থেকে গোলমাল শুনলুম "এমডেন" কখন এসে আমাদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে টর পেডো চলিয়েছে।

আমি গ্রেগরীর হাত ধ'রে বাহিরে এসে দাঁড়ালুম। হু হু শব্দে জাহাজে জল ঢুকছে—শীঘ্রই কোন অতল তলে মিশিয়ে যাবে। কাপ্তেনের আদেশে কয়েক খানা বোট জলে ভাসান' হ'য়েছিল, আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র নিয়ে যে যেখানায় পারলুম উঠে পড়লুম।

তখন সন্ধ্যে হ'য়ে আসছিল, বেলাটাও অনেকটা কেটে গেছে, দেখতে দেখতে সূর্য্য যেন সমুদ্রের জলের ভেতরই ডুবে গেল। রাত্রির আমরা অনিদ্রায় অনাহারে ভেসে ভেসেই কাটিয়া দিলাম। পরদিন "বেফিন ল্যাণ্ড" এসে আমাদের উদ্ধার করলে। তারপর আরো কয়েক দিনের পর ফ্রান্সের মার্সেল বন্দরে এসে নামলুম।

এ দিন আর গ্রেগরীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই, সেই জন্য বন্দরে নেমেই তার অন্বেষণ করতে লাগলুম। একজন এসে আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে ব'ল্লে গ্রেগরী তোমাকে এই চিঠিখানা দিয়েছে।

আমি [illegible] থেকে চিঠিখানা নিয়ে বল্লুম "সে কোথায়?" লোকটা কি ব'ল্লে বুঝতে পাল্লুম না, আমি আর তা'কে কিছু না বলে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ কল্লুম। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল:—

প্রিয়-বন্ধু!

এত দিন এক সঙ্গে কাটালুম, কিন্তু শেষ বিদায়ের সময় দেখা ক'রে আসতে পাল্লুম না। এত দিন তোমাকে যেরূপ চিনেছি, যদি তার ভেতর কোন ভুল থাকে তাহ'লে আমি সহজেই আশা করতে পারি এ ত্রুটি তুমি ক্ষমা করতে পারবে।

আমি কে তা তোমরা কেউ বুঝতে পারনি, তোমরা আমাকে দরিদ্র ইংরাজ বালক মনে করিয়া খুব আগ্রহের সহিত কাজ দিয়েছিলে। কিন্তু আমি

ইংরাজ বালক নই—জার্ম্মান রমণী —অধমের অন্তরে। তোমাদের নাগাল যে মারা গেল তা আমারই কীর্ত্তি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে কাজের ভার আমি মাথায় ক'রে নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে ছিলুম, সেটা শেষ ক'রে দেশে ফিরে যেতে পারছি,—বিফল অভাব বোঝা ব'য়ে নয়, সাফল্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়ে। এতে তোমরা যতই ক্লেশ পাওনা কেন আমি কিন্তু খুব খুশী হ'য়েছি। যদি কখনও 'ফাদারল্যাণ্ডকে' মানতে পার, তবে তোমরা আমার এ আনন্দের পরিমাণ বুঝতে পারবে।

কিন্তু বন্ধু, যতটা আনন্দ নিয়ে আমি ফিরে যাবার আশা করে ছিলুম—তা পারিনি। তুমি তাতে বাদ সেধেছ, তোমার মোহন মূর্ত্তির নিকটে—তোমার সরল সুন্দর স্বভাবের নিকটে আমার নারী জীবনের সাধনা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে; যদি বুঝতুম ইংরাজ যুবক তার দেশবৈরীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, তা হ'লে—যাক্ ওকথায় আর ফল কি! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমার চির জীবন যেন সুখেই কেটে যায়, অশ্রু চিহ্ন যেন তোমার উজ্জ্বল গণ্ডকে কলঙ্কিত না ক'রে। আমার বলতে যা ছিল, তার তো তোমার অজ্ঞাত সারেই কেড়ে নিয়েছ। আমি নিয়ে চল্লুম সেই একটী চুম্বন! সেই আমার চির জীবনের সান্ত্বনা। বিদায় বন্ধু, বিদায়!"

চিঠিখানা সমস্ত পড়লুম, বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে না কাটতেই কাপ্তেন আমাকে ডেকে পাঠালেন। চিঠিটা পকেটে রেখে দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলুম; আবার আমার কর্ম্মময় জীবনের কার্য্য আরম্ভ হ'ল।